শির উঁচিয়ে শতাব্দী পার

প্রবাহ

শতবার্ষিকী বিশেষ সংকলন

ESTD-1924
NARASINHA DUTT COLLEGE

প্রবাহ

শতবার্ষিকী বিশেষ সংকলন

শির উঁচিয়ে শতাব্দী পার

নরসিংহ দত্ত কলেজ

১২৯, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

ফোন ঃ +৯১৩৩২৬৪৩৮০৪৯, ফ্যাক্স ঃ +৯১৩৩২৬৪৩৪২৫৯

Email: principal@narasinhaduttcollege.edu.in

প্রবাহ (PRABAHA)
বার্ষিক কলেজ পত্রিকা

শতবার্ষিকী বিশেষ সংকলন
চতুর্থ বর্ষ (২০২৩-২৪)

সম্পাদক :
ড: সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

সম্পাদকমণ্ডলী
অধ্যাপক বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার
শ্রীমতী কৃষ্ণা ব্যানার্জী
ড: রূপালী ধাড়া
শ্রী সিদ্ধার্থ সেন
ড: শ্রুতি লাহিড়ী
শ্রীমতী মৌমিতা ধর (দে)
ড: পম্পা চক্রবর্তী
ড: প্রদীপ কুমার তপস্বী
ড: নীলাদ্রি দে
ড: শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়
ড: সুতীর্থ সরকার
ড: সুমন কুমার মাইতি
ড: শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী আকবর আলি
ড: সৌমিত্র কুণ্ডু
শ্রী স্বয়মদীপ্ত দাস
শ্রীমতী জোরা বানু
শ্রী অমৃত বোস
শ্রী মিঠুন হাজরা

অলঙ্করণ :
বর্ণায়ন
Mob : 9143134993
booksspace2011@gmail.com

প্রবাহ ● শতবার্ষিকী বিশেষ সংকলন
চতুর্থ বর্ষ (২০২৩-২৪)

সূচিপত্র

7 ✦ **একশোয় সাত**—সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
13 ✦ **শতবর্ষের ব্রতযাত্রায় স্মরণীয় উত্তরাধিকার : আইজ্যাক বেলিলিয়াস, নরসিংহ দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন**—কুন্তল চট্টোপাধ্যায়
19 ✦ **নরসিংহ দত্ত কলেজে আমার উনত্রিশ বসন্ত**—বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার
23 ✦ **আমার আলমা মাটার : আমার নরসিংহ দত্ত কলেজ**—রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
27 ✦ **আমার মেয়েবেলা : আমার মহাবিদ্যালয়**—রূপালী ধাড়া
31 ✦ **নানা রঙের দিনগুলি**—অংশুমান সরকার
37 ✦ **অন্তরের প্রবহমানতা—একঝলকে ফিরে দেখা**—অর্পিতা বসাক
39 ✦ **বাহাত্তর বছর পূর্বের স্মৃতি**—প্রভঞ্জন দত্ত
41 ✦ **সময়ের ক্যানভাসে আমার কলেজ**—সন্দীপ বাগ
47 ✦ **ফিরে দেখা**—দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
48 ✦ **কলেজে সুখ-দুঃখের দিনগুলো**—তরুণ কুমার মন্ডল
50 ✦ **নানা রঙের দিনগুলি :**—শ্রাবন্তী গের ঘোষ
52 ✦ **ফিরে দেখা ১৯৭০-১৯৭৩**—অভিনন্দা দাস বন্দ্যোপাধ্যায়
54 ✦ **মুহূর্ত জন্মায়, মরে না**—অনমিত্র রায়
56 ✦ **স্মৃতির পাতায় আমার কলেজ**—প্রত্যুষা সিংহ
58 ✦ **আমার কলেজ**—দোলন দাস
59 ✦ **Recollecting in Tranquility : An Address**—Shruti Lahiri.
61 ✦ **My Journey at Narasinha Dutt College**—Suman Kumar Maity
63 ✦ **Back ground in brief of Late Principal—Motilal Chatterjee**—Deb Sundar Chatterjee
64 ✦ **My feelings about my college**—Saradindu Chattaraj
67 ✦ **College Days : A Journey Through the Golden Years of Guidance and Joy**—Peu Mondal
69 ✦ **সুরের কূলের নাইয়া : নির্মলেন্দু চৌধুরী**—সিদ্ধার্থ সেন
73 ✦ **প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিসহ**—ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়
74 ✦ **চলে যেতে হয়**—ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়
74 ✦ **স্বরূপনগর**—সুদীপ্ত মাজি
75 ✦ **শতবর্ষে কলেজ**—মৌমিতা ধর (দে)
76 ✦ **সূর্যের রং**—সৌমিত্র কুন্ডু
76 ✦ **মৃতের বয়ান**—আকবর আলি
77 ✦ **সাম্যের ক্যানভাস**—তাপসী খাড়া
78 ✦ **বারো মাসে তেরো পার্বণ** —রজত পাত্র
79 ✦ **আর্তনাদ**—মিঠুন হাজরা
80 ✦ **১০০ তে পা**—দেবনীতা ঘোষ
81 ✦ **জল থইথই ভালোবাসা**—প্রীতি ঘোষ
81 ✦ **তাড়াহুড়ো**—স্মরণিকা ব্যানার্জী
82 ✦ **বোড়ে**—শ্বেতা সরকার
83 ✦ **অকপট**—এষা গাঙ্গুলী
83 ✦ **জীবন**—অভিরূপ বসু
84 ✦ **বন্ধুত্ব**—অরিজিৎ দাস
85 ✦ **ভ্রমণ বিচিত্রা**—অয়ন শেঠ
86 ✦ **জীবনের কথা**—স্নিগ্ধা বিষ্ণু
88 ✦ **অবতরণ**—দেবব্রত ঘোষ মলয়
89 ✦ **এক শতাব্দী পর**—দেবলীনা চাওলে
89 ✦ **ভিনদেশী পাখি**—রাজ
90 ✦ **অতীতের পাতা থেকে**—অশ্রুকণা পাল
90 ✦ **স্বাদবদল**—কুশল বিশ্বাস
91 ✦ **ফিরে দেখা**—প্রবীর কুমার পাছাল
92 ✦ **রবিঠাকুর**—দোলন দাস
92 ✦ **পূর্ণ অনুভূতি**—প্রিয়া কুন্ডু নন্দী
93 ✦ **বন্ধুত্ব**—রাজদীপ রায়
93 ✦ **রাত্রি**—সায়ন মণ্ডল

94 ✦ AN IMAGINARY CONVERSATION between the Moon and Indu—Purnendu Bhattacharyya
97 ✦ **The Downtown Cafe**—Souvik Chakraborty
98 ✦ **The Pole Star** —Pritam Makhal
98 ✦ **Night Sky**—Ranita Chakraborty
98 ✦ **The Death**—Anamitra Ray
99 ✦ **A monochromatic boy** —Sahan Das
100 ✦ **ALONE**—Dr. Jayita Roy (Ghoshal)
102 ✦ **বাবা হওয়া**—কৃষ্ণা ব্যানার্জী
104 ✦ **ডাঃ গজেন**—মনমিতা নাথ
106 ✦ **চক খড়ি**—অরি
109 ✦ **হাসতে মানা**—চিরন্তন মুখোপাধ্যায়
112 ✦ **এক, দুই, তিন**—উমা ভাদুড়ী
114 ✦ **চাউমিন**—অন্বেষা চ্যাটার্জী
115 ✦ **বর্তমানের আলোকে নজরুল : এক সাধারণ পাঠকের অনুভূতি**—প্রবীর বাগচী
119 ✦ **Where the Dreams Cross: T.S. Eliot and French Poetry. Chinmoy Guha. Primus Books. Pp. 227. Reprint Edition 2020. ISBN: 978-81-947560-0-2. New Delhi.**
—Subhasis Chattopadhyay
121 ✦ **Spirituality: An Examination in the Light of Sri Aurobindo's Insights**—Minakshi Pramanick
124 ✦ **"Whispers of Santiniketan"**—Sahan Das.
127 ✦ **Magic And Religion [Anthropology of Religion]**—Soumi Mondal
128 ✦ **Animals In Mythology**—Sayan Mukherjee
131 ✦ **The Child of Colour**—Utsab Sinha
133 ✦ **"THE MONTH"**
135 ✦ **ধনী হওয়ার সহজ উপায়**—সুখেন্দু কাঁড়ার
138 ✦ **আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব** —অনুরাগ পাল
140 ✦ **ভারতের কিছু স্বল্পখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিকথা**—সঙ্গম গায়েন
143 ✦ **শিক্ষা : ব্যবসার পণ্য নয়, প্রান্তিকের ন্যায্য অধিকার**—অহিন্দ্রী ব্যানার্জী
146 ✦ **ক্যুইজ**—সহেলী মান্না

শুভেচ্ছা বার্তা

প্রবহমান ইতিহাসের নিরিখে শতবর্ষ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর সময়। যেহেতু ভারতীয় মানুষ স্বভাবগতভাবে ইতিহাস অচেতন, তাই নরসিংহ দত্ত কলেজের শতবর্ষে পদার্পণের বিষয়টি সম্পর্কে পিছু ফিরে দেখা প্রয়োজন।এই শতাব্দী প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাওড়া শহর ও সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলের বৌদ্ধিক বিকাশে যে বিপুল অবদান রেখেছে, তার নিবিড় চর্চা প্রয়োজন।

সুদূর আর্মেনিয়া থেকে আগত আই আর বেলিলিয়াসের বসতবাড়িতে স্থাপিত, অঙ্কুরিত সেই কুঁড়ি আজ শাখা, পল্লবে, কান্ডে বিকশিত এক মহীরুহ। শহরের সামগ্রিক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের অতীত অবদান অক্ষুণ্ণ রাখাই আজ আমাদের একমাত্র কাজ।

শিক্ষা প্রাঙ্গণের মধ্যে থাকা পুষ্করিণীর সুচারু সংস্কার, বহু প্রতীক্ষিত অডিটোরিয়াম স্থাপন, বিভিন্ন আধুনিক বিষয়ে পঠনপাঠন শুরু এবং দৃষ্টিনন্দনভাবে শিক্ষাভবনের বিকাশের মাধ্যমে এই কলেজ পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করবে এটআমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং এই মর্মে আমরা যেন দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করি, এটাই আমার একমাত্র কামনা। সকলে ভালো থাকুন।

শ্রী পৃথ্বীশ রায়
সভাপতি
পরিচালন সমিতি
নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া।

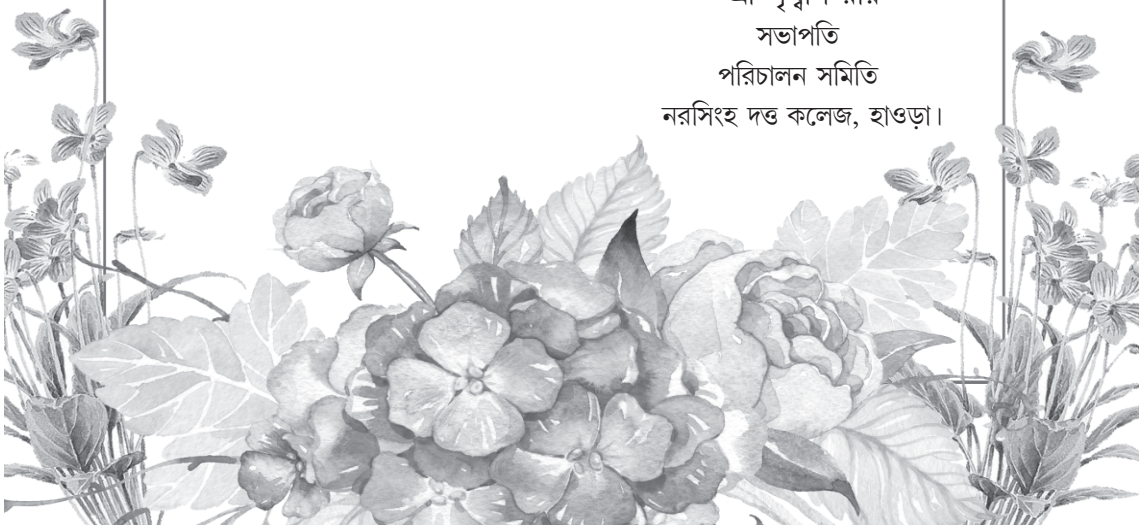

একশোয় সাত

সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

****

একশো বছরের ঋদ্ধ, ঐতিহ্যমন্ডিত এই প্রতিষ্ঠানে আমি মাত্র সাত বছরের অর্বাচীন। বাবার কাছে গল্প শুনেছি কদমতলার ডা: বিশ্বনাথ শেঠের নার্সিং হোমে আমার জন্ম। এ অঞ্চলের পুরোনো বাসিন্দারা নিশ্চয়ই সে নার্সিং হোমের কথা জানেন। এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়ে আসা আক্ষরিক অর্থে আমার জন্মস্থানে ফেরা। আমার জন্মের সময় এই প্রতিষ্ঠান পঞ্চাশে পা দেয়নি, আর আজ যখন তার একশোয়পা, তখন আমি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের সুযোগ পেয়েছি। এ আমার পরম সৌভাগ্য। সাত বছরে এই প্রতিষ্ঠানকে আমি কতটুকু দিতে পেরেছি জানিনা, তবে পেয়েছি অনেক, শিখেছি প্রচুর। আমার বড়ো হয়ে ওঠা, পড়াশোনা সবই হাওড়া জেলায়। তাই হাওড়া জেলার ঐতিহ্যশালী এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটা সুপ্ত আবেগ ছিলই। সেই আবেগ ধীরে ধীরে পূর্ণতা পায় যখন কলেজের ইতিহাসকে একটু ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করি। কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে প্রথম যেদিন কলেজের জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিল হাতে পেলাম, মনে হল আমি ইতিহাসকে নিজের হাতে স্পর্শ করলাম।

২০১৬ সালের ২২ নভেম্বর। আমি এই কলেজে জয়েন করতে এলাম। পরীক্ষক হিসাবে এই কলেজে আগেও এসেছি, কিন্তু অধ্যক্ষের ঘরে ঢোকা হয়নি। কলেজে ঢুকেই দেখলাম আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছে। কেউ একজন অধ্যক্ষের ঘরে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। দেখলাম অধ্যক্ষের চেয়ারে বসে আছেন কলেজের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। আমাকে টেবিলের উলটো দিকে বসিয়ে শুরু হোল পরিচালন সমিতির মিটিং। আমি তার আগা মাথা কিছু বুঝতে পারছিনা। তবে সমস্ত বিষয়টা অস্বাভাবিক তো বটেই, কিঞ্চিৎ অসম্মানজনকও লাগল। মনে মনে ভাবছি এ কেমন রঙ্গ যাদু! জয়েন করতে এসে টেবিলের উলটো দিকে বসিয়ে আমাকে এসব কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে!

নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার কয়েকদিন আগে কানে এসেছিল এই কলেজের কোন এক বর্ষীয়ান অধ্যাপক মন্তব্য করেছেন - 'নরসিংহ দত্ত কলেজে মহিলা অধ্যক্ষ! কমিশনের বোধহয় কিছু ভুল হয়েছে'। কি জানি সত্যিই তাদের ভুল কিছু হল না তো! এই উলটপুরাণ দেখে এমনটাই মনে হচ্ছিল। যা হোক বেশ কিছু সময় পরে আমার চেয়ারে আসীন ভদ্রলোক চেয়ারটা ছাড়লেন, আমি দুরুদুরু বুকে গুরুদায়িত্ব নিয়ে বসলাম বহু গুণীজনের কীর্তিতে অলংকৃত সেই চেয়ারে। উত্তরাধিকারের এই ভার সামলানো যে কতটা কঠিন, তা বুঝতে বেশি সময় লাগল না।

কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে কলেজের ভিতরের পুকুরটার পাশে এসে দাঁড়াই। কাকচক্ষু সেই জলদর্পণে ভেসে ওঠে গোটা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবিম্ব। তারা আমায় অনেক গল্প শোনায়। ইহুদি এক সাহেবের বসতবাটি থেকে আস্ত একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার নানারকম গল্প। অনেক রকম গল্প শুনি এই সাহেব আর তার এই ভদ্রাসন নিয়ে। কেউ বলেন এই গোটা অঞ্চল জুড়ে ছিল সাহেবের পশুখামার। কেউ বলেন এই খামার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি গঙ্গার ওপারে না পেয়ে সাহেব তট পরিবর্তন করেন। কেউ আবার বলেন বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে গিয়ে এর চেয়ে অনেক বেশি সম্পত্তি সাহেব খুইয়েছেন। সাহেবের বিচক্ষণ স্ত্রী রেবেকা হাল না ধরলে হয়তো এটুকুও বাঁচানো যেত না। এই 'এটুকু' র পরিমাণ শুনেও বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি। এই 'এটুকু' ই ছিল ১৪৪ বিঘা। প্রতিষ্ঠাতার পরিবার দাবি করেন পুরো সম্পত্তিটাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছিল। কিন্তু কুড়িয়ে কাছিয়ে কলেজের ভাগ্যে জুটেছে ৮ বিঘার কিছু বেশি। ব্যাপারটা ভেবে স্বাভাবিকভাবে মোটেই ভালো লাগেনি।

ক্লাস নিয়ে ফেরার পথে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন এক প্রবীণ অধ্যাপক। তিনি বললেন :

'আমি যখন এই কলেজে এসেছি, তখন কলেজ এরকম পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল না। এই পুকুরে জনসাধারণ স্নান করত, কাপড় কাচত।'

মনে মনে ভাবি আসলে কলেজটা এলাকার সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ির একটা অংশই ছিল। একটা নির্দিষ্ট ভূখন্ডকে এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রাতিষ্ঠানিক তকমা দেওয়ার ব্যাপারে কেউ বোধহয় সেরকম সক্রিয় হন নি। সম্ভবত অধ্যক্ষ স্বর্গীয় কেশব মুখোপাধ্যায়-এর সময়ে এই প্রতিষ্ঠান চার দেওয়ালের সীমানায় আবদ্ধ হয়।

পুকুরের উলটো দিক থেকে কলেজের মেন বিল্ডিং এর দিকে তাকালে বোঝা যায় বেলিলিয়াস সাহেব কত শৌখিনতার ছোঁয়া দিয়ে বানিয়েছিলেন তাঁর বসতবাটি। ঝুলবারান্দার কাঠের জাফরিগুলো যেন জীবন্ত ইতিহাসের দলিল। কিন্তু হন্যে হয়ে খুঁজেও বেলিলিয়াস সাহেব বা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সুরঞ্জন দত্ত মহাশয়ের কোনো পূর্ণাবয়ব ছবির সন্ধান মেলেনি। সন্ধান করার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলাম তখন থেকেই।

অফিসে কাজ করতে গিয়ে চোখে পড়েছে এক লোহার সিন্দুক। শুনে অবাক হয়েছি সেটি নাকি বেলিলিয়াস সাহেব ব্যবহার করতেন। আরও অবাক হয়েছি এ কথা জেনে, সেই সিন্দুকটি নাকি তামাম ভারতবর্ষে ওই এই একটিই আছে। শুনে শুধু গর্ববোধ করিনি, কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি পরমপিতার উদ্দেশে : 'আমায় অনেক দিয়েছ নাথ'

এলোমেলো কাগজপত্র, অগোছালো তথ্যভান্ডার ঠিকঠাক করতে গিয়ে দেখলাম এই প্রতিষ্ঠানের ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে চমকপ্রদ ইতিহাস। জগদ্দল পাথর হয়ে বসে থাকা কিছু ধ্যানধারণা আর অভ্যাসে বদল আনা কঠিন শুধু নয়, প্রায় অসম্ভব। ছোটো ছোটো বৃত্তের স্বঘোষিত অপরিহার্য কয়েকজন মানুষ প্রায় প্রত্যেকেই এক একজন অথরিটি। আমার দর্শন আবার একেবারে বিপরীত মেরুর। আমি কাউকে, এমনকি নিজেকেও কোনো ক্ষেত্রে অপরিহার্য মনে করি না। সম্পূর্ণ বিপরীত দুই কাজের ধারায় কখনও সংঘাত বাধেনি। তার একমাত্র কারণ প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে দু'পক্ষই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন, আর এটাই এই প্রতিষ্ঠানের সুনামের চাবিকাঠি।

পুরোনো দিনের গল্প শুনতে শুনতে কানে এসেছে কয়েকজন রঙিন অধ্যাপকদের কথা, যাঁরা একসময় তাঁদের চরমপন্থী কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠানের দন্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠেছিলেন। যাঁদের অনুমতি ছাড়া প্রতিষ্ঠানের একটি গাছের পাতারও নড়ার স্বাধীনতা ছিল না। আমার কার্যকালে আমি এমন কোনো চরমপন্থার মুখোমুখি হইনি এ আমার পরম সৌভাগ্য।

নিজের কাজের মধ্যে দিয়েই নিজেকে প্রমাণ করতে হবে এই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যে। স্বচ্ছভাবে সকলকে যুক্ত করে কাজ করতে পারলে তবেই সে কাজের সাফল্য আসে। আমার কাজের এই ধারা অচিরেই অভিনবত্ব আনে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিবেশে। চারপাশে আমি পাই প্রত্যয়ী সহকর্মী, ছাত্র, অভিভাবক, প্রাক্তনী।

যত দিন যায় কাজের পরিসর বাড়ে, বাড়ে প্রত্যয়ী বৃত্তের পরিধি। লোহার জয়েস্ট দিয়ে ম্যাজেনাইন কনফারেন্স রুম তৈরি করার সময় কোনো একজন অধ্যাপক বিদ্রূপ করে বলেছিলেন - 'এখানে তো হেলমেট পরে বসতে হবে'। ঘরটি লাইব্রেরি সংলগ্ন হওয়ায় সেই ঘরে পরবর্তীকালে তাঁকে নিবিষ্ট মনে পড়াশোনা করতে দেখেছি। বলা বাহুল্য তাঁর মাথায় হেলমেট কখনও দেখিনি।

প্রতিষ্ঠানের অনেক থেমে থাকা কাজে হাত দিতে গিয়ে জানতে পারলাম কোনো একসময় অধ্যাপকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'কলেজ কোলাজ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ হত কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, তার যাত্রা থেমে গিয়েছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। যে প্রতিষ্ঠান এক শতাব্দী ধরে এই বার্তা বয়ে নিয়ে চলেছে—জ্ঞানের উপরে কিছু নেই, সেখানে নিয়মিত প্রকাশনায় এমন ছেদ পড়ে যাওয়া! প্রকাশনা উপসমিতির কয়েকজন অধ্যাপককে নিয়ে উঠে পড়ে লাগলাম। স্থির হল সমস্ত রকম বিষয়ের গবেষণাপত্র নিয়ে আমরা প্রকাশ করব একটি পত্রিকা। পদার্থবিদ্যা বিভাগের এক অধ্যাপক সেই পত্রিকার নাম দিলেন 'জোকাস'। নরসিংহ দত্ত কলেজ থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হল একটি পিয়ার রিভিউড জার্নাল যার গুণমান এই প্রতিষ্ঠানের মুকুটে একটি পালক

লাগিয়ে দিল। শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে নিয়মিত। লেখা সংগ্রহ করা, রিভিউ করানো আর তা প্রকাশ করার জন্য সম্পাদকমন্ডলীর অধ্যাপকদের অধ্যবসায় আমাকে বারবার বিস্মিত করেছে।

এরপর ভাবা হল ছাত্রদের কথা। অধ্যাপক বন্ধুরা স্থির করলেন এমন আর একটি পত্রিকা আমরা প্রকাশ করব যেটা হবে ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাসহায়ক বন্ধু অর্থাৎ সমগ্র নরসিংহ দত্ত কলেজ পরিবারের সৃষ্টিশীল কাজের এক বিস্তীর্ণ ক্যানভাস। সকলের সামগ্রিক প্রয়াসে প্রকাশিত হল 'প্রবাহ'। এই 'প্রবাহ' আজও রুদ্ধগতি হয়নি। এখানেই শেষ নয়। প্রকাশনা উপসমিতির সদস্যরা স্বপ্ন দেখলেন নরসিংহ দত্ত কলেজের প্রকাশনাকে বিশ্বের প্রকাশনা বৃত্তে স্থান দেওয়ার। জীববিজ্ঞান বিভাগ এবং প্রকাশনা উপসমিতির যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হল আর একটি অনলাইন গবেষণাধর্মী পত্রিকা—'এন ডি সি ই বায়স'। শুধু প্রকাশনা নয় প্রথম সংখ্যা থেকে এই পত্রিকা নিজেকে বিশ্বপ্রকাশনার দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পেয়ে গিয়েছে আই এস এস এন নম্বর। মাত্র এই কয়েক বছরে নরসিংহ দত্ত কলেজের প্রকাশনার কাজ সাফল্যের যে উচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছে তার জন্য আমার সকল সহকর্মী বন্ধুকে কুর্নিশ জানাই।

সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলতে গিয়ে বুঝেছি সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে এক ছাতার তলায় আনা খুব সহজ নয়। ছোটো ছোটো কারণে পরস্পরের দূরত্ব আমাকে অবাক করেছে। কেমন যেন ছোটোবেলার আড়িভাব খেলার মতো। আবার ছাত্র আন্দোলনের জেরে অনেক রাত অবধি যখন ঘেরাও থেকেছি তখন দেখেছি সহকর্মীরা কতটা সংঘবদ্ধ। এই বৈচিত্র্যই এই প্রতিষ্ঠানের সুষমা।

শিক্ষকদের সাথে শিক্ষাসহায়ক সহকর্মীদের একটা অদ্ভুত সম্পর্ক লক্ষ করেছি এই কলেজে আসা থেকেই। অনেক শিক্ষককে দেখেছি দিনের বেশ কিছুটা সময় তিনি অফিসের কোনো করণিকের টেবিলের উলটো দিকের চেয়ারটায় বসেই কাটিয়ে দেন। একই সঙ্গে শিক্ষাসহায়ক বন্ধুদের বেশ কিছু বিষয়ে শিক্ষকদের অদ্ভুতভাবে উদাসীন থাকতে দেখেছি। শিক্ষকমহল কোথাও যেন নিজেদের কৌলীন্য বজায় রাখতে তৎপর হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের এই দুই স্তম্ভের ভারসাম্যের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা অনুধাবন করায় কোথাও যেন একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি দু'পক্ষই যাতে তাদের প্রাপ্য সম্মান বজায় রেখে সুস্থ কাজের পরিবেশ উপভোগ করতে পারেন। কতটা সফল হয়েছি জানিনা তবে যখন কোনো সহকর্মীর অবসরকালীন সভায় সকলকে একসাথে কষ্ট পেতে দেখেছি, স্মৃতিচারণ করতে দেখেছি, সম্মান প্রদর্শন করতে দেখেছি তখন বড়ো শান্তি পেয়েছি।

অন্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে খুব বেশি করে চোখে পড়েছে মূল্যবোধের ফারাক। একই প্রজন্মের সহকর্মীদের মধ্যে সৌজন্য, মূল্যবোধ, রুচি এইসব কিছুর অপরিসীম বিভিন্নতা আমাকে স্তম্ভিত করেছে। কোনো সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলে অবসরের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো কোনো অধ্যাপককে বলতে শুনেছি- 'ধুর মশাই এই রেখে দিন আপনার কনভেনরশিপ' আবার প্রায় তাঁর সমবয়সী অন্য এক অধ্যাপকের মুখে শুনেছি 'আপনি দায়িত্ব দিয়েছেন, পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব'।

অধ্যক্ষকে অসম্মান করা যখন একদলের কাছে অহংকার করার মতো পদক্ষেপ বলে মনে হয়েছে, তখন একই প্রজন্মের অন্য এক দল গর্ব অনুভব করেছেন অধ্যক্ষের নেতৃত্বের জন্য। বিভিন্ন সময়ে কঠিন কাজের দায়িত্ব আমার সহৃদয় দায়িত্বশীল সহকর্মীদের কাঁধে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছি আমি। চোখ বন্ধ করে ভরসা করতে পেরেছি আমার সমস্ত বয়সের, সমস্ত স্তরের সহকর্মীদের উপর। একদিনের নোটিশে আমার ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হয়েছেন সবাই। একবার নয় বারবার।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রধানের গুরুদায়িত্ব সামলাতে গিয়ে অনেক সময় অনেক কড়া পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। আমার থেকে বয়সে বড়ো অনেক মানুষকে কড়া নির্দেশ দিতে হয়েছে। খারাপ লেগেছে অনেক সময়। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সৌজন্যটুকু বজায় রাখার। সহযোগিতা করেছেন সকলেই। মনে মনে বিরক্ত হয়ে থাকলেও অনুযোগ জানাননি কেউই। সহযোগিতায়ও কোনো কার্পণ্য করেননি। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বন্ধুদের যে সমস্ত বিষয় সামলাতে হিমসিম খেতে দেখেছি, এই প্রতিষ্ঠানে আমি অনায়াসে সে সব সামলে দিয়েছি শুধুমাত্র আমার সহকর্মীদের উপর নির্ভর করে। অধ্যক্ষের একটি পৃথক

শ্রেণি আছে এমনটা এই প্রতিষ্ঠানে মনে হয়নি কখনও।

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কিছু প্রথা কালের নিয়মে আমরা পাল্টাতে বাধ্য হই। এতে স্বাভাবিক কারণেই কিছু অসন্তোষ তৈরি হয়। কিন্তু কত দ্রুততার সঙ্গে নতুন প্রথায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়, তার উদাহরণ এই প্রতিষ্ঠানে আমার সহকর্মীরা। ২০২০ সালের সেই ভয়াবহ দিন। আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা পৃথিবী। বন্ধ হয়ে গেল কলেজের দরজা অনির্দিষ্টকালের জন্য। স্তব্ধ হয়ে গেল কলরব, শিকেয় উঠল ছাত্রদের পড়াশুনো। রাতারাতি কাজে লেগে পড়লেন প্রযুক্তিদক্ষ শিক্ষকেরা। বর্ষীয়ান শিক্ষক যাঁরা সারাজীবন চক ডাস্টারে ক্লাস নিয়েই অভ্যস্ত, তাঁরাও অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজেদের তৈরি করে নিলেন ছাত্রদের স্বার্থে। হাওড়া জেলায় নরসিংহ দত্ত কলেজে প্রথম চালু হল অনলাইন ক্লাস, সরকারি নির্দেশ আসার অনেক আগে। হাওড়া জেলার প্রথম কলেজের গরিমা অক্ষুণ্ণ রইল প্রায় একশো বছর পরেও। শুধু ক্লাসই কেন প্রায় দু'বছর ধরে সমস্ত কলেজের অফিস, পরীক্ষা, অর্থনৈতিক কাজকর্ম এমনকি গ্রন্থাগারটিও অনলাইনে চলল নিখুঁতভাবে। বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের অভাবনীয় সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান পাওয়া গেল এই অসময়ে।

প্রায় দু'বছর পর ভয়াবহ অতিমারী কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরলাম আমরা। অতিমারীর মাঝখানে এই প্রতিষ্ঠানের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে আমফানের মত দুরন্ত তুফান। বিপর্যয়ের দ্বিফলায় ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে এই মহাবিদ্যালয়। বিল্ডিং থেকে শুরু করে কাগজপত্র, গুরুত্বপূর্ণ নথি থেকে শুরু করে মূল্যবান যন্ত্রপাতি সমস্ত কিছুতে ছড়িয়ে রয়েছে বিধ্বংসী বিপর্যয়ের ছাপ।

প্রথমদিন ঘরে ঢুকে মনে হয়েছিল কোনো এক ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছি। মাথায় বাজ ভেঙে পড়েছিল। কি করে এই প্রতিষ্ঠানকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে? কি করে প্রলেপ দেওয়া যাবে এই দগদগে ক্ষতস্থানে? কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব যে নয়, তা প্রমাণ করেছি আমরা সবাই। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি সবকিছু আবার আগের জায়গায় নিয়ে আসার জন্য। সকলের সহযোগিতায় এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ফিরে পেয়েছে তার হারিয়ে যাওয়া অবয়ব। হয়তো বা আগের থেকে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে।

অতিমারীর পরের দিনগুলোয় প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরনে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। 'নিও নর্ম্যাল' শব্দবন্ধের মধ্যে দিয়ে অনেক অদ্ভুত জিনিস আমরা অভ্যাস করে নিতে বাধ্য হয়েছি। অনলাইন পরীক্ষায় নিম্নমেধার ছাত্র প্রচুর নম্বর পেয়ে চলে এসেছে মেধা তালিকার উপরের দিকে। সিমেস্টার পদ্ধতির অপেক্ষাকৃত নতুন পাঠক্রমে সেই সমস্ত ছাত্রদের পড়াতে হিমসিম খেতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন শিক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত দপ্তরের কাজই কলেজের অপ্রতুল পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন অফিসের কর্মচারীরা। কিন্তু চাকাটা থেমে যায়নি কখনও।

অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করেছি ছাত্রদের মানসিকতায়। দীর্ঘ প্রায় দু'বছর ধরে আড়ালে থাকার অভ্যাস ছাত্রদের মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরিয়ে নিয়েছে। শিক্ষকদের সঙ্গে সরাসরি আলাপচারিতায় ওরা যেন আর আনন্দ পায় না। অতিমারীর দিনগুলোতে অনলাইনে হওয়া বিভিন্ন কাজে ওদের যত উৎসাহ দেখেছিলাম, এখন সে উৎসাহে ভাটা পড়েছে। শতবার্ষিকীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শত চেষ্টা করেও খুব বেশি ছাত্রকে সামিল করা গেল না। অনেক কষ্টে যাদের পাওয়া গেল, তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কেমন যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল সামাজিক দূরত্ব মানার সরকারি নির্দেশ পালন করতে করতে আমরা পরস্পরের থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছি। কিন্তু তাই বলে থেমে থাকেনি কিছুই। গুটিকয় ছাত্রছাত্রীর সুললিত পরিবেশনায় মুগ্ধ হয়েছে দর্শকমণ্ডলী।

খুব গর্ব হয় বলতে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে, যে কোনও শহরে খোঁজ করলে এই কলেজের একজন প্রাক্তনীর সন্ধান পাওয়া যায়। পোর্টব্লেয়ার বন্দর থেকে নীল দ্বীপ যাওয়ার ভেসেলে উঠব। মাথায় ছিল এই কলেজের এন এস এস এর ছাত্রদের আদর করে পরিয়ে দেওয়া একটি নীল টুপি। ব্যাগপত্র তল্লাশির পর এগিয়ে এসেছি ভেসেলে চড়ার শেষ ধাপে। ছিপছিপে গড়নের ভারতীয় নৌবাহিনীর এক জওয়ান এগিয়ে এলো।

'ম্যাডাম আপনি নরসিংহ দত্ত কলেজে পড়ান! আমি

ঐ কলেজের ছাত্র। ম্যাডাম অংকের ওই স্যার এখনও আছেন?'

এই ছেলের জীবনের অংক কতটা সঠিক হয়েছে জানিনা কিন্তু এই কলেজের সাথে নিবিড় সম্পর্কের অংকে কোনও গরমিল হয়নি। এই কলেজের প্রাক্তনী সংসদের অনেক সদস্যই আমার অগ্রজপ্রতিম। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে যে সম্মান ও সৌজন্য আমি পেয়েছি, তা আমার জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।

আমি এই প্রতিষ্ঠানে আসার আগে যাঁরা অবসর নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকের সাথেই পরিচয় হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। সরকারি দপ্তরে লাল ফিতের ফাঁসে আটকে থাকা প্রাপ্তি উদ্ধারের জন্য সাহায্য চাইতে এসেছেন অনেকে, কেউ বা এসেছেন ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে। তাদের প্রায় সকলের মুখে দেখেছি পরিতৃপ্তির হাসি। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের সঙ্গে অনেক সময় কলেজের বাইরেও দেখা হয়েছে। কখনও থিয়েটার দেখতে গিয়ে, কখনও কোনো পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে, কখনও বা কারো পারিবারিক অনুষ্ঠানে। অগ্রজ সকলের কাছে যথাযথ সম্মান পেয়েছি। আন্তরিক আতিথ্য পেয়েছি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের বাৎসরিক মিলনমেলায়। আবার নিজের পাওনা বুঝে নেওয়ার তাগিদে আমাকে হাইকোর্টও দেখিয়েছেন এক প্রাক্তন অধ্যাপক। যদিও আমি বাঙাল নই।

একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল। সেদিন হেঁটে যাচ্ছিলাম কলেজ স্ট্রিটের এক গলি দিয়ে। হঠাৎ দেখলাম কয়েকদিন আগে অবসর নেওয়া এক অধ্যাপক আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন। কোনো কথা বললেন না। আমি ভাবলাম আপনমনে চলেছেন হয়তো খেয়াল করেননি। কিছুক্ষণ পরে উনি এক পাক ঘুরে সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কুশল বিনিময়ের সৌজন্যটুকুও না দেখিয়ে ফস করে বলে বসলেন- 'আমার পি এফ এর ইন্টারেস্টটা'। সত্যিই ইন্টারেস্টিং। কিশোরকুমারের একটা বিখ্যাত গানের লাইন মনে পড়ে গেল- "পাঁচ রুপাইয়া বারা আনা"।

আর একটি স্তম্ভের কথা না বললেই নয়, তা হল কলেজের পরিচালন সমিতি। এই সাতবছরে পরিচালন সমিতিতে দু'দফায় সদস্যদের পেয়েছি। কলেজের সার্বিক উন্নয়নে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি সকলের কাছে। কলেজের গেট থেকে সোলার সিস্টেম, শূন্যপদে নিয়োগ থেকে সার্বিক সৌন্দর্যায়ন, ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রয়োজনে যথাসম্ভব সহযোগিতা সবটাই পেয়েছি পরিচালন সমিতির কাছে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মহিলা অধ্যক্ষের প্রতি তাঁদের সম্মান ও সহমর্মিতা।

শিক্ষক পরিষদের সম্পাদকের ব্যাটনটি প্রতিষ্ঠানের নবীনতম অধ্যাপকের হাতে তুলে দিয়ে সহকর্মীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে দেখেছি এক প্রবীণ অধ্যাপককে। শ্রদ্ধা জেগেছে তাঁর প্রতি। সেই শিক্ষক পরিষদেরই জনৈক সদস্য যখন সমস্ত সৌজন্য, সভ্যতা, রুচি, মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে অভব্য আচরণ করেছেন অধ্যক্ষের সাথে, তখন একজন মহিলা হিসাবে সম্ভ্রম ও নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছি। সংকটের সেই মুহূর্তে ঘটনার নায়কের দু'একজন সঙ্গীসাথী ছাড়া পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রত্যেকেই। সকল স্তরের সহকর্মীরা। সবচেয়ে জোরালো ভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে পরিচালন সমিতি। শতাব্দী প্রাচীন এই মহাবিদ্যালয়ে হয়তো বা কমিশনের ভুলে নিযুক্ত হওয়া প্রথম মহিলা অধ্যক্ষের সম্মান ও সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন যা আগামী দিনে এই মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করবে এই আশা রাখি।

শুধুমাত্র পেশার বৃত্তে নয় ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের সময়ও পাশে পেয়েছি আমার বহু সহৃদয় সহকর্মীকে। প্রিয়জন বিয়োগের কঠিন সময়ে ছায়ার মতো আমার সঙ্গে থেকেছেন আমার সহকর্মীদের একটি বড়ো অংশ। সুজন হতে গেলে যে স্বজন হতে হয়না এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন অক্ষরে অক্ষরে।

যাই হোক সাফল্য, ব্যর্থতা, সমর্থন, বিরোধিতা, আর সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতাকে সঙ্গী করে এই মহাবিদ্যালয়ে কেটে গেল সাতটা বছর। আজ মহাবিদ্যালয়ের শতবার্ষিকীর এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে একটাই কথা বলতে ইচ্ছে করে :

'আমি অকৃতী অধম বলেও তো
কিছু কম করে মোরে দাওনি
যা দিয়েছ তারই অযোগ্য ভাবিয়া
কেড়েও তো কিছু নাওনি'

এই প্রতিষ্ঠানের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস খুঁজে বের করার জন্য যখন প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছি, তখন কয়েকজন অধ্যাপক প্রত্যয় জুগিয়েছেন—

'কিছু ছবি আমরা দেখেছিলাম ম্যাডাম। আছে নিশ্চয়ই কোথাও-'

না, এই আশার বাণী ছাড়া বিশেষ কিছু পাইনি। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পার্শ্ববর্তী 'রেবেকা বেলিলিয়াস ট্রাস্ট' এর বন্ধুরা। আর হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সুরঞ্জন দত্তের পরিবার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গিয়েছে অনাদরে অবহেলায় ধুলো ময়লায় মিশে থাকা জনা ছয়েক অধ্যক্ষের ছবি। যে ছবিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমার ভবিষ্যৎ। অনেক কিছু পাওয়া গেলেও পাওয়া যায়নি অমূল্য সেই রতন— রেবেকা বেলিলিয়াসের কোনো নিদর্শন।

আমার ক্ষুদ্র যোগ্যতা দিয়ে এই মহাবিদ্যালয়ের মহা কর্মযজ্ঞের শরিক হতে পেরেছি আমি। এ আমার পরম প্রাপ্তি। সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে বিনীত অনুরোধ আপনারা পাশে থাকুন যাতে এই প্রতিষ্ঠান তার ঐতিহ্য, সুনাম সুরক্ষিত রাখতে পারে। অগ্রজরা ভুলভ্রান্তি মার্জনা করে সঠিক পথের দিশা দেখাবেন। অনুজরা সৌজন্যেটুকু বজায় রাখবেন যাতে অধ্যক্ষের চেয়ারের কোনো অমর্যাদা না হয়।

কথা প্রসঙ্গে শুনেছি এই কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ কক্ষটি বেলিলিয়াস সাহেবের অতি প্রিয় ছিল। উলটো দিকের বিদেশি কাঁচ লাগানো ঘরটি, যেটি বর্তমানে অধ্যাপকরা বসেন, সেটি ছিল সাহেবের নাচঘর। অনেকে মজা করে বলেন নিশুতি রাতে এখনও নাকি বিচিত্র শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। সাহেবকে নিয়ে বহু কথা শুনলেও আমি কুর্নিশ জানাই ওঁর স্ত্রী রেবেকা বেলিলিয়াসকে। সেই অসামান্যা নিঃসন্তান নারী, যিনি আজ থেকে একশো বছরেরও বেশি সময় আগে ভাবতে পেরেছিলেন পরবর্তী প্রজন্মের কথা। স্বামীর অর্জিত এই সাম্রাজ্য নির্দ্বিধায় দান করেছিলেন এলাকায় শিক্ষাবিস্তারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। আজ তিনি স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন। নিতান্ত একটা ছবিও তাঁর সংরক্ষিত হয়নি। একজন মহিলাকে নিয়োগ করে কমিশন কিছু 'ভুল' করেছিল কিনা সে প্রশ্নের উত্তর সময় দেবে। তবে এই মহীয়সী ভাগ্যিস তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করার 'ভুল' টি করেছিলেন, তাই হাওড়ার বুকে এই শিক্ষাপ্রাঙ্গণ রূপায়িত হয়েছিল। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এই অসামান্যা নারীকে।

এবড়োখেবড়ো পথ পেরিয়ে দীর্ঘ একশো বছর পার করে যাওয়া এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই এই পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সমস্ত সদস্যকে যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এই পত্রিকার শতবার্ষিকী সংকলনকে এক ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। শুভেচ্ছা জানাই তাদের সকলকে যারা তাদের সৃষ্টিশীল কাজের সম্ভার দিয়ে এই অমূল্য সংকলনের শোভাবর্ধন করেছেন।

আর সবার শেষে শতবার্ষিকীর অসামান্য লোগোটি তৈরী করার জন্য আমার প্রাণভরা স্নেহাশিস জানাই ইংরাজী বিভাগের সদ্য প্রাক্তনী সুদিন মল্লিককে। ওর এই সৃষ্টি আমাদের সকলকে শির উঁচিয়ে শতাব্দী পার করার প্রেরণা জাগিয়েছে। এই অনবদ্য শিল্পভাবনাকে কুর্নিশ জানাই।

শতবর্ষের ব্রতযাত্রায় স্মরণীয় উত্তরাধিকার : আইজ্যাক বেলিলিয়াস, নরসিংহ দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

****

'হাওড়' বা জলাভূমি সংকুল প্রাচীন হাওড়ার শিল্পাঞ্চল বেলিলিয়াস রোডে ইহুদি ব্যবসায়ী আইজ্যাক রাফায়েল বেলিলিয়াস সাহেবের বাগানবাড়িতে বেলিলিয়াস-পত্নী রেবেকার পৃষ্ঠপোষকতায় ও হাওড়ার বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী রায় নরসিংহ দত্ত বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র সুরঞ্জন দত্তের উদ্যোগে মাত্র সাত জন শিক্ষক ও একশ'র কিছু বেশি শিক্ষার্থীকে নিয়ে নরসিংহ দত্ত কলেজের যাত্রারম্ভ হয়েছিলো ১৯২৪-এ। আজ সেই মহাবিদ্যালয় শতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি-সত্তার কলতানে মুখরিত।

শতবর্ষ-প্রাচীন এই নরসিংহ দত্ত কলেজের পত্তন ও ক্রমবিকাশের আলোচনায় সঙ্গতভাবেই চলে আসে উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত নরসিংহ দত্তের কর্মবৃত্ত ও সেই সুবাদে বেলিলিয়াস সাহেবের সঙ্গে গড়ে ওঠা তাঁর সখ্যের প্রসঙ্গ। খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী নরসিংহ দত্তের জন্ম হয়েছিলো হাওড়া শহরে ১৮৫০-এ। হাওড়া জেলা স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীতে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ পাশ করে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন-এর ডিগ্রী অর্জন করে তিনি কলকাতা উচ্চ আদালতে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন।[১] পরে হাওড়া ও হুগলি জেলা আদালতেও আইন-ব্যবসায় ব্রতী হন। অল্প দিনের মধ্যেই আইন-ব্যবসায়ীরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন নরসিংহ দত্ত। অতঃপর বহু বিশিষ্ট বিত্তশালী ব্যক্তি এবং দেশী-বিদেশী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাঁকে তাঁদের স্থায়ী আইনী পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন।[২] এঁদেরই অন্যতম ছিলেন আইজাক রাফায়েল বেলিলিয়াস যাঁর সঙ্গে নরসিংহ দত্তের এক পারিবারিক সখ্যও গড়ে উঠেছিলো। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে হাওড়ার সরকারি উকিল ও পরে নোটারি পাবলিক নিযুক্ত হন নরসিংহ দত্ত। কর্মজীবনের সুদীর্ঘ বাইশ বছর তিনি হাওড়া পৌরসভার সদস্য হিসাবে কাজ করেন এবং শেষ ছ' বছর তিনি সহ-সভাপতি পদে আসীন ছিলেন। ঐ সময়ে রামকৃষ্ণপুর ও সালকিয়ার ধনী ব্যবসায়ীদের অর্থে স্নানের ঘাট নির্মাণ, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ইত্যাদি বহু জনহিতকর কর্মকাণ্ডে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। এছাড়াও হাওড়ার টাউন হল নির্মাণে তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা।[৩] তাঁর এইসব জনহিতকর কাজের জন্য ইংরেজ শাসক তাঁকে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে রায়বাহাদুর উপাধি প্রদান করেছিলো।[৪]

আইজাক রাফায়েল বেলিলিয়াস জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতার বাগদাদি ইহুদি সম্প্রদায়ভুক্ত এক পরিবারে। তাঁর পিতা রাফায়েল ইমানুয়েল বেলিলিয়াস এবং মাতা সালহা কোহেন। তাঁদের পাঁচ কন্যা ও তিন পুত্রসন্তানের মধ্যে আইজাক রাফায়েল ছিলেন কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমানুয়েল রাফায়েল বেলিলিয়াস ছিলেন হংকং সাংহাই ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। আইজাক রাফায়েল ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে সিঙ্গাপুরে একটি ট্রেডিং কোম্পানি খোলেন এবং গবাদি পশুর ব্যবসা করে প্রভূত উন্নতি করেন।[৫] যতদূর জানা যায় ১৮৯৮ সালে এই ধনী বণিক কলকাতায় ফিরে আসেন যদিও সিঙ্গাপুরে তাঁর ব্যবসা চালু থাকে জনৈক আবদুল ওদুদের পরিচালনায়। ১৯১০-এ বেলিলিয়াস সাহেব প্রয়াত হলে তার পর থেকে ১৯২১ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে ব্যবসার তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে তাঁর পত্নী রেবেকার ওপর।[৬]

সিঙ্গাপুর থেকে কলকাতায় ফিরে কলকাতার লাগোয়া গঙ্গাতীরবর্তী হাওড়ায় ১৪৪ বিঘা জমির উপর ফল-ফুলের বিশাল বাগানসহ অট্টালিকা বানিয়েছিলেন

বেলিলিয়াস সাহেব। আর এই সময় থেকেই হাওড়ার তদানীন্তন সরকারি উকিল তথা নামজাদা নোটারি পাবলিক রায়বাহাদুর নরসিংহ দত্তের সঙ্গে আইজাক রাফায়েলের হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিলো। বেলিলিয়াস পরিবারের সম্পত্তির আয় থেকে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা ছিলো নরসিংহ দত্তের। এখন বেলিলিয়াস রোড নামে পরিচিত রাস্তাটির সংস্কারেও বেলিলিয়াস সাহেবের অর্থানুকূল্য ছিলো। আইজাক রাফায়েল বেলিলিয়াস ও তার স্ত্রী রেবেকা নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁদের বিশাল সম্পত্তির দেখাশোনার জন্য যে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয় তার সদস্য ছিলেন নরসিংহ দত্ত। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নরসিংহ দত্ত এবং ঐ বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে আইজাক রাফায়েল প্রয়াত হন। নরসিংহ দত্তের দ্বিতীয় পুত্র বিদ্যানুরাগী সুরঞ্জন দত্ত ট্রাস্টি বোর্ডে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তাঁরই আগ্রহে ও রেবেকার সহায়তায় সেদিনের পিছিয়ে পড়া হাওড়ায় বেলিলিয়াস দম্পতির প্রাসাদোপম বসতবাড়ি ও সংলগ্ন পার্কে প্রতিষ্ঠিত হয় নরসিংহ দত্ত কলেজ।[৭] সে-সময় বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে হাওড়ার প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য গঙ্গা পেরিয়ে যেতে হতো কলকাতার কলেজে। বেলিলিয়াস সাহেবের ভদ্রাসনে একশ' বছর আগে তাই উচ্চশিক্ষার চারাগাছটি পরম যত্নে রোপণ করলেন বেলিলিয়াস-পত্নী রেবেকা ও বন্ধুপুত্র সুরঞ্জন। বাকিটা ইতিহাস।

রোপণের ইতিহাস থেকে এবার আমাদের খানিক ফিরে দেখা লালনের ইতিহাস। শিশুসন্তানকে বড়ো করে তোলার মতোই, হয়তো বা তার থেকেও কঠিন, পিছিয়ে থাকা শিল্পশহরের মাটি আর জলবায়ুতে উচ্চশিক্ষার মনোবীজ থেকে অঙ্কুরিত চারাগাছটিকে যথাসাধ্য পুষ্টি ও সুরক্ষায় পূর্ণতা দেওয়া। রোপণের পর এই শিশু-প্রতিষ্ঠানের লালনের ভার পড়েছিলো অধ্যক্ষ বর্ষীয়ান অধ্যাপক মতিলাল চট্টোপাধ্যায় (শোনা যায় যে মতিলালবাবু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গৃহশিক্ষক ছিলেন) ও তাঁর তরুণ উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনের হাতে। কলেজের সূচনা-পর্বের পঠন-পাঠন ও প্রয়োজনীয় পর্রশাসনিক লালনের একটা ছবি হয়তো পাওয়া যাবে সেই প্রতিষ্ঠাবর্ষের এক মাননীয় প্রক্তনী সন্তোষকুমার বসুর স্মৃতিচারণে। তাঁর অষ্টআশি বছর বয়সে তিনি কলেজে এসেছিলেন ১৯৯৪-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর প্রণম্য শিক্ষক তথা নরসিংহ দত্ত কলেজের রূপকার বলে সর্বজনবিদিত অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। সন্তোষকুমার বসুর স্মৃতিভাষ্যের কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করছি "১৯২৪ সালে এই নরসিংহ দত্ত কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। আমিও ঐ সালেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে এই কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসাবে ভর্তি হই এবং ১৯২৬ সালে I. Sc. পাশ করে এই কলেজ ছাড়ি। [] কলকাতার কলেজে পড়ব, রোজ কলকাতায় যাব, কলকাতাটাকে চিনবো এইরকম সব স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু এই কলেজ কর্তৃপক্ষের অন্যতম শ্রদ্ধেয় শ্রী সুরঞ্জন দত্ত মহাশয় আমার অভিভাবককে বলেছিলেন যে হাওড়ার ছাত্ররা যদি কলকাতার কলেজে পড়তে যায় তবে হাওড়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠা করলাম কাদের জন্য। তিনি আরও বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন এই কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন বিজ্ঞানী জ্ঞান সেন। ইনিই আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয়ের স্নেহধন্য তিন জ্ঞানবাবুদের অন্যতম। [] জ্ঞানবাবু তখন ২৯/৩০ বৎসর বয়সের সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক। গম্ভীর প্রকৃতির বুদ্ধিদীপ্ত অধ্যাপক। [...] আমরা সকলেই তাঁকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। তিনি আমাদের কেমিস্ট্রি পড়াতেন। [] স্যার নিজেই আমাদের Practical ও করাতেন। [] পড়ানোর কাজ ছাড়াও তাঁকে দেখেছি কলেজের Official কাজকর্ম দেখতে। অধ্যক্ষ মতিবাবুর বয়স অনেক হয়েছিল। সব Official কাজকর্ম সেই বয়সে তাঁর পক্ষে দেখাশুনা করা সম্ভব ছিল না। সে জন্য স্যারকেই সব দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। একসঙ্গে পড়ানোর এবং কলেজ সুষ্ঠুভাবে চালানর সব দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হয়েছিল। স্যার তখন থাকতেন কলেজের বিপরীত দিকে বেলিলিয়াস সাহেবের Office বাড়ীর দোতলার একটা কোয়ার্টারে। আমরা প্রয়োজন বুঝে সেখানে স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি সস্নেহে সহজ সরল ভাষায় আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দিতেন"।[৮]

লালনের এই প্রাথমিক পর্বে কলেজের আর এক

বরেণ্য প্রাক্তনী, উত্তরকালে রসায়নশাস্ত্রের যশস্বী অধ্যাপক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য, মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী একসময় এই কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মণীন্দ্রমোহন তাঁর শিক্ষাগুরু অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথকে কৃতবিদ্য ও কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক তথা কলেজের অন্যতম রূপকার হিসাবে স্মরণ করেছিলেন[৯] এবং অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন জন্মশতবার্ষিকী স্মারকপুস্তিকায় প্রকাশিত স্মৃতিতর্পণে কলেজের লালনের ইতিহাসে শিক্ষক ও প্রশাসক জ্ঞানেন্দ্রনাথের দরদী দায়বদ্ধতার উল্লেখ করেছিলেন[১০] "আমার পূজনীয় অধ্যাপক প্রয়াত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে। আমি অধ্যাপক সেনের কাছে কেমিস্ট্রির প্রথম পাঠ শুরু করি। কেমিস্ট্রির মত দুরূহ বিজ্ঞানের বিষয়কে কি করে সরল ও সরস করে তুলতে হয় তার মন্ত্র তিনি জানতেন। তখন নরসিংহ দত্ত কলেজ সবে কৈশোরে পড়েছে। তখনও বি. এস. সি পড়ান শুরু হয়নি। কলেজকে আরও প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ছাত্রদের পরীক্ষার ফল ভাল হওয়া দরকার-এটা অধ্যাপকদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। সেই কাজ যাঁরা প্রাণ দিয়ে করতেন অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য"। এছাড়াও শ্রদ্ধাবনত কৃতবিদ্য ছাত্র স্মরণ করেছিলেন তাঁর পূজনীয় অধ্যাপকের শিক্ষাদানের কার্য্যকরী ও উদ্দীপক পদ্ধতি "রসায়নে নবদিগন্ত উন্মোচনের কাহিনী গল্পের মত করে বলা। যেসব বৈজ্ঞানিক ও রসায়নবিদ এই শাস্ত্রটিকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছেন তাঁদের জীবনী ছাত্রদের কাছে বলা। সর্বোপরি রসায়ন যে হাতে কলমে কাজ করার ব্যাপার তা তিনি ক্লাসে ও ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিয়ে ছাত্রদের উজ্জীবিত করতেন"। এরপর স্মৃতিচারণরত ছাত্র উল্লেখ করেছিলেন শ্রেণি-শিক্ষার পরিসরের বাইরে গুরু-শিষ্য পরম্পরাগত লালনের সেই মূল্যবান দিকটি "কিন্তু পড়ার বাইরে তাঁকে পাওয়া যেত স্নেহশীল পিতা ও বন্ধুর ভূমিকায়। তাঁর বাসস্থানে গিয়ে তাঁর পত্নী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করা আমাদের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর বাড়ীতে গিয়েছি, কিন্তু কিছু খেয়ে আসিনি, এ' ঘটনা কখনই ঘটেনি। যদি বেলা হয়ে যেত তা হলে বলতেন, 'এখানেই বাড়ীতে যা' হয়েছে একটু শাক-ভাত খেয়ে যাও"'।

কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ বর্ষীয়ান মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক দায়ভার অনেকাংশেই বহন করতেন তরুণ ছাত্রদরদী তথা প্রতিষ্ঠানদরদী উপাধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন যিনি অবশেষে অধ্যক্ষের আনুষ্ঠানিক দায়িত্বে বৃত হয়েছিলেন ১৯৪০ সালে। পঠন-পাঠন, কলেজের সুষ্ঠু পরিচালনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আশানুরূপ ফলাফল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই কলেজ যে ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে স্নাতক ডিগ্রি কলেজের প্রাপ্তবয়স্কতা অর্জন করেছিলো তার প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। ১৯২৪-এ পড়তে আসা সন্তোষকুমার বসুকে দু'বছরে আই. এসসি পাশ করে কলেজ ছেড়ে যেতে হয়েছিলো। ১৯৩৭-এ পড়তে এসেছিলেন মণীন্দ্রমোহন, কিন্তু তখনও কলেজে বি. এসসি পড়ানো শুরু হয় নি। তাঁকেও কলেজ ছাড়তে হয় ঐ দু'বছরের পর। তবে শিক্ষাদানের উৎকর্ষসাধন ও পরীক্ষার্থীদের ভালো ফল হলে উচ্চতর পাঠ-প্রশিক্ষণের অনুমোদন মিলবে, আর তাই সে-কাজে অধ্যাপকদের পুরোভাগে থাকতেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ, এ-বিষয়টি তাঁর নজরে পড়েছিলো।

১৮৯৫-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত বাংলার যশোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। পিতা মহেন্দ্রনাথ সেন ও পিতামহ কালিবর সেন দুজনেই ছিলেন যশোর আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবি। দশ বছর বয়সে বালক জ্ঞানেন্দ্রনাথ কলকাতায় তাঁর মাতুলালয়ে চলে আসেন এবং মর্টন ইনস্টিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯০৯ সালে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ এরপর ১৯১৩ সালে রসায়নবিদ্যায় স্নাতক সাম্মানিকে প্রথম শ্রেণির ডিগ্রি লাভ করেন ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। অতঃপর এসেছিলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালের ইতিহাসে সেই বিস্ময়বর্ষ ১৯১৫, 'অ্যানাস মিরাবিলিস', যে বছর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের তিন প্রিয় ছাত্র, 'জ্ঞানত্রয়ী', জ্ঞান ঘোষ জ্ঞান মুখার্জী জ্ঞান সেন, রসায়নশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় যথাক্রমে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়

হয়েছিলেন। এছাড়াও উত্তরকালের বিশিষ্ট শিক্ষক ও গ্রন্থকার ল্যাডলি মোহন মিত্র ছিলেন ঐ ১৯১৫-র স্নাতকোত্তর রসায়নবিদ্যার 'সোনার তরী'তে 'জ্ঞানত্রয়ী'-র আর এক সহযাত্রী। তদুপরি ঐ একই বছরে অপরাপর কৃতবিদ্যদের তালিকা আলো করেছিলেন মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

ছোটবেলা থেকেই জ্ঞানেন্দ্রনাথের বাসনা ছিলো বড়ো বিজ্ঞানী হওয়ার। সেইমতো বিজ্ঞান কলেজে ১৯১৫-তেই গবেষণা শুরু করেছিলেন তারকনাথ পালিত রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে। কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে অচিরেই ব্যাহত হয়েছিলো গবেষণা। বছরখানেক বিরতির পর নতুন করে কাজ শুরু হলে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ এসেছিলো বঙ্গবাসী কলেজে। অতঃপর শিক্ষকতা এবং বিজ্ঞান কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণার কাজ পাশাপাশি চলতে থাকলো। অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র মিত্র এবং অধ্যাপক রসিকলাল দত্তের সঙ্গে যুগ্মভাবে তাঁর বেশ কয়েকটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯১৭ ও ১৯১৯ সালে American Chemical Society G Transactions of the Chemical Society (London)-এর মতো জার্নালে। তবে মনে হয় শিক্ষকতা ও গবেষণার টানাপোড়েনে জ্ঞানেন্দ্রনাথ হয়তো খানিক ঝুঁকেছিলেন শিক্ষকতার দিকে। আর তাই হোলকার কলেজের ডাকে সাড়া দিয়ে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে পাড়ি দিলেন ইন্দোর। সেখান থেকে ১৯২৩-এ আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরে ও সেন্ট জনস কলেজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য্য অধ্যাপক সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণে শিক্ষকতার ব্রতে জ্ঞানেন্দ্রনাথের এই ঝোঁকের কথাটি পাওয়া যাচ্ছে 'A highly conscientious and devoted teacher, he liked to come in contact with young learners and give them his best. So when a call came from Holkar College and then from Agra University and St. John's College Agra– he was torn between two loves, teaching and research. But he chose to devote himself to teaching and that remained his life—long pursuit'.[১১]

১৯২৪-এ হাওড়া জেলার উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। শিক্ষানুরাগী সুরঞ্জন দত্ত তাঁর প্রয়াত পিতার স্মৃতিতে গড়ে তুললেন নরসিংহ দত্ত কলেজ। আর তাঁর স্নেহময় পিতা মহেন্দ্রনাথের কথামতো ভিনরাজ্যে শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ উপাধ্যক্ষের পদে যোগ দিলেন সে-সময় শিক্ষায় যথেষ্ট পশ্চাৎপদ হাওড়া জেলার সদ্য-প্রতিষ্ঠিত একটি কলেজে অভিভাবকের আন্তরিক দায়বদ্ধতায়। শোনা যায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পরামর্শেই কলেজ কর্তৃপক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথকে উপাধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করেছিলেন এবং আচার্যের আদর্শে দীক্ষিত জ্ঞানেন্দ্রনাথের কাছে তাঁর শিক্ষাগুরুর নির্দেশই ছিলো শিরোধার্য।[১২] গবেষণা ও অধ্যাপনায় ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জনের পথ থেকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ এভাবেই সরে এসেছিলেন কুলিটাউন হাওড়ার একটি সদ্যোজাত শিক্ষাসত্রকে তাঁর শ্রম ও সনিষ্ঠ প্রত্যয়ে গড়ে তুলতে।

১৯২৪ থেকে ১৯৪০ সময়পর্বে মোট চার জন অধ্যক্ষ স্বল্পমেয়াদী দায়িত্বে থাকলেও উপাধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথই ছিলেন কলেজের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল কাণ্ডারী। ১৯৪০-এ তিনি অধ্যক্ষ পদে বৃত হন এবং ১৯৬০ সালে অবসরের সময় পর্যন্ত তিনিই ছিলেন ততোদিনে প্রাপ্তবয়স্ক ও সু-প্রতিষ্ঠিত এবং অধুনা শতায়ু নরসিংহ দত্ত কলেজের প্রাণপুরুষ। ১৯৪০-এ তাঁর অধ্যক্ষ পদে আসীন হওয়ার সময় কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিলো মোটামুটি তিনশ' আর তাঁর অবসরের বছরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছিলো কমবেশি বারোশ'। অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বে কলেজে স্নাতক স্তরের অনুমোদন মিলেছিলো। ১৯৪৬-এ রসায়ন ও গণিতে সাম্মানিক পাঠক্রম শুরু হয়েছিলো। ১৯৫০ সালে কলেজে প্রচলন হয়েছিলো সহশিক্ষার যা ছিলো সেসময় জেলার ছাত্রীদের কাছে উচ্চশিক্ষার এক দুর্লভ সুযোগ। শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনের পাশাপাশি প্র্যাকটিকাল ক্লাসের সুবিধার্থে পরীক্ষাগার নির্মাণ ও তার আধুনিকীকরণেও সচেষ্ট ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। বিশেষ করে তাঁর প্রিয় বিষয় রসায়নের পরীক্ষাগারটি তিনি গবেষণার উপযোগী করে গড়ে তুলতে আধুনিক সরঞ্জাম ও উপকরণে তাকে সজ্জিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শোনা যায় জ্ঞানেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় কলেজের দুই শিক্ষক সেই

রসায়নাগারেই তাঁদের গবেষণার কাজ সম্পন্ন করে ডি. এস সি. ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। ১৯৫৭ সালে বায়ো-সায়েন্স কোর্স খুলতে ৮০০০ টাকার বরাদ্দ অনুমোদন করেছিলেন অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে পূর্ণযৌবনে বিকশিত হওয়ার এই সময়পর্বে অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মনোযোগ দিয়েছিলেন শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সঙ্গীত, নাটক, আবৃত্তি, বিতর্ক, সাহিত্য-চর্চা, খেলাধূলা ও শরীর-চর্চায়। কলেজে তৈরি করেছিলেন 'Scientific and Literary Society' যার কাজ ছিলো অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মিলিত উদ্যোগে তর্ক-বিতর্ক-আলোচনার আয়োজন।[১৩] শিক্ষার্থীদের শরীর-চর্চার প্রশিক্ষণ দিতে একজন ফিজিক্যাল ইন্সট্রাকটর নিয়োগ করেছিলেন। এছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের নানা বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করতে জ্ঞানেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কলেজে পদার্পণ করেছিলেন তদকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে অনেকেই কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, সমাজবিজ্ঞানী বিনয় কুমার সরকার, বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রাজনীতিবিদ তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কৈলাশনাথ কাটজু প্রমুখ। জ্ঞানেন্দ্রনাথেরই উৎসাহে ১৯৪৪ সালে স্বাধীনতা-পূর্ব অবিভক্ত বঙ্গদেশে 'নিখিলবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি'র উনিশতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এই নরসিংহ দত্ত কলেজে, যে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং যাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা।[১৪] আর ঐ ১৯৪৪ সালেই বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ জ্ঞানেন্দ্রনাথের জীবনী প্রকাশিত হয়েছিলো 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্ল্ড বায়োগ্রাফি'তে।[১৫]

শতবর্ষ-প্রাচীন এই নরসিংহ দত্ত কলেজে চার দশকেরও বেশি শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে শতবর্ষের ব্রতযাত্রায় এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। শুনেছি ১৯৫০-এ অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথের উদ্যোগে কলেজের সিলভার জুবিলী পালিত হয়েছিলো। সেই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকাটিও দেখার সুযোগ হয়েছিলো। ১৯৮৪ বা তার আগে-পরে ডায়মণ্ড জুবিলী উদযাপনের কোনো স্মৃতি নেই। ১৯৯৯-এ প্ল্যাটিনাম জুবিলীও যথাযোগ্য মাত্রায় পালিত হয় নি। সে-কারণে আরও বেশি করে চাই যে নরসিংহ দত্ত কলেজ পরিবারের সামূহিক উদ্যোগে শতবার্ষিকী পালনের মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকার আমাদের সকলের স্মরণে ও মননে যথাযথ মর্যাদার আসন লাভ করুক।

তথ্যসূত্র :

১. সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৩

২. শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার সংকলিত, জীবনীকোষভারতীয় ঐতিহাসিক, চতুর্থ খণ্ড

৩. সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৩

৪. শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার সংকলিত, জীবনীকোষভারতীয় ঐতিহাসিক, চতুর্থ খণ্ড

৫. https://bn*f*wikipedia.org/wiki/আইজাক_রাফায়েল_বেলিলিয়াস

৬. https://farhi.org/wc149/wc149_346.html

৭. 'শতবর্ষের সূচনা', কলকাতার কড়চা, আনন্দবাজার পত্রিকা https://mepaper.anandabazar. com/imageview_7125 4_5226153_4_75_ 08-07-2023_2_i_1_sf.html

৮. সন্তোষকুমার বসু, 'প্রাক্তনীর স্মৃতিতে অধ্যক্ষ জ্ঞান সেন', অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন জন্মশতবার্ষিকী স্মারকপুস্তিকা, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া, আগস্ট ১৯৯৫

৯. ও ১০. অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন জন্মশতবার্ষিকী স্মারকপুস্তিকা, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া, আগস্ট ১৯৯৫

১১. তদেব, Keynote Address, Dr. Sushil Kumar Mukherjee

১২, ১৩, ১৪, ১৫. যুগান্তর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

With Best Compliments from :

Ajay Giri

BSCIC NABCB QM 030
ISO 9001 REGISTERED

(An ISO 9001-200 Certified Company)

176, BELLIOUS ROAD, HOWRAH-711 101 (W.B.)
Ph. : (O) 033 2643 5603
Email : girielectrical2011@gmail.com

নরসিংহ দত্ত কলেজে আমার ঊনত্রিশ বসন্ত

বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার

****

১৯৯৪ সালে শ্রাবণ/ভাদ্রমাসের এক বৃষ্টিভেজা সকালে দুপায়ে ভর্তি কাদা নিয়ে হাজির হয়েছিলাম নরসিংহ দত্ত কলেজে। হাওড়া বলতে তখন চিনতাম শুধু হাওড়া স্টেশন। আর ক্বচিত কদাচিৎ রামরাজাতলায় ঠাকুমার বাড়ি। হাওড়া সম্পর্কে ধারণা বা অভিজ্ঞতা কোনোটাই বিশেষ ভালো ছিলনা। হয়তো খাস কলকাত্তাইয়া উন্নাসিকতাই কাজ করেছিল তলায় তলায়। কিন্তু এখন তো আর কোনো উপায় নেই। হাওড়া আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আষ্টেপৃষ্ঠে। আমার কর্মস্থল। এখন থেকে পঁচিশ বছর ছুটির দিনগুলি ছাড়া প্রতিটি দিন আমার এখানে আগমন বাধ্যতামূলক।

সামাজিক বা আর্থিক অবস্থানে আমি মধ্যবিত্ত শুধু নই সব ব্যাপারেই মধ্যম মানের। মাঝারি ছাত্রী। মাঝারি রেজাল্ট। কলেজে অধ্যাপনা করবো ভাবিনি। ছোটোবেলা থেকে গল্পের বই-এর পোকা ছিলাম। সঙ্গে ছিল লেখালেখির নেশা। এখন ভাবলে সে সবই হয়তো ছাইভস্ম। তবু সুযোগ পেলেই কাগজ-কলম আঁকড়ে গদ্য-পদ্য কিছু একটা খাড়া করতাম। স্বনির্ভর হওয়ার সংকল্প ভেতরে ভেতরে ছিল। ভাবতাম ইশকুলে টিশকুলে পড়াব। আর খবরের কাগজে বা পত্রপত্রিকায় যদি কাজের সুযোগ পাই তো আরও ভালো। হাতের নাগালে একটা কাগজ থাকলে কেমন লেখক হতে পারব। এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে একটি নবীন সম্ভাবনাময় দৈনিকে নিয়মমাফিক লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরিও পেয়ে গেলাম। কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানির দুর্দশা যেমন হয়ে থাকে. ঝাঁপ বন্ধ হতেও সময় লাগল না। বিশ্ববিদ্যালয় ফেরত একঝাঁক টগবগে তরুণ তরুণীর সঙ্গে আমিও কাঠ বেকার হয়ে গেলাম।

আমাদের সময় মানে গত শতকের নয় দশক অবধি স্কুল সার্ভিস কমিশন তৈরি হয়নি। সর্বভারতীয় অধ্যাপনা প্রবেশিকা পরীক্ষা নেটও তখন ছিলনা। এমএ পরীক্ষায় ইউজিসি প্রার্থিত নম্বরের জোরে বিভিন্ন বিষয়ের এক দঙ্গল সহপাঠী কলেজ সার্ভিস কমিশনে ফর্ম ভর্তি করে জমা করেছিলাম। একসময় প্রায় ঘন্টা দুই আপাদমস্তক মন্থন করা প্রাণান্তকর ইন্টারভিউ-এ পাশ করে প্যানেলভুক্তও হলাম। প্রাণান্তকর বলছি এই জন্যই যে পড়াশুনোর বাইরে একটু গান টান গাই বলায় মালকোষ গাইতে গেলে তানপুরা কোন্ নোটে বাঁধা হবে বা রবীন্দ্রনাথের গান গাই বলায় 'সুধাসাগরতীরে' কোন্ রাগ এমন সব বেয়াড়া প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কিন্তু এত সত্ত্বেও চাকরি মিলল না। দেখতে দেখতে পাঁচ পাঁচটি বছর কেটেও গেল আইনি নিষেধাজ্ঞায় ঝুলল সেই প্যানেল। আমিও প্রাইভেট ইশকুলে উত্তর কলকাতার কলেজে দুশো টাকার পার্টটাইম চাকরিতে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে ঝুলতেই লাগলাম। কেরিয়ারের ক্ষতি হল বটে কিন্তু এখন ভাবি খুব মন্দ কিছু হয় নি। কন্যেটিকে তিন বছরের সাব্যস্ত করে তোলার খানিক অবসরও পাওয়া গিয়েছিল।

অবশেষে একদিন শুনলাম ইনজাংশন উঠেছে।এবং প্যানেলভুক্ত হতভাগ্যদের কপালে নাকি শিকে ছিঁড়েছে। আমিও চিঠি পেলাম গঙ্গা পেরিয়ে পাশের জেলার বৃহত্তম কলেজটিতে যোগদান করার। অধ্যাপক কেশব মুখার্জি তখন অধ্যক্ষ। মনে আছে এখন থেকে ঊনত্রিশ বছর আগে আমি এবং প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক ফুটবল অন্তপ্রাণ সুব্রত বসু একই দিনে একই সঙ্গে জয়েন করেছিলাম। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় তখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে লিয়েনে গেছেন। সেই শূন্য পদেই অভিষেক ঘটল আমার। পদটি লিয়েনমুক্ত হতে দুবছর লাগল ফলে আমার আবার স্থায়ীপদে বহাল হতে দু-দুটিবছর কেটে গেল। কিন্তু হলে কি হবে? বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অধ্যক্ষ কেশববাবুর অনুরোধে / নির্দেশে চলে গেলাম নৃতত্ত্ব বিভাগের ফিল্ড ডায়মন্ডহারবার। সঙ্গে তিন

বছরের শিশুকন্যা। বেড়াতে খুব ভালোবাসি। ডায়মন্ডহারবার?তাইই সই। স্যারের হুকুম পাওয়া মাত্র 'জো হুজুর' বলে এক পায়ে খাড়া আমি। সেখানেই মুকুলদা সবুজদা দীপকদার মতো অগ্রজদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেলাম। সেখানেই জানাজানি হল আমি দিব্যি গান জানি। আর চলতে ফিরতে গান গাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে। শিশুকন্যাটিকে নিয়ে ভাবতে হত না। সারাদিন তার কেটে যেত নৃতত্ত্ববিভাগের অসম্ভব দরদী ও মরমী শিক্ষাকর্মী বিমলদা আর জনা পঁচিশ ছাত্রছাত্রীর কোলে-কাঁখে। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা যা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অর্জন করেছিলাম পরম স্নেহপ্রবণ অধ্যক্ষ কেশববাবুর সৌজন্যে। আসলে কলেজ বা পরিবারের বাইরে ছাত্রীদের দেখভাল করার মতো শিক্ষিকা তখন কলেজে বিশেষ কেউ ছিলেন না। নারীবর্জিত ঠিক নয়, তবে গোটা কলেজেই তখন মহিলা অধ্যাপক সংখ্যায় নগণ্য। প্রাতঃ বিভাগ ললনা নির্দিষ্ট ফলে সেখানে মহিলা অধ্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ। দিবাবিভাগ সহশিক্ষামূলক। কিন্তু সেখানে হাতে গোনা ক'টি মাত্র নারীমুখ।

আমাদের বাংলা বিভাগে তখন বিভাগীয় প্রধান বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক তথা যে কোনো ধরনের গ্রন্থ সম্পাদনায় সিদ্ধহস্ত অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও ছিলেন সর্ববরিষ্ঠ 'রবীন্দ্রনাথের বলাকা' গ্রন্থখ্যাত আদ্যন্ত আবেগবিহ্বল আত্মভোলা মানুষ অধ্যাপক বারীন্দ্র বসু, অত্যন্ত উৎকৃষ্টমানের নোটবই প্রণেতা ও সর্বপ্রকার বৈষয়িক পরামর্শদাতা অভিভাবকপ্রতিম অধ্যাপক সত্যরঞ্জন দাস, কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক বীরেন্দ্র দত্ত, সি-শার্পে উদাত্তকণ্ঠে নিখুঁত কালীকীর্তন গায়নে দক্ষ অধ্যাপক শতদ্রু মজুমদার এবং সু-রসিক সুলেখক সুবীর কুমার মুখোপাধ্যায়। সঙ্কলের শেষে তাৎপর্যহীন ফুলস্টপের মতো এই অধম। একইসঙ্গে সংখ্যালঘু নারী এবং আনাড়ি। কিন্তু নবাগত সেই আমাকে নিয়েই বাংলা বিভাগ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অধ্যাপক বীরেন্দ্র দত্ত সংক্ষেপে বিডি একদিন ডেকে নিয়ে গিয়ে খুব যত্ন করে প্রাইভেট টিউশনের অপকারিতার কথা সবিস্তারে জানিয়ে একটি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলেন। আর আমি তখন টিউশন করব কি? নিজেই প্রতিদিন পড়তে বসি নিয়ম করে। নিজেকে প্রস্তুত করি ক্লাসের জন্য। তখন খুব ভালো ভালো ছেলেমেয়ে আসত বাংলা অনার্সের ক্লাসে। তাদের প্রশ্নের উত্তর যদি দিতে না পারি-—এই উদ্বেগ তাড়া করত। ফলে সংসার করে দীর্ঘপথ জার্নি করে কলেজের রুটিনমাফিক ক্লাস করে টিউশন-এর চিন্তা আমার কাছে একরকম অসম্ভব ছিল।

বিভাগে সকলের ছোটো আমি দেখতে দেখতে সবার স্নেহভাজন হয়ে উঠলাম। তখন সিরিয়াস ছাত্রের সংখ্যা আজকের তুলনায় কিছু বেশিই থাকত। ফলে মেধা ও বুদ্ধিচর্চায় নিয়মিত শান দিতে হত। একদিন ভাষার ইতিহাস পড়াতে গিয়ে বলেছিলাম 'আর্যরা এদেশে অনুপ্রবেশ করেছিল।' এবার 'প্রবেশ' 'অনুপ্রবেশ' দুই শব্দের সূক্ষ্ম এবং স্পর্শকাতর অর্থের পার্থক্যে ধুন্ধুমার বেধে গেল। সাতাশ/আঠাশ বছর আগে 'অনুপ্রবেশ' আজকের মতো খুব চালু শব্দ ছিল না। সে আমলে ছাত্ররা পড়াশুনো করত। ভাষাসাহিত্যের অনেক রকম খোঁজখবরও রাখত। আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে আমাকে মীমাংসা করতে হয়েছিল, কেন আর্যরা প্রবেশ করেনি, অনুপ্রবেশ করেছিল।

আমার সেই সময়কার ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই বর্তমানে স্কুল-কলেজ সাংবাদিকতা নানা ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলা বিভাগের অগ্রগণ্য প্রাক্তনীদের মধ্যে আছেন স্কুলশিক্ষক ও যশস্বী কবি রাজদীপ রায়। অধ্যাপক ও কবি সুদীপ্ত মাজি। উজ্জ্বল ছাত্রী অধ্যাপক ড. মৈত্রী দাস, স্কুলশিক্ষক অত্যন্ত গুণী অভিনেতা ও নাট্যকর্মী সমরকান্তি বিশ্বাস, আনন্দবাজারের সাংবাদিক অভিষেক চ্যাটার্জি ছাড়াও ইতস্তত ছড়িয়ে আছেন নন্দনকলার জগতের অজস্র ফুটন্ত ফুল যাদের আজও ব্যক্তিগত বা বিভাগের বিচিত্র কাজে-অকাজে ডাকলেই পাই। শোভন, প্রণয়, সুশান্ত,কৃত্তিক, ঋতুপর্ণা, সপ্তর্ষি, সায়ন, সম্রাট—আরও কতো নাম। সম্প্রতি হারালাম আমার সন্তানপ্রতিম ছাত্র পার্থসারথি ঘোষকে। মিষ্টি চেহারার শান্ত ভদ্র সুন্দর হস্তাক্ষর চমৎকার লেখনীর ছেলেটি ছিল চাপা কুণ্ঠিত স্বভাবের। বেশ কয়েকবার পরীক্ষা দিয়েও স্কুল সার্ভিস কমিশন না পাওয়ায় ভাগ্যহত হল ছেলেটি। ওর সহজ সরল হাসিমুখের অন্তরালে ছিল তীব্র লড়াইয়ের অসংখ্য বলিরেখা। জীবনযুদ্ধে খুব অল্প—মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরেই হারতে হল তাকে। বিদায় নিতে হল জীবনের নাটমঞ্চ

থেকে। মনে আছে, পার্ট ওয়ান পরীক্ষার মাস তিনেক আগে বিভাগেরই এক প্রভাবশালী অধ্যাপক দুজন ছাত্রকে নিজের কোচিং থেকে বহিষ্কার করেছিলেন বিশ্রী এক অপবাদ দিয়ে। তারা অকূলপাথারে পড়ে দিশাহারা হয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছিল। আমি তাদের দায়িত্ব নিয়েছিলাম শেষ মুহূর্তে অত্যন্ত ঝুঁকির সঙ্গে। আমার প্রাইভেট টিউশনের অভিজ্ঞতা এইটুকুই। বাকি যা সবই কলেজ চৌহদ্দিতে। কাউকে কখনও নেট পরীক্ষার জন্য তৈরি করেছি তো কখনও স্কুল সার্ভিসের পরীক্ষা প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছি। এসবের বাইরে প্রাইভেট টিউশন আর করা হয়নি। সৌভাগ্য এই যে সেই অগ্রজ অধ্যাপকের দ্বারা পরিত্যক্ত দুজনেই ভালো ফল করেছিল। আর আমার সঙ্গে সেইসময় থেকে এই দুজনের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক মজবুত হয়ে গেছিল। যে বাঁধন আলগা হয়নি আজও। কদিন আগে পার্থর মৃত্যুতে তাই চোখের জল বাঁধ মানেনি। ক'বছর আগে হারিয়েছি আর এক সপ্রতিভ সুদর্শন ছাত্র সম্রাটকে। ফিন্যান্সের কাজ করত ছেলেটি। প্রাক্তনী হিসেবে আসত প্রায়ই। কবিতাপাগল ছেলেটি অল্প বয়সে একদিন কোন মহাশূন্যে হারিয়ে গেল। রেখে গেল স্ত্রী ও শিশুকন্যা। এখন মনে হয় সমাজ- সংসারের প্রবল চাপে রোজগারের দুশ্চিন্তায় আজকের প্রতিযোগিতাসর্বস্ব দুনিয়ায় তারা ব্যাকবেঞ্চার হতে হতে একসময় জনঅরণ্য থেকে চিরতরে লুকিয়ে ফেলেছে নিজেদের।

বিভাগের বাইরে অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপক সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়েছিল। এর অন্যতম প্রধান কারণ হয়তো ছিল গান।একটা সময় কলেজময় গানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল খুব। বেশ কজন গানপাগল অধ্যাপক তখন ছিলেন যাঁরা অপ্রচলিত রবীন্দ্রগান প্রাণভরে উপভোগ করতেন। বিকেলের দিকে বসত এই গানের আসর। রসায়ন বিভাগের হেমন্তকণ্ঠী তপনদা চমৎকার গাইতেন। দর্শন বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে খুব ঘটা করে পুনর্মিলন উৎসব হত। বিভাগের কেউ নই তবু সেখানে গান গাইবার আমন্ত্রণ থাকত বাঁধা। আমিও হাজির হতাম শিশুকন্যার হাত ধরে রবিবারের সকালে। অনেকসময় ছাত্রছাত্রীদের গানের ভুলত্রুটি শুধরে দেবার ডাকও পড়ত। অধ্যক্ষ কেশব মুখার্জি কলেজের এই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলটি ভারি পছন্দ করতেন। অঙ্কের মতো নীরস বিষয়ের অধ্যাপকের অন্তরের গিরিখাতটিতে ফল্গুস্রোতের মতো বইত শুদ্ধ স্বচ্ছতোয়া সংস্কৃতির ধারা ভাবলে আজও অবাক লাগে! সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক এতটাই গভীর ও নিবিড় ছিল যে বারবার একসঙ্গে বাইরে বেড়াতে গেছি। একসঙ্গে পত্রিকা প্রকাশ করা অন্যান্য সাংস্কৃতিক কাজকর্ম করা. পরম আনন্দ পেয়েছি সবেতেই। দুহাজার তিন সালে আমি মারণান্তক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলাম। তখন আর্থিক মানসিক সাহায্য শুশ্রূষা দিয়ে আমাকে পুনর্জন্ম দিয়েছিল এই কলেজ। আমার বিভাগের ভগিনীপ্রতিম অনুজারা যেভাবে অহর্নিশ আমার পাশে ছিল আজও ভুলিনি। কখনও ভুলবও না।

গান গাইবার জন্য কখনও কখনও সমালোচিতও হয়েছি। একবার শুনলাম কেউ ফোড়ন কেটেছেন 'কলেজটা কি গানের স্কুল হয়ে গেল?' এসব কটু মন্তব্য বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল মনে হয়না। তার চেয়ে বহু গান-ভালোবাসা মানুষের স্নেহ সাহচর্য আমার সুদীর্ঘ কর্মজীবনকে ধন্য করেছে।

ছোটোবেলা থেকে কোনোদিনই খুব শান্ত ঠান্ডা বাধ্য অনুগত মেয়ে আমি ছিলাম না। বামপন্থী পরিবেশে বড়ো হয়েছিলাম বলেই বোধহয় প্রশ্ন করার বদভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কোনো কিছুকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া আমার ধাতে নেই। বিশেষ কারুর প্রতি অন্ধ আনুগত্যকেও একধরনের দাসত্ব বলেই মনে করি চিরকাল। আর এও বিশ্বাস করি যে, উচ্চশিক্ষা মানুষকে প্রশ্ন করতে শেখায়। চাটুকারিতার দীনতা বা মালিন্য থেকে তাকে তফাতে রাখে। আমি কিন্তু কলেজের বহু ব্যাপারেই ন্যায্যতা যুক্তি কার্যকারণ খুঁজতে গিয়ে বারবার ঠোক্কর খেয়েছি। স্পষ্ট করে বললে দাঁড়ায় নানা বিষয়ে আমার বিবিধ কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা কলেজের কর্তৃত্ববাদী পরম্পরাকে বারবার অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে।

শতবর্ষীয়ান নরসিংহ দত্ত কলেজে আমার অজস্র মাধুর্যঘেরা স্মৃতিমালার মধ্যে একটি যে গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি তা উল্লেখ না করলে নিজের বিবেকের সঙ্গে প্রতারণা করা হবে। সেটি হল এর কাঠামোটিও অধিকাংশ প্রাচীন ঐতিহ্যশালী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতোই আগাগোড়া

সামন্ততান্ত্রিক এবং প্রভুত্ববাদী। আর রক্ষণশীলতা? সে তো তথাকথিত আভিজাত্যের হাত ধরেই থাকে।

এখানে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ক্ষমতা কায়েম করে রেখেছেন কিছু ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁদেরই স্বেচ্ছাধীন সবকিছু। মুষ্ঠিমেয় এই কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তিরাই এখানে বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী এমন অনুগত ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন যাঁরা কোনোদিন কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন না। সব কলেজেই হয়তো হয়। আমার জানা নেই। আমার কলেজ নরসিংহ দত্তের বাইরে গণতন্ত্রের আবরণ আছে বটে তবে গুপ্ত প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ঘটনা এখানে যথেষ্টই ঘটে। কিছু স্বৈরাচারী ব্যক্তি গোপন কোটারি মিটিং-এ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিক ভাবে আগাম নিয়ে নেন।

আমার মধ্যে টিপিক্যাল মেয়েলি বাধ্যতা যে নেই সেটি আমার আত্মপ্রচার নয় আমার সহজাত প্রকৃতি। আমার স্বভাব। এর বশেই আমি বারবার নানা বৈষম্য নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোনো না কোনো প্রশ্ন তুলেছি এবং খুব কাছের মানুষদের কাছেও অপ্রিয় হয়েছি। বিশেষ ক্ষমতাসীনদের স্তাবকতা করিনি বলে উঁচু প্রশাসনিক পদে যেতেও পারিনি কখনও। অবশ্য তাতে দুঃখ কিছু নেই। সব প্রতিষ্ঠানেই যেমন সংকীর্ণ রাজনীতির চোরাস্রোত থাকে এখানেও আছে। শুধু কাছের মানুষ বলেই নিতান্তই অযোগ্যকেও কিছু পাইয়ে দেওয়া এ তো শুধু একটি শতাব্দীপ্রাচীন কলেজেরই ছবি নয় গোটা সমাজেরই ছবি। কলেজ তা থেকে ব্যতিক্রমী হবেই বা কেন? এই কলেজে আমি বিগত উনত্রিশটি বছরে সহকর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কে পরমতম বন্ধুত্ব হৃদ্যতা যেমন দেখেছি তেমনিই দেখেছি নিষ্ঠুর অমানবিক প্রতিহিংসাপরায়ণতা। কোর্ট থেকে সহকর্মীর জন্য বের করে আনা হয়েছে সাসপেনশনের মতো অকরুণ শাস্তি। স্রেফ রাজনৈতিক বিশ্বাসের ব্যবধানের কারণে নিরীহ অসুস্থ অধ্যক্ষকে কটুকাটব্যে গালিগালাজে বিধবস্ত ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে।

এত সত্ত্বেও বলব নরসিংহ দত্ত কলেজ আমাকে দুহাত ভরে দিয়েছে। স্বাচ্ছল্য স্বাচ্ছন্দ্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা মাথা উঁচু করে বাঁচবার সংগতি সামর্থ্য। আমি আজ যে সম্মান সৌভাগ্যের অধিকারী তার নব্বই ভাগ জুড়ে আছে আমার কলেজ। আমার অন্নদাতা।

দুহাজার ষোলো সাল থেকে এই কলেজের পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে চোখে পড়ার মতো। এসেছেন মহিলা অধ্যক্ষ। আদ্যন্ত পুরুষপ্রধান পুরুষনিয়ন্ত্রিত পুরুষতান্ত্রিক নরসিংহ দত্ত কলেজে এখন মহিলা অধ্যাপকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রচুর। সমাজবিজ্ঞানের ন্যূনতম ধারণা যাঁদের আছে তাঁরা জানেন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ অধিকাংশ সময়ই হয় সুশাসিত মানবিক,সংবেদী ও নিষ্ঠাবান। বর্তমানে নরসিংহ দত্ত কলেজের মূল পরিচালনার রশিটি ধরা আছে একজন দক্ষ নারী পরিচালকের হাতে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজও অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সঙ্গে করে চলেছেন কলেজের মহিলা ব্রিগেড। রেবেকা বেলিলিয়াসের মতো একজন বিস্মৃতপ্রায় বিদ্যানুরাগিণীর ত্যাগে আদর্শে ও যত্নে গড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের এই মৌলিক রাসায়নিক রূপান্তরকে শতবর্ষে কুর্নিশ জানাই। পিতৃতন্ত্রের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে মনুষ্যতন্ত্রের পথে বহুদূর এগিয়ে সে তার বৈচিত্র্যময় জয়যাত্রাকে আরও জঙ্গম আরও প্রাণবন্ত করে তুলুক।

আমার আলমা ম্যাটার : আমার নরসিংহ দত্ত কলেজ

রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

****

১৯৭৬ সাল। একদিকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের অভিঘাতে শহুরে জনজীবনের একাংশের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির টানাপোড়েন, অন্যদিকে জরুরি অবস্থার নিগড়ে বাঁধা জীবনে অনিশ্চয়তার উত্থান-পতন। কৈশোরের প্রান্তসীমায় 'দিগ্‌ভ্রষ্ট মুনিপুত্রে'র ছাত্র হিসাবে কৌলিন্য ছিলনা—না স্কুল পরিচিতির সূত্রে, না রেজাল্ট-এর চাকচিক্যের ভিত্তিতে। বাবার ছোট্ট লোহার কারখানা ছিল, তাই কমার্স পড়তে গেলাম নরসিংহ দত্ত কলেজে বাড়ির কাছে। বাবা বঙ্গবাসীর ও কাকা লালবাবা কলেজের ছাত্র ছিলেন। আজকের নরসিংহ দত্ত কলেজের এক নম্বর অফিস তখন ছিল লাইব্রেরি। লাইব্রেরিয়ান শ্যামবাবু ছিলেন ভর্তির দায়িত্বে—সটান বলে দিলেন অ্যাকাউটেন্সি অনার্স হবে না, কারণ আমার অঙ্ক ছিল না। অঙ্কে খারাপ ফলের সূত্রে ক্লাস নাইন থেকেই আর্টস এর ছাত্র। স্কটিশে অর্থনীতি অনার্সেও চান্স পেলাম না অঙ্কের জন্য। বড়মামা বঙ্গবাসী কলেজে বাংলা পড়াতেন, বললেন চলে আয় এখানে। কিন্তু সাহিত্যে আমার স্বাভাবিক অনুরাগ, তাই বাংলা সাহিত্যকে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ না করে নিলাম রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স। নরসিংহ দত্ত কলেজে। এই হল সুরুয়াত এই কলেজের সঙ্গে সম্পর্কের, যা আজও অটুট।

এখন ২০২৩। ১৯৭৬ সাল থেকে সম্পর্ক। প্রায় ৪৭ বছর। প্রথমে ছাত্র, তারপর অধ্যাপক। চাকরি থেকে বিদায় নেব ২০২৫ সালে। প্রায় অর্ধশতকের সম্পর্ক। মাঝে চার বছর ছিলাম কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে এমএ, ও এমফিল-এর জন্য। ১৯৮৪-এর অক্টোবর-এ যোগ দিই পার্ট টাইম শিক্ষক হিসাবে। এখন এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। আজ যখন স্মৃতির ঝাঁপি খুলেছি দেখছি পরতে পরতে ইতিহাস। আমি তাত্ত্বিক ইতিহাস লেখার চেষ্টা করছি না। কলেজের ১০০ বছরের প্রাক্কালে নিশ্চয় অফিসিয়াল ইতিহাসবেত্তাগণ থাকবেন। আমি তাঁদের বক্তব্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুত্ব দেব। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস তো কতগুলি রেজলিউসন, অ্যাচিভমেন্ট, তথ্য ও জিওট্যাগ লাগানো ছবির বিষয় নয়। ইতিহাস এগিয়ে চলে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে। আমার লেখায় হয়তো এগুলো থাকবে। ধরা দেবে একশ বছর পার ক'রা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের খণ্ডাংশ।

নরসিংহ দত্ত কলেজের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক দুটি পর্বে বিভক্ত—ছাত্র হিসাবে আর অধ্যাপক হিসাবে। ছাত্রাবস্থায় ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০—সাড়ে তিন বছর। অধ্যাপক হিসাবে ১৯৮৪ থেকে এখনো চলছে। তখন পরীক্ষার পর রেজাল্ট বেরোত দেরি করে। যাই হোক, আমি এই পরিসরে শুধু আমার ছাত্রজীবনের অম্লমধুর অভিজ্ঞতাই লিখব—কীভাবে এই প্রতিষ্ঠান আমার ফরম্যাটিভ স্টেজে আমায় গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে, তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে। ভালোমন্দের সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত ভালোটাই জীবনে সাথীকরণ ঘটেছে। অধ্যাপক জীবনের অভিজ্ঞতা এই পরিসরে থাকবে না—কারণ, অধ্যাপক জীবনের অভিজ্ঞতা ছাত্রজীবনের মতো সবটাই রঙিন, বর্ণময় নয়। কখনো কখনো ধূসর শেডও আছে। এই স্মৃতিচারণা প্রতিষ্ঠানের শতবার্ষিকীর স্মারক। তাতে এই কলেজ নিয়ে আমার গর্ব, আনন্দ, শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোলাগার অনুভূতিটাই আমি সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে চাই।

১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বর-এ প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছিল। বেশ মনে আছে ওয়েস্ট ব্লকের এক নম্বর ঘরে আমার কলেজে প্রথম ক্লাস করা ছাত্র হিসাবে। পরেশবাবু (P.S. স্যার) শেলির To A Skylark পড়াচ্ছেন। আর ছিলেন চারুবাবু (C.S. স্যার), তাঁর Last ride together পড়া শুনতে শুনতে কাল্পনিক প্রেমিকাকে কল্পনায় শেষবার ঘোড়ায় চড়ার প্রস্তাব করে ফেলতাম বোধহয়।

প্রীতিময় বাবুর (P.M. স্যার) বার্ণাড শ-এর Arms and the man, কিম্বা শেক্সপীয়রের The Merchant of Venice, অথবা R.K. স্যারের Stopping By Woods in a Snowy Evening আমার জীবনের মণিমুক্তা নিশ্চয়ই। আমার প্রিয় বিষয় ছিল অর্থনীতি—স্কটিশে ভর্তি হতে গিয়েও চান্স পাইনি উচ্চমাধ্যমিকে অঙ্ক ছিল না বলে। এখানে নীলিপ মিত্র, শৈলেন গাঙ্গুলী ও অজয় নন্দী স্যার অর্থনীতি পড়াতেন। স্যামুয়েলসন, লর্ডকেইন্স কিম্বা দত্ত সুন্দরমের ইন্ডিয়ান ইকোনমির রসাস্বাদন করতাম এঁদের ক্লাসে।

আমার অনার্সের বিষয় ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পলিটিক্যাল সায়েন্স। প্রথমে পছন্দের বিষয় ছিল না, অর্থনীতি চেয়েছিলাম। বাবাও অসন্তুষ্ট ছিলেন, বলতেন 'Only Science in Arts'—'আরশোলা আবার পাখী'। তিনি চাইতেন ইংরেজিতে অনার্স পড়ি। কিন্তু টেনিদার চ্যালা প্যালারামের চাইতেও আমার ইংরেজি ভীতি ছিল প্রবল। তাই ইংরেজি অনার্স নিলাম না। কিন্তু কী জ্বালা! সনৎ মুখার্জী (S.M. স্যার), হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ (H.G. স্যার) কিম্বা তপন চট্টোপাধ্যায় (T.C. স্যার) ক্লাসে বাংলা বলেন-ই না—এমনকি হালকা মস্করা করেন ইংরেজিতে। 'টকের জ্বালায় পালিয়ে এলাম, সেই তেঁতুলতলায় বাস'! আসলে সেই সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পঠনপাঠন ইংরেজিতে হত, কারণ বাংলা বই তখন ছিলই না। অবশ্য ক্রমশ তৈরি হয়ে গেলাম ইংরেজিতে পড়াশোনা করতে—বলা যায় বাধ্য হলাম। এখনও আমার ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজিতে অভ্যস্ত করে তুলতে চেষ্টা করি, কারণ উচ্চশিক্ষার রসদ তো ওই ইংরেজিতেই।

আমার বিভাগের শিক্ষকরা ছিলেন অসাধারণ। কয়েকটা ঘটনা বলি, যা থেকে সেইসময়ের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের গভীরতা বোঝা যাবে। ১৯৭৮ সালে একদিন প্রবল বর্ষণে দক্ষিণবঙ্গের বানভাসি অবস্থা, যথারীতি কলেজ ডুবুডুবু, যেমন এই ঐতিহ্য আজও বহমান। ফাঁকা কলেজে এখন যেখানে W6 তার পাশে কাঠের পার্টিশান দিয়ে তৈরি ১২ নম্বর রুমে আমরা কয়েকজন বসে আছি আর বর্ষার আবহে একটা সিগারেটে পাঁচজনে সুখটান দিচ্ছি পালা করে। সেই বর্ষণক্লান্ত অপরাহ্নে দেখি গেট দিয়ে সনৎ মুখার্জী স্যার ঢুকছেন হাঁটু পর্যন্ত ধূতি গুটিয়ে জল ভেঙে। হাতে এক ইয়া মোটা বই! আমাদের হাত নেড়ে ডাকছেন। বর্ষা আর ধূমপানের যুগলবন্দীতে গড়ে ওঠা মৌতাত চটকে গেল 'জ্ঞানের গুঁতোর' আশঙ্কায়। ব্যাজার মুখে গুটিগুটি পায়ে স্যারের কাছে গেলাম। স্তম্ভিত হলাম যখন স্যার বললেন, 'দেখ তোমাদের Power পড়াব বলে এই বই থেকে কয়েকটি শ্লোক খুঁজে বার করলাম, তোমাদের দেব বলে। তোমরা ক্লাস করবে তো?' হাতের ওই মোটা ঢাউস বইটা ছিল 'শ্রীমদ্ভগবতগীতা'। সদ্য কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যের অঙ্গনে পা রাখা আমি তখন বুঝতে পারিনি। পরে জেনেছি কী অসাধারণ জ্ঞানের জগতে বিচরণ ছিল S.M.স্যারের। ওপেনহেইমার কি এই শ্লোকই আবৃত্তি করেছিলেন 'ট্রিনিটি'-র সাফল্যে? তৃতীয় বর্ষে স্যারকে আর পাইনি। এক পুজোর ছুটিতে তিনি চলে গিয়েছিলেন না ফেরার দেশে—রেখে গিয়েছিলেন আমার মনে এক অসাধারণ শিক্ষকের ছাপ।

হেমেনবাবু, H.G. স্যার, উদাত্ত কণ্ঠে ভারতের রাজনীতি আর মার্কসবাদ পড়াতেন। ওনার বাগ্মিতা অসাধারণ, সরকারি বামপন্থী ছিলেন। আমার সঙ্গে মাঝে মধ্যে যুক্তির দ্বন্দ্ব হত। আসলে আমি ওই অতি বাম সময়ের অবশিষ্টাংশ একটু-আধটু চিবোতে ভালবাসতাম। তবে নতুন আলোয় ওঁর কাছে অপথেকারের 'গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ওহ বিপ্লব' সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলি। তৃতীয় বর্ষে এলেন গৌতম বসু স্যার, আদ্যোপান্ত বিপ্লবী, মার্কিন বিরোধী। ছিলেন এক বছর। গৌতমদা চলে গেলেন সেই মার্কিন মুলুকে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। এলেন, যাদবপুর থেকে অবসর নিলেন। ছিলেন অসাধারণ শিক্ষক। মনে পড়ে হারাধনবাবুকে। ডোমজুড়ের এক স্কুলের শিক্ষক—সপ্তাহে দুদিন আসতেন লাস্ট পিরিয়ডে—পড়াতেন ফরাসি সংবিধান, ডরোথি পিক্‌ল্‌স-এর বই। প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝাতেন।

আমাদের বিভাগের দুজন বর্ণময় মানুষ ছিলেন কল্যাণ সেন আর তপন চট্টোপাধ্যায়। Harvey and Bather-এর বই থেকে কল্যাণবাবু (K.S. স্যার) আমাদের ব্রিটিশ কন্‌স্টিটিউশন পড়াতেন। বাকিংহাম প্যালেস আর ১০নং ডাউনিং স্ট্রীট ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠত। তপনদা মানে T.C. স্যার প্রকৃতপক্ষে আমার মেন্টর

ছিলেন। আমার কৈশোরোত্তর জীবনে পিতৃদেবের পর যে দুজন মানুষ ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা রূপে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন আমার বড়োমামা, বঙ্গবাসী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রয়াত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং অন্যজন অবশ্যই তপনদা (T.C. স্যার)। বাস্তববাদী তপনবাবু আমার মতো একজন প্রান্তিক মেধার ছাত্রকে শিখিয়েছিলেন পেশাগত জীবন গড়ে তোলার কারিগরি দিক। তিনি শুধু আমাদের ভারতের সংবিধান-ই পড়াতেন না, শেখাতেন জীবনের মানে, আঁধার ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার প্রথাপ্রকরণ।

সে যুগে অনার্স স্টুডেন্টদের টিউশন নেওয়ার চল্ বিশেষ ছিল না। T.C. স্যার তাঁর উল্টোডাঙ্গার ফ্ল্যাটে ল-কলেজের ছাত্রদের পড়াতেন। কিন্তু স্যার আমায় notes দেখে দিতেন, বই দিয়ে সাহায্য করতেন, অর্থের সম্পর্ক ছিলই না। এটা চলেছিল এমএ পরীক্ষা পর্যন্ত। এটাই ছিল সে যুগের ধর্ম, ছাত্ররা শিক্ষকের ওপর নির্ভর করত, তাঁদের বিশ্বাস করত, আজকের মতো প্রাইভেট টিউটরকে সর্বরোগহর ওষুধের কারবারি ভাবত না। অন্য অধ্যাপকরাও ছাত্রদরদী ছিলেন—আমি উপকৃত হয়েছি, S.M., H.G. বা K.S.-এর কাছে। তবে স্বীকার করি যে আমার প্রতি তপনদার পক্ষপাতিত্ব ছিল। ওঁর বাড়ি যেতাম, তাঁর পরিবারের সদস্যরাও স্নেহ করতেন। যখন এমএ পাস করে যাদবপুরে এমফিল. করছি, তপনবাবুই লোক পাঠিয়ে আমার বাড়ি থেকে ডেকে এনে এই কলেজে আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হতে সাহায্য করেন। তপনবাবু কয়েক বছর আগে পাড়ি দিয়েছেন অসীম অনন্তের পথে, রেখে গেছেন তাঁর প্রিয় ছাত্রকে, যে আজন্ম তাঁর স্মৃতি লালন করবে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে বলি, এইসব প্রথিতযশা শিক্ষকমহাশয়দের বাঁধানো ফটো স্টাফরুমের দেওয়ালে শোভিত হত, তুলে ধরত ইতিহাসের খণ্ডাংশকে। এগুলি যদি পুনরায় রাখা যায়, তাহলে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সার্থকতা থাকবে। তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছেন, বর্ণময় করেছেন, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী গড়ে তুলে কলেজকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন।

এবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বাইরে কলেজের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে আসি। তখন রাজনৈতিক পালাবদলের যুগ। কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদ ক্রম অপসৃয়মান, আর গ্রামসির ভাষায় বলি, 'নিও-প্রিন্স' হিসাবে এস.এফ.আই-এর অগ্রগমনের যুগ। আমি রাজনীতির বৃত্তের বাইরে থেকেছি। কারণ তখন দলীয় রাজনীতির জোয়াল নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানের কাঁধে তুলে নেওয়ার কথা ভাবতে পারতাম না। ইতিমধ্যেই পারিবারিক দায়িত্বের বোঝায় কাঁধ ন্যুব্জ ছিল। তাছাড়া, ছাত্র রাজনীতি বোঝার আগেই রাজনৈতিক তত্ত্ব পাঠ করে তা বদহজমের কারণে কিছুটা বৌদ্ধিক অ্যাসিডিটি হয়ে গিয়েছিল। সোনায় সোহাগার মতো ছিল সে যুগের অতি বাম দর্শনের অবশিষ্টাংশের প্রভাব। তবে ছাত্র-পরিষদের সুধীনদা, সুখেনদা, কিম্বা এস.এফ.আই-এর মণিদা-টয়-আশিস-এর সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল, আড্ডাও দিতাম কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিকাল ল্যাবরেটরির সামনের ঘাসে ঢাকা চত্বরে।

সিলেবাস ও পড়াশোনার বাইরে কলেজজীবন আমার কাছে ছিল দারুণ রোমান্টিক এক জায়গা। বয়েজ স্কুলের ঘেরাটোপের বাইরে কো-এড কলেজ আমার কাছে নতুনত্বের বিষয় ছিল। ক্লাসে যথেষ্ট গুণী ও আকর্ষণীয়া সহপাঠিনীরা থাকলেও আজকের মতো 'ডেটিং' বা 'রিলেশনে আছি'-র মতো বিষয় ভাবতেই পারতাম না। শুধুই চোরা চাহনি ও রাবীন্দ্রিক কথোপকথন। 'প্রেম' ছিল এক পবিত্র, উচ্চ অনুভূতির বিষয়, যা নরনারীর সম্পর্কের এক সুস্থ, সুন্দর রূপ, যার বেশিরভাগের পরিণতি হত পরিণয়ে অথবা পঙ্কজ উদাসের গজল-এর জল টলটল লিরিকে। নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা সদ্য কৈশোর পেরোনো তরুণের পক্ষে তা ছিল বিলাসিতা। আমাদের আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল স্পোর্টস, খেলাধুলা, বিশেষ করে ক্রিকেট খেলতাম। আন্তঃক্লাস টুর্নামেন্টও হত। আর ছিল দুটি ক্লাসের ফাঁকে অথবা ক্লাস বাঙ্ক করে আড্ডা। বন্ধুরা খুবই ভাল ছিল। প্রদ্যোৎ, জয়ন্ত, সমীর, উমাশঙ্কর, সুনীল, কাকলি, সুচিস্মিতা, সাগরিকা, অশ্বিনী, অনন্ত, আরও অনেকে ছিল আড্ডার মণিমাণিক্য। সুনীল, আন্দুলে বাড়ী, আমাদের থেকে বয়সে সিনিয়র, কিন্তু যথার্থ নেতা ছিল (রাজনৈতিক নয়)। আড্ডায় রাজনীতি থেকে উত্তমকুমারের সিনেমা, মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল, বচ্চনের 'জঞ্জীর' থেকে 'মঞ্জিল' সবই ছিল। আর ছিল ক্লাসমেটদের পিছনে লাগা, কোনো কোনো শিক্ষকের সঙ্গে নির্দোষ বদমায়েশি। ছিল একটা সিগারেটকে পাঁচজনে ভাগ করে সুখটান দেওয়া।

মামুর ক্যান্টিনের কথা বলতেই হয়। সম্ভবত ১৯৭৮ সালে মামু ক্যান্টিনের দায়িত্ব নেন। এখন যেখানে কম্পিউটার বিল্ডিং সেখানেই ছিল ক্যান্টিন। ক্যান্টিনে 'চটা ওঠা' কাপে দুটো চা'কে চারটে করা আর ক্ষীণকায় ডিমের টুকরো দিয়ে বানানো 'ডিমের চপ' এখনো স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। সেই মামুর ক্যান্টিন ও ডিমের চপ আজও আছে, তবে পুকুরের উল্টো পাড়ে, আরও সফিসটিকেটেড ফর্মে। আজও ছাত্রছাত্রীদের রসনা তৃপ্ত করে চলেছে। এর মধ্যে দুটি পরিবর্তন এসেছে, মামু বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর মাথা ভর্তি চুল আর 'কামু মুখার্জী'র মতো মোটা গোঁফ কালের নিয়মে বিদায় নিয়েছে। আর ডিমের চপে ডিমখণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যুগের প্রয়োজনে, দামও।

এখনকার মতো সে সময় কলেজের নির্দিষ্ট বাউন্ডারী ছিল না। উত্তর দিকটা ছিল উন্মুক্ত—টিকিয়াপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের দিকে ধাবমান রেলগাড়ি দৃশ্যমান হত। ছিল হাওড়া কর্পোরেশনের জমাদার বস্তি। বাসিন্দাদের একাংশ অনায়াসে কলেজের পুকুরে স্নান-কাচাকাচি করত। চারপাশে বরাহপুঙ্গবরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত। কেমিস্ট্রি ল্যাবের পিছনে আর একটা জলাশয়ের ধারে ছিল কমন রুম, যেখানে টেবিল টেনিস ও ক্যারামের ব্যবস্থা ছিল। খগেনবাবু ছিলেন দায়িত্বে, ওঁর কাছে পেন জমা রেখে খেলার ছাড়পত্র পেতাম। ১৯৮২ সালের পর চিত্র বদলেছে—বাউন্ডারী ওয়াল হয়েছে, কলেজের জমির পরিমাণ কমেছে—অবশ্য তখন আমি ছাত্র হিসাবে আর কলেজে নেই। তবে ছাত্র সংসদের গোল ঘরটি এখনও একই আছে—ওটাকে আমরা বলতাম 'গুরাণের ঘর'— গুরাণ হল অরণ্যদেবের পিগ্‌মি সহচর, যারা সে সময় ইন্দ্রজাল কমিকস পড়েছেন, তারা 'গুরাণ'কে চিনবেন। কলেজ অফিসের সঙ্গে আমার আদানপ্রদান ওই মাইনে দেওয়া, আর কিছুই নয়। তখন তো এত স্কলারদের জন্য 'শিপ' ছিল না। বছরে দু-তিনবার কাউন্টারে দাঁড়ানো— বিষ্টুবাবু কিম্বা ব্যানার্জীবাবুর হাতে জানালা গলে টাকা তুলে দেওয়া। অনার্সের ১৪ টাকা মাইনে ছিল—আমার 'হলুদ মাইনের কার্ডটা' সযত্নে সংরক্ষণ করছি আমার 'আলমা ম্যাটার'-এর স্মৃতি স্বরূপ।

কলেজ জীবনের পুরোটাই ছিল স্বপ্ন বোনার দিন। যাঁরা স্বপ্ন বুনতে শিখিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে অধ্যাপনা 'পেশা' ছিল না, ছিল দায়বদ্ধতা। কি অপরিসীম যত্ন আর ভালোবাসা মিশিয়ে তাঁরা আমাদের নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মানেও শেখাতেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপনা করতে এসে স্টাফ রুমে ওঁদের সান্নিধ্য পেয়েছি। হেমেনবাবু অন্যদের সঙ্গে প্রথম দিন পরিচয় করিয়ে দেবার পর বলেছিলেন, 'জানিস, একজন শিক্ষক তখনই গর্ব অনুভব করে যখন দেখে তারই ছাত্র তার পাশের চেয়ারে বসে।' ভাবুন, কী অসাধারণ ভালোবাসার অভিব্যক্তি, মহাকাশের মতো অনন্ত প্রসারিত হৃদয় না হলে এমন কথা উচ্চারণ করা যায়! নরসিংহ দত্ত কলেজ তখন এইসব মানুষ গড়ার কৃতি কারিগরে ভরা ছিল। এঁদের সযত্ন তত্ত্বাবধানে আমাদের মহাবিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় যাবার পথ প্রশস্ত ও মসৃণ হয় আর ভবিষ্যতের পেশাগত ক্ষেত্রের হালহকিকৎ সম্পর্কে সচেতন হই। এমন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শিক্ষক এখনও আছেন আমাদের কলেজে। এমনকি নতুন যে ছেলেমেয়েরা এসেছে তাঁদের অনেকের ডেডিকেশন তুলনাহীন। সেই পরম্পরার ধারাবাহিকতা তাঁরা রক্ষা করছেন। ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন তাঁরাও এই প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ দ্বারা সিঞ্চিত হয়ে ভবিষ্যতের নাগরিকদের যোগ্য করে তুলবেন, প্রমাণ করে দেবেন 'জ্ঞানের উর্দ্ধে কিছুই নয়'—এই আপ্তবাক্য যা আমাদের এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লোগোর বক্তব্য।

পরিশেষে বলি, আমার 'আলমা ম্যাটার' 'আমার' নরসিংহ দত্ত কলেজ সারাজীবন আমার কাছে তীর্থক্ষেত্র হিসাবে গণ্য হবে। আজ আমার যা কিছু, সবই কলেজকেন্দ্রিক। এই অঞ্চলে আমার পরিচিতি, সম্মান, আমার গ্রহণযোগ্যতা সবই এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকার উপহার। শিক্ষক হিসাবে দীর্ঘ চার দশক অতিক্রান্ত। আমার ছাত্ররা আজ আমার পাশের চেয়ারে বসছে। হেমেনবাবুর কথামত আমিও গর্বিত—'সেই ট্র্যাডিশন' এই কলেজে 'সমানে চলছে'। এটা এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য, আমরা তার সৈনিক মাত্র। কালের নিয়মে একদিন আমায় চলে যেতে হবে, সে-দিন বেশ কষ্ট হবে, আর সেটা হবে কলেজ সম্পর্কে আমার গর্ব, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিচ্ছেদের এক মিশ্র সুপ্ত অভিব্যক্তি—যা গভীরতার দিক থেকে অতলান্ত।

আমার মেয়েবেলা : আমার মহাবিদ্যালয়

রূপালী ধাড়া

****

সার্ভিস কমিশনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা খুলতেই চোখ প্রায় কপালে ওঠার উপক্রম হয়েছিল! একি দেখছি? এ কী দেখিতেছি? নরসিংহ দত্ত কলেজ। আবার! আবার! কিন্তু এবার তো আর পাঁচ বছর পরে পালাবার উপায় নেই। জীবন-যৌবন সব দিতে হবে। সব। মিথ্যে বলব না, প্রথম অভিঘাতে ভালো লাগেনি একেবারে। অসংখ্য দুশ্চিন্তা নিমেষের মধ্যেই গ্রাস করে ফেলেছিল। কীভাবে কাজ করব ওখানে? আমার সব অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের মাঝে? হা ভগবান! ঠিক আমার সঙ্গেই এমনটা হতে হল? আজ বুঝি, কতটা সুকৃতি থাকলে তবেই এমন অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। সুদূরস্থিত অধ্যাপকরা কীভাবে হয়ে ওঠেন অতিপ্রিয় সহকর্মী। যাঁদের সম্বন্ধে ভাবতে গেলে সম্ভ্রম আর বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হয়, তাঁরা সেই জায়গা থেকে নেমে এসে কাঁধে হাত রাখলেন। আজ একটার পর একটা পুরোনো স্মৃতির পাতা যখন উল্টে চলেছি, অজান্তেই চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। বড়ো মধুর, বড়ো বিষাদময় সেসব সুখস্মৃতি।

কলেজে পড়ার প্রথম দিনের রোমাঞ্চটা বোধহয় কেউই ভুলতে পারে না। সে ছিল এমনই একটা বর্ষার সকাল। কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল না। নীল আকাশে ঝল্‌মলে রোদ্দুর ছিল। সাদা মেঘগুলো আইসক্রিমের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল আকাশময়। আর তারিখটাও ছিল খুব মজার। আট-আট- অষ্টআশি (০৮-০৮-১৯৮৮)। ঐ দিনই প্রথম স্কার্ট-পরা, মাথার দু-পাশে দুটি লম্বা বেণী-দোলানো কিশোরী আমি প্রথম পা রেখেছিলাম এই মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। প্রাতঃবিভাগ—একাদশ শ্রেণি—বায়ো-সায়েন্সে। চোখে এতটাই রঙিন স্বপ্নের ঘোর ছিল যে, চারপাশের কল-কারখানা- অধ্যুষিত রাস্তাঘাটকে মনে হচ্ছিল রাজপথ। সেই প্রশস্ত রাজপথ ধরে, সুশোভিত রথে চেপে আমি এসে নামলাম এই প্রাসাদোপম মহাবিদ্যালয়ের দ্বারপ্রান্তে—রাজকন্যার মতো। আসলে এসেছিলাম বাবার সাথে, পায়ে-হেঁটে। আমার বাড়ি কলেজের অনতিদূরেই —৬/৭ মিনিটের হাঁটাপথ। এসব প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা।

ছোটো জলাশয় থেকে বড়ো দীঘিতে নিয়ে গিয়ে ফেললে যেমন হয়, বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয়ে উত্তরণও কতকটা সেইরকম। স্কুলের সেই আঁটোসাঁটো নিয়মকানুন এখানে নেই। প্রতিটা ক্লাস হয়ে যাওয়ার পরই কেমন একটা বাঁধন খোলা হাওয়া এসে ঝাপ্টা দিত চোখে-মুখে। সবকিছুই তো এখানে অন্যরকম, অবাক হওয়ার মতো। চোখের সামনে একটার পর একটা উদ্ভাবন হয়ে চলেছে। সেই আবহবিকারে অন্তরের শঙ্কমোচন হয়ে চলেছে একের পর এক। আমি বিস্মিত আনন্দিত, অভিভূত, তৃপ্ত। ইউনিফর্ম ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করাটাই আমার কাছে মস্ত বড়ো একটা ব্যাপার ছিল। মনে হত, এত বড়ো তো আগে কখনও হইনি! এখানে ক্লাসরুমের মধ্যে টেবিল-চেয়ারটা কেমন একটা উঁচু মঞ্চে বসানো থাকে। স্যার-ম্যাডামরা উঁচুতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ক্লাস নিচ্ছেন। আমাদের স্কুলে কিন্তু এমনটা ছিল না। দু-একদিনের মধ্যেই কত বন্ধু হয়ে গেল। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই দেখলাম, আমার স্কুলের অনেক বন্ধুই এই কলেজে ভর্তি হয়েছে—বিভিন্ন বিভাগে। অসংখ্য রঙিন, ঝলমলে পোশাকের মধ্য থেকে চির-পরিচিত, মণিমুক্তোর মতো এক-একটা মুখ আবিষ্কার ক'রে সে যে কি অনাবিল কলম্বাসীয় আনন্দ-সুখ পেতাম—কী আর বলব!

> 'অভিজ্ঞতা না-থাকিলে বলিয়া বোঝানো বড়ই কঠিন, সে মুক্ত জীবনের উল্লাস।' ('আরণ্যক'/বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

স্মৃতির পরতে-পরতে কত কী যে লুকানো থাকে! সেই 'শৃঙ্খলহীন-শৃঙ্খলা' আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। দু-একটা ক্লাসের কথা না বললে এই স্মৃতিচারণা মূল্যহীন।

সেই প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসটি ছিল ফিজিক্সের— অধ্যাপক ড. কৃষ্ণদাস রায়চৌধুরী। এই অসাধারণ মানুষটি তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দিয়ে আমার জীবনের ভিতটি সুদৃঢ় করে দিয়েছিলেন সেই কোন্ কিশোরীবেলায়— অজ্ঞাতসারে। জীবনে সময়-শৃঙ্খলা-নিয়মানুবর্তিতার মূল্য যে কতখানি, তা বুঝেছিলাম শুরুর সেই প্রথম দিনটিতেই। সকাল ৬টা ৪০-এর ক্লাসে তিনি কখনো হাফ-মিনিটও দেরি করতেন না। পরে দেখলাম, শুধু একটি ক্লাসে নয়, তিনি সব ক্লাসেই ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হতেন। ফিজিক্সের মতো দুরূহ একটি বিষয়কে কীভাবে ছাত্রবোধ্য করে তুলতে হয়, কীভাবে করে তুলতে হয় নির্মল আনন্দের উৎসার—তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। প্রত্যেকের জন্য তাঁর হৃদয়ে যে অপরিসীম স্নেহ, ভালোবাসা আর প্রশ্রয় লুকানো থাকত, তার পরিচয় পেয়েছি বারবার। প্র্যাক্টিক্যাল-এর ক্লাসগুলো হয়ে উঠত ব্রহ্মচর্যাশ্রম। আগ্রহ, নিষ্ঠা আর অধ্যবসায় না থাকলে শিক্ষা যে অর্থহীন—একথা তিনি সঞ্চার করে দিয়েছিলেন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অন্তরে। প্রতিটি ছোটো যন্ত্র কৌটো খুলে, লাল শালুর ভিতর থেকে অতি যত্নে, সন্তর্পণে, প্রাণভোমরার মতো বার করে চিনিয়ে দিতেন, বুঝিয়ে দিতেন তার কার্যকারিতা। তবু একদিন ঘটল অঘটন— বাতাসের চাপমাপক একটি যন্ত্র (সম্ভবত!) রাখা ছিল টেবিলের ওপর। পাশাপাশি রাখা লম্বা দুটি কাঠের পাটাতনের গাঠে সাঁটা পারদ ভর্তি কাঁচের নল লোহার ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকানো ছিল। ক্ল্যাম্প আলগা করে ওটাকে ইচ্ছে-মতো ওপরে-নিচে নামানো যেত। সেই ক্ল্যাম্পে মরিচা পড়ে গিয়ে ওটা আটকে যায়। খোলা যাচ্ছে না কিছুতেই। অবশেষে সমস্ত শক্তিপ্রয়োগে ক্ল্যাম্পের শেষ প্রতিরোধ গেল উড়ে। ফল, পারদ-ভর্তি নলের অনিবার্য পতন এবং তলদেশে (Base) ধাক্কা খেয়ে সেই রুপোলি ধাতব তরলের তার আজন্মকালের নলবন্দিজীবনের সীমা অতিক্রম করে চল্‌কে বেরিয়ে যাওয়া। শেষ মুহূর্তে অবশ্য একজন ল্যাব-পার্টনার অব্যর্থ ক্যাচ-ধরার ভঙ্গিতে তাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল বটে, কিন্তু তার মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের আঙুলের অপরিসর ফাঁক দিয়ে সেই 'অধরা-মাধুরী' কীভাবে জানিনা, নিজেকে মুক্ত করে আপন ছন্দে, লাস্যে, প্রাণের আনন্দে এ-দেওয়াল থেকে ও-দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল গোটা ঘরময়—পিছনে ধাবমান বিস্ময়াবিষ্ট ছাত্রীর দল (প্রাতঃবিভাগ শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল)। প্রচণ্ড বকুনি দিয়েছিল গুরুপদদা। পরে তার চতুর্গুণ বকুনি খেয়েছিল স্যারের কাছ থেকে, স্যারের মতে, এতটুকু বাচ্ছা মেয়েরা কলেজে এসেছে, ছুটে বেড়াচ্ছে, খেলে বেড়াচ্ছে, এতেই তো কলেজের ধন্য হয়ে যাওয়ার কথা। বেশ করেছে, ফেলেছে খবরদার বক্‌বে না ওদের। কী মজা আমাদের! স্যার বকেছেন, গুরুপদদাকে। সেই গুরুপদদাও চলে গেছে না-ফেরার দেশে। এই সকল সুখস্মৃতিকে দুর্ভার করে দিয়ে।

ইংরেজির ক্লাসে ছিলেন অধ্যাপক সুহাস বিশ্বাস। সুদর্শন, সুকণ্ঠের অধিকারী। ক্লাসেই পাঠ দিলেন ক্রিকেটের— দেখালেন রণজিৎ সিংজীর (যাঁর নামে রণ্‌জি ট্রফি) ব্যাটিং কৌশল। সেই প্রথম জেনেছিলাম, মিছিল শুধু প্রতিবাদ আর প্রতিরোধেরই হয় না। হ্যামলিনের বংশীবাদকের মতোই তীব্র, অপ্রতিরোধ্য ছিল তাঁর সম্মোহনী ক্ষমতা। পিছনে অসহায়, মুষিকের ন্যায় ছাত্রীবৃন্দ। আর ছিলেন অধ্যাপিকা মিতা মুখোপাধ্যায়। মিষ্টভাষী, সুন্দরী। এতটাই সুরেলা কণ্ঠ এবং অসামান্য উচ্চারণভঙ্গি ছিল তাঁর— সে সুরের অনুরণন আজও রয়ে গেছে কানে। পরে তাঁর সঙ্গে সহকর্মী হিসেবেও কাজ করেছি দীর্ঘদিন। অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। তবে সেদিন খুব ভয়ই পেয়েছিলাম। তাঁর অসাধারণ বর্ণনাগুণে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া যেকোনো যাত্রীবাহী বিমানকেই মনে হত বোমারু যুদ্ধবিমান। সৌজন্যে, 'The First Atom Bomb'।

পড়াশোনা যেমন করেছি, ফাঁকিও দিয়েছি বিস্তর। মণিকাদির কেমিস্ট্রি ক্লাসে উপস্থিতির হার প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। আসলে আমার কোনো দোষ ছিল না। কারণ, ঐ সময়টাই ছিল বন্ধুদের সঙ্গে ক্যারম খেলার উপযুক্ত সময়। আজ যেখানে ক্যান্টিন, সেদিন ওখানেই একটা লম্বা চালাঘরের মধ্যে বেশ কিছু ভাঙাচোরা কাঠের আসবাবের মধ্যে ছিল দু-তিনটে ক্যারম-বোর্ড—স্ট্যান্ডের ওপর রাখা। ওটার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। আর তিন নম্বর ঘরে মণিকাদির কেমিস্ট্রির ক্লাস। মাঝে মাঝে মনটা যে খারাপ হত না তা নয়, কিন্তু মনকে প্রবোধ দিতাম।

লেখাপড়া তো সারাজীবন করা যায়। কিন্তু কলেজজীবনের এই ছোটো-ছোটো আনন্দের মুহূর্তগুলো তো আর ফিরে আসবে না। তবে সোনাদি বা শিবানীদির বটানি কিংবা জুলজি ক্লাসে আমি ছিলাম ফার্স্ট বেঞ্চের লক্ষ্মী মেয়েটি। বহুদিন পর, যখন আমি অধ্যাপিকা, একদিন বটানির প্র্যাক্‌টিক্যাল রুমের পুরোনো আলমারির মধ্যে থেকে উদ্ধার হওয়া আমার প্র্যাক্‌টিক্যাল খাতাটি এক সহকর্মী-বন্ধু এসে তুলে দিলেন আমার হাতে। খুলে দেখি, সোনাদির সই করা—অণুবীক্ষণিক যন্ত্রের ছবির নিচে 'good' লেখা। দেখে মনটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। বুকের ভিতরটা হাহাকার করতে লাগল। আরো একদিন, West Block-এর দোতলা থেকে ক্লাস নিয়ে নামছি, একটি মেয়ে এসে একটি ছোটো, প্রায় হলদে হয়ে যাওয়া সাদা খাম আমার হাতে দিয়ে বলল—ম্যাডাম, এটা আপনার। লাইব্রেরির বই-এর মধ্যে ছিল। বলেই ফিক্ করে হেসে ছুট। আমি তো অবাক! খুলে দেখি, আমার কিশোরীবেলার একটি সাদা-কালো পাসপোর্ট সাইজের ছবি। এতদিন পরেও ঠিক চিনতে পেরেছে পাজিটা।

ভালোয়-মন্দে মিশে বেশ কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। এরকমই একটা দিনে বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম পুকুরের ঐ প্রান্তে, মাঠের ধারে—মামুর ক্যান্টিনে। খেয়ে ফেললাম, সেই নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল—মামুর ডিমের চপ। তখন দাম ছিল একটা পঁয়ত্রিশ পয়সা—টাকায় তিনটে। আসলে বড়ো যে হয়েছি—এটা নিজে বোঝবার জন্য এবং অপরকে বোঝাবার জন্য এসব অভিজ্ঞতা যথেষ্ট জরুরি ছিল।

এ কলেজ জানে আমার প্রথম সব কিছু। সেই কৈশোর থেকে প্রাক্-যৌবনের দিনগুলি—সেই অকারণে হু-হু করে ওঠা মন—সব—সবকিছু। উচ্চমাধ্যমিকের পর এই কলেজেই ভর্তি হলাম—বটানি অনার্সে। কিন্তু মন বসাতে পারিনি। ভালোই লাগত না। আসলে আমার পছন্দের বিষয় ছিল জুলজি। সেটাতে সুযোগ হয়নি। সৌজন্যে, সেই মণিকাদির কেমিস্ট্রির ক্লাস। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখতাম, ক্যারম-বোর্ডে স্ট্রাইকার যে ঘুঁটিটাকে আঘাত করত, সেটা ছুটে বেরিয়ে যেত, আর স্ট্রাইকার হয়ে যেত নিশ্চল। মার্কশিটেও দেখলাম, আমি স্ট্রাইকারের মতো নিশ্চল আমার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেছে অনেকে। আসলে জুলজি অনার্সটা মিস করেছিলাম রসায়নে নম্বর কম থাকার কারণে। সেই অস্থিতাবস্থা থেকে আমার আজকের নিশ্চিত ভবিষ্যতের ভিত্তি যিনি সুদৃঢ় করে দিয়েছিলেন, তিনি আর কেউ নন, আমার গৃহশিক্ষক, অঙ্কের অধ্যাপক ড. গুরুদাস বাজানি। তিনি আমাদের কলেজে সান্ধ্য বিভাগে আংশিক-সময়ের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করতেন। এই শান্ত, সৌম্য, স্মিতভাষী মানুষটি চিরকাল আমার জীবনে প্রেরণা হয়ে থেকে যাবেন। অঙ্কটা তাঁর কাছে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (Reflex action) মতোই স্বচ্ছন্দ, সাবলীল একটি বিষয় ছিল তৎকালীন অধ্যক্ষ কেশববাবু বারবার তাঁকে অনুরোধ করতেন পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করার জন্য। কিন্তু সেই অনুরোধ তিনিও বারংবার সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতেন। আসলে, স্থানীয় একটি খুব নামজাদা বয়েজ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তিনি। সেখানকার ছাত্রদের অনাথ করতে তাঁর মন সায় দিত না কিছুতেই। তাঁরই সুপরামর্শে বটানি অনার্স থেকে বিভাগ, বিষয় পরিবর্তন করে চলে এলাম বাংলা অনার্সে। কিন্তু সে অন্য গল্প, মেয়েবেলার দ্বিতীয় অধ্যায়। এই অধ্যায়ের আপাতত এখানেই সমাপ্তি। আজ আমার ভালোবাসার এই মহাবিদ্যালয়টি শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। আমার চাকুরি-জীবনও রজত-জয়ন্তীতে পদার্পণ করল বলে। মাথার চুলে নুন-মরিচ রঙের ছোপ লেগেছে। কলেজটা কিন্তু আগের মতোই আছে। আগের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর, সুপ্রতিভ। আমার মেয়েবেলা ওখানে রয়ে গেছে যে! আমার শিক্ষকেরা প্রায় সকলেই অবসর নিয়েছেন। মাত্র একজন আছেন এখনও। অধ্যাপক রাজকুমার গাঙ্গুলি। তিনিও সময়ের প্রতীক্ষায়, এক এক করে মাথার ওপর থেকে সব ছাতাগুলোই সরে যাচ্ছে। কিন্তু আমি জানি, আমার প্রিয় অধ্যাপকদের কল্যাণহস্ত চিরকাল আমার মাথার ওপর থেকে যাবে। আমি কারোর ছাতা হয়ে উঠতে পেরেছি কিনা, পারব কি না জানি না। কিন্তু চেষ্টা করে যাব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। শতবর্ষপ্রাচীন এই মহাবিদ্যালয়ের কাছে সেই অঙ্গীকারই রইল।

With Best Compliments From :

GOVT. RECOGNISED TECHNICAL CONSULTANT

E.M(S.S.I.), POLLUTION N.O.C. & CONSENTE, N.S.I.C., ISO, FIRE, FACTORY LICENCE & OTHER LIASION JOB.

451, KALI TEMPLE ROAD,
BALITIKURI, HOWRAH-711 113
Mobile : 9831299229
Email : basabanerjee2009@gmail.com

নানা রঙের দিনগুলি

অংশুমান সরকার

****

আমাদের সকলের প্রিয় নরসিংহ দত্ত কলেজ এই বছর শতবর্ষে পা দিল। এই কলেজে আমারও নয় নয় করে প্রায় ১৯ বছর হতে চলল। কিছুদিন আগে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের বিভাগীয় পত্রিকা জিরো ওয়ান-এ 'কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের মজার ঘটনা' নামে একটি লেখা লিখেছিলাম। তখনই মনে হয়েছিল যে আমার এই কলেজে কাটানো এই উনিশ বছরের মধ্যে বহু মজার ঘটনা ঘটেছে এবং সেগুলো লিখতে পারলে বেশ হত।

তাই যখন 'প্রবাহ'তে লেখার সুযোগ এল সেটা হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু আমার চিরাচরিত গেঁতোমির কারণে হয়ে উঠছিল না। সেটা কাটানোর জন্য প্রিন্সিপাল ম্যাডামের বারবার উৎসাহ দান (আসলে পড়ুন তাগাদা) যথেষ্ট কাজ দিয়েছে।

একটা কথা আগেই বলে রাখছি যে কলেজের মজার ঘটনাগুলোর মধ্যে কম্পিউটার সায়েন্স-এর ঘটনাগুলো আবার লিখব কারণ সম্ভবত ওই লেখাটা সকলের পড়া হয়নি। তবে কয়েকটি চরিত্রের নাম একটু বদল করে দিতে হবে। না হলে হয়তো অসুবিধা হতে পারে।

শুরু থেকেই শুরু করছি। এই কলেজে আমার প্রথম দিনটাই বোধহয় আমাকে এই কলেজটাকে এক মুহূর্তে চিনিয়ে দিয়েছিল। এপয়েন্টমেন্ট হবার সময় অধ্যক্ষ বিমলবাবু আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে আপাতত সান্ধ্য বিভাগে আমার ক্লাস থাকবে। ওঁর নির্দেশমতো নির্দিষ্ট দিনে কলেজে এসে ভাইস প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করব বলে টিচার্স রুমে ঢুকেছি। তখন ভাইস-প্রিন্সিপাল এর ঘরটি ছিল আমাদের টিচার্স রুমের ভিতর দিকে পুকুরের ধারের এক কোণে। কাউকেই চিনি না, তাই ভয় ভয় এদিক ওদিক দেখছি। একজন খুব গম্ভীর গলার অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলাম—"স্যার, ভাইস প্রিন্সিপালের ঘরটি কোন দিকে?" তিনি খুব ভারী গলায় কারণ জানতে চাইলেন। সব জেনে তিনি আমাকে ওই কোণের ঘরটিতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে বললেন যে—'ভাইস-প্রিন্সিপাল মশাই এখন ক্লাসে গিয়েছেন, উনি এলে বলবে যে সব্যসাচীবাবু আমাকে এখানে বসতে বলেছেন'। এও বলে গেলেন যে ওঁকে যেন আমি আর স্যার বলে না ডাকি। ভাইস- প্রিন্সিপাল-এর ঘরে চুপ করে বসে আছি আর শুনতে পাচ্ছি পাশের টিচার্স রুমে খুব হৈ হৈ করে গল্পগুজব চলছে আর সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে দমকা অট্টহাসির শব্দও শোনা যাচ্ছে। মনে মনে ভাবছি যে এই বুঝি উপাধ্যক্ষ মশাই আসবেন। প্রায় আধঘন্টা অপেক্ষা করার পরেও কেউ আসছেন না দেখে গুটিগুটি পায়ে সংলগ্ন টিচার্স রুমটিতে আবার গেলাম। সামনের চেয়ারে বসেছিলেন চশমা পরা একজন সুদর্শন মানুষ। আস্তে করে জিজ্ঞাসা করলাম - 'স্যার, ভাইস-প্রিন্সিপাল স্যার কখন আসবেন?

তিনি একটু গম্ভীর হয়ে জানতে চাইলেন - 'কেন? কি দরকার?'

আমি তাকে জানালাম যে আমি নতুন, আজ কাজে যোগ দিতে এসেছি। তাকিয়ে দেখি, ঘরে বসা বাকি স্যার আর ম্যাডামরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার কথার উত্তরে তিনি যা বললেন তার তুলনা নেই।

'আরে আগে বলবে তো, আমিই তো ভাইস-প্রিন্সিপাল। ক্লাস নিয়ে এসে দেখলাম আমার ঘরে অন্য একজন বসে আছে, তাই ঘরে আর না ঢুকে এইখানে বসে গল্প করছি।'

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আবার অট্টহাসির ঝড় উঠল। বুঝতে পারলাম যে এইরকম একটা জায়গায় কাজ করতে পারার মতন সৌভাগ্য সবার হয় না। সেই প্রথম দিনেই সকলে খুব সহজে আমাকে আপন করে নিয়েছিল। আর ওই ভাইস- প্রিন্সিপাল স্যার ছিলেন অসাধারণ রসিক মানুষ। কতবার তার কাছে কত মজার ঘটনা শুনেছি।

আর একটা খুব মজার ঘটনা মনে পড়ছে। তখন

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা চলছে। কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের একজন বর্ষীয়ান অধ্যাপক হঠাৎ খুব উদ্বিগ্ন ভাবে টিচার্স রুমে এসে জানালেন যে তার মোবাইল ফোনটি হারিয়ে গেছে। খুব দাপুটে মানুষ, সেই সঙ্গে তৎকালীন একাডেমিক কমিটির কনভেনারও বটে। যথারীতি একটা হইচই পড়ে গেল। আমরা কয়েকজন কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে মেইন বিল্ডিং পর্যন্ত খোঁজাখুঁজিও করে নিলাম। উনি আরও জানালেন যে ইতিমধ্যে উনি একটি ছাত্রের ফোন থেকে ফোন করে দেখেছেন যে ওঁর ফোনটি রিং হচ্ছে কিন্তু কেউ ধরছে না। আমাদের ধারণা আরো বদ্ধমূল হল যে ফোনটি হয়তো আশেপাশেই কোথাও পড়ে গেছে। এই সময় ফিজিক্স বিভাগের একজন সিনিয়র অধ্যাপক নিজের ফোন থেকে আবার ফোন লাগালেন এবং জানালেন যে এখনো রিং হচ্ছে। হঠাৎ করে কেউ একজন ফোনটি ধরল। ফিজিক্সের স্যার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ফোনটি লাউডস্পিকার করে ওঁর হাতে দিয়ে বললেন—'তুমি কথা বল'।

কেমিস্ট্রির সেই প্রবীণ অধ্যাপক খুবই উত্তেজিত গলায় রাগত স্বরে বললেন 'কে আপনি? কোত্থেকে এই ফোনটি পেয়েছেন? টিচার্স রুমে তখন অদ্ভুত স্তব্ধতা। আচমকা ফোনের উল্টো দিক থেকে মহিলা কণ্ঠস্বর শোনা গেল দ্বিগুণ জোরে :

বাড়িতে ফোন ফেলে গিয়েছো, আর সকাল থেকে হাজার হাজার ফোন এসে আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। অচেনা নম্বর দেখলে আর ধরছিলাম না। এখন আবার আমার ওপর রাগ দেখাচ্ছো..' ইত্যাদি ইত্যাদি

আবার টিচার্স রুমে হাসির ঝড়...

এবার একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের পাশেই কলেজের খেলার মাঠ। শীতকালে সেখানে ছেলেরা খুব জমিয়ে ক্রিকেট খেলত। তখন সবেমাত্র স্নাতকোত্তর করে কলেজে পড়াতে ঢুকেছি। আমার মন আনচান করত খেলার জন্য। একদিন কিছু সাত-পাঁচ না ভেবে, ছাত্রদের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়েছি। ব্যাট করছিলাম। এমন সময় একটু সিনিয়র গোছের একটি মেয়ে দেখি আমাকে হাত নেড়ে ডাকছে। কাছে যেতে সে গম্ভীর ভাবে জানতে চাইল — 'কোন ইয়ার? কি সাবজেক্ট?

আমি হতবাক আর আমার ছাত্ররা দেখি মুখ টিপে হাসছে। যাই হোক, একটি ছেলে তাকে জানাল যে আমি কলেজে পড়াই। মেয়েটি খুবই লজ্জিতভাবে বলল - 'স্যার আমি ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারি। কিছু মনে করবেন না।'

আর একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল। তখন প্রচন্ড বর্ষা আর বর্ষাকালে কলেজের আশপাশের রাস্তাগুলোর অবস্থা যে কী হয় তা আপনাদের আর বলে দিতে হবে না। সেই সময় বর্ষায় জল জমার জন্য আমরা বেশ কয়েকদিন করে ছুটিও পেতাম। একদিন সেইরকমই প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। এমন সময় অধ্যক্ষ ফোন করে জানালেন যে খুব দরকারি একটা কাজে কয়েকজনকে কলেজে যেতে হবে আর কম্পিউটারে কিছু কাজও হয়তো আছে তাই আমাকেও লাগবে। একটি গাড়ির ব্যবস্থা আছে যেটি হাওড়া ময়দান থেকে আমাদের সকলকে কলেজে নিয়ে যাবে। হাওড়া ময়দানে পৌঁছে দেখি সেখানে তিনটে সেকশনের ভাইস-প্রিন্সিপাল সহ প্রিন্সিপাল নিজে ও আরো কয়েকজন অপেক্ষা করছেন। একটি মারুতি ভ্যান এসে আমাদের সকলকে তুলে নিয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। বাইপাস দিয়ে ঘুরে আশু বোস লেনে ঢোকার পরই দেখলাম যে গাড়ির ভিতর প্রচুর জল ঢুকছে। বেশিক্ষণ লাগল না, আমাদের সকলের আশঙ্কা মতো যথারীতি গাড়িটি কলেজের পাশের আশু বোস লেনের গলির মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল। কোনও উপায় নেই দেখে নেমে পড়লাম। গাড়ির থেকে নেমে বুঝলাম যে গাড়ির ভেতর আর বাইরের সমান পরিমাণ জল ছিল। কীভাবে কলেজ পৌঁছব বুঝতে পারছি না এমন সময় দেখি যে কলেজ থেকে কয়েকজন ছাত্র আর অফিসের কর্মীরা, গোটাকতক ভ্যান রিক্সা ধরে নিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত সেই ভ্যান রিক্সা করে কলেজ পৌঁছলাম।

আরেকটি ঘটনা বলি। তখন সদ্য আমি কলেজে জয়েন করেছি। এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের নয়নার বিয়ের নেমন্তন্ন পেয়েছি। সন্ধ্যেবেলা কলেজ থেকে বেরিয়ে সবার সঙ্গে যাব। সান্ধ্য বিভাগে কমার্সের অনেক স্যারদের সঙ্গে তখন একটু আলাপ হয়েছে। যদিও তাদের মধ্যে একজনকে বেশ রাগী রাগী মনে হয় তাই একটু এড়িয়ে

চলি। ভয় হয় এই বুঝি বকা খেলাম। টিচার্স রুম থেকে থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় সেই রাগী স্যার এসে জিজ্ঞাসা করলেন - 'অংশুমান কিভাবে যাবে?

-

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম - 'জানিনা'। তিনি চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন - 'তুমি আমার সঙ্গে বাইকে চলে যাবে'। মনে মনে প্রমাদ গণলাম, কিন্তু উপায় নেই তাই চুপচাপ তার সঙ্গে বাইকে চড়ে বসলাম। রাস্তায় যেতে যেতে এক প্রস্থ বকা খেলাম—নিজের থেকে তাঁর কাছে বাইকে করে যাবার আবদার করিনি বলে। যাই হোক বিয়েবাড়ি পৌঁছে সকলের সঙ্গে গল্পগুজব করে খেতে বসেছি। সেই রাগী মাস্টারমশাই বসেছেন আমার উল্টোদিকে। খাওয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। তখন মিষ্টি দেওয়া চলছে, হঠাৎ সেই স্যারের বজ্রগম্ভীর গলা — 'ওটা কি হচ্ছে অংশুমান?'

-

বুঝে উঠতে পারলাম না কী করেছি। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। আবার গুরুগম্ভীর গলা শোনা গেল—রসগোল্লা আবার রস নিংড়ে কেউ খায় নাকি? তার চাইতে তো ছানা খেলেই পারো'—তিনি ঘোষণা করে দিলেন।

ভয়ের চোটে মনে হচ্ছিল যে রসটা আবার রসগোল্লার ভেতর কীভাবে পাঠাব...

যাই হোক, বাকিদের হাসি শুনে খানিকটা ধাতস্থ হলাম। পরে দেখেছি সেই মানুষটির মধ্যে একটা অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ মন রয়েছে।

এবার আসি কম্পিউটার বিভাগের ঘটনাগুলোতে।

২০০৭ সালে আমাদের প্রথম অনার্স শুরু হয়, আর তখন ছিল পার্ট ওয়ান, পার্ট টু, আর পার্ট থ্রি পরীক্ষা। সময়টা বর্ষাকাল। প্রথম ব্যাচের পার্ট ওয়ান পরীক্ষার প্রাকটিক্যাল। ছাত্রদের সাথে সাথে আমরা শিক্ষকরাও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। বুঝতে পারছি না যে এক্সটার্নাল ভদ্রলোক কেমন হবেন। এদিকে বিভাগে তখন পুরোনো বলতে আমি আর সুখেন্দু। বাকি দুজন শিক্ষক তখন সদ্য বিভাগে এসেছেন। যারা আমাদের কলেজের বিষয়ে জানেন তাদের নতুন করে বলে দিতে হবে না যে এই অঞ্চলে বর্ষাকালে কীরকম জল জমে। যাই হোক, কোনোরকমে সকাল সকাল পৌঁছে সবাই রেডি হয়ে বসে আছি। এমন সময় সুখেন্দু হন্তদন্ত হয়ে এসে জানাল যে এখনই একবার গেটের কাছে যেতে হবে। সে দূর থেকে দেখেছে যে একজামিনারের সাথে সাথে হেড একজামিনার নিজে পরীক্ষা নিতে চলে এসেছেন। আতঙ্কে চুল খাড়া হয়ে গেল। ল্যাবরেটরির বাইরে এসে দেখি সত্যিই দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের মধ্যে একজন একটু বয়স্ক। মুখে চোখে বিরক্তি। দুজনেরই প্যান্ট হাঁটুর উপর পর্যন্ত গোটানো। হাতে ছাতা। খাতির করে দুজনকে 'স্যার স্যার' বলতে লাগলাম। ভেতরে আসার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলাম কিন্তু বয়স্ক ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকতে নারাজ। শেষে তাঁর বক্তব্যে যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হল যে উনি পরীক্ষক নন। উনি এক্সটার্নাল পরীক্ষকের বাবা। উনি বিশদে জানালেন যে ওঁর ছেলে খুব ভীতু প্রকৃতির, সে আগে কোনোদিন হাওড়া শহরে আসেনি। হাওড়া সম্পর্কে উনি সাংঘাতিক সমস্ত খবর অনেকের কাছে শুনেছেন, তাই উনি ছেলেকে একা ছাড়তে সাহস পাননি। শুনে আমরা হতবাক। সুখেন্দু খুঁটিয়ে জানতে চাওয়ায় উনি জানালেন যে ওঁরা নাকি বাস থেকে নেমে বেলিলিয়াস লেন ধরে এক কোমর জল ভেঙে হেঁটে কলেজে আসতে পেরেছেন। আমি বুঝলাম যে এরপর ওঁর হাওড়া সম্পর্কে যা ধারণা ছিল তার থেকে আরো খারাপ বিশ্বাস জন্মাবে। যাই হোক কোনোমতে সেবার পরীক্ষাটা উতরে গিয়েছিল।

আর একদিনের ঘটনা বলি। সেদিন সন্ধ্যে নাগাদ কলেজে টিচার্স রুমে বসে গল্প করছি, এমন সময় গেটের দারোয়ান এসে জানাল যে একজন রিকশাওয়ালা দেখা করতে চায়। বাইরে গিয়ে দেখি একটি অল্পবয়সী ছেলে দাঁড়িয়ে আছে হাসি হাসি মুখ নিয়ে। বাইরে যেতেই সে মিষ্টি করে জানাল যে তাকে পঞ্চাশ টাকা বকশিশ দিতে হবে। আকাশ থেকে পড়লাম। জানতে চাইলাম কারণটা কি। তাতে সে যা বলল তা শুনে আমার চক্ষুস্থির। আমাদের বিভাগের তরুণ শিক্ষক তিমিরবাবু নাকি কলেজ থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন আঙুলে একটা চাবির গোছা ঘোরাতে ঘোরাতে। ভেলোসিটি বেশি হওয়ার ফলে চাবির গোছাটি আঙুল থেকে উড়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু স্যার নাকি ফাঁকা আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে

অন্যমনস্ক হয়ে হেঁটে চলে যান। রিক্সাওয়ালা ছেলেটি বুঝতে পারে যে স্যার নিশ্চয়ই কোনো জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন। সেই জন্য সে ওঁকে আর বিরক্ত করেনি। তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই চাবিটি ফেরত দিলে সে যথেষ্ট বকশিশ পাবে। চাবির গোছাটি হাতে নিয়ে দেখে আমি আরও অবাক — এটা তো ডিপার্টমেন্টের চাবি। সুখেনকে ফোন করে সব জানালাম আর বকশিশ দিয়ে কোনোরকমে রিক্সাওয়ালাটিকে বিদায় করলাম। ভয় হচ্ছিল যদি এইসব খবর কোনোরকমে অধ্যক্ষের কানে চলে যায় তাহলে খুব বিপদ হবে।

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ছে, সেটিও ওই তিমিরবাবু সংক্রান্ত। সেই সময় প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস কখনো কখনো আমরা দুজন মিলে নিতাম। একদিন প্র্যাকটিকাল নিচ্ছি আমি আর তিমির। এমন সময় হঠাৎ আমাদের এক ছাত্রী হাউমাউ করে প্রায় কেঁদে ফেলে জানাল যে সে তার মোবাইলটি খুঁজে পাচ্ছে না। মেয়েটি ক্লাসে যথেষ্ট জনপ্রিয়। যথারীতি ল্যাবের মধ্যে একটা খোঁজাখুঁজির ধুম পড়ে গেল। সেইসঙ্গে হইচই। জানা গেল যে সে ল্যাবের টেবিলে মোবাইলটি রেখে এক্সপেরিমেন্ট এর কাজ করছিল। মেয়েটির কান্নাকাটির চোটে ব্যাপারটা আরও গুরুতর হয়ে উঠছিল। তিমির হইচইটা থামানোর জন্য সবাইকে একটা দাবড়ানি দিল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল যে — 'প্রথম কাজ হল মেয়েটির ফোনে একটা কল করে দেখা'। এই বলে সে নিজের পকেট থেকে মোবাইল বের করে মেয়েটির নম্বরে ফোন লাগাতে লাগল। আচমকা দেখি — মেয়েটি চোখ গোল গোল তিমিরের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর অনেকটা সোনার কেল্লার সন্তোষ দত্তের মতো—'এটা আমার' বলে তিমিরের হাত থেকে মোবাইলটা ছোঁ মেরে নিয়ে নিল আর পরম স্নেহে সেটিকে নিজের রুমাল দিয়ে মুছতে লাগল। সবাই হতভম্ব। ব্যাপারটা যেটা বোঝা গেল সেটা হল যে তিমিরেরও ওই একই কোম্পানির হ্যান্ডসেট তাই কোনো সময় ভুলবশত সে টেবিল থেকে ফোনটিকে নিজের ভেবে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছিল।

মোবাইল নিয়ে কথা উঠল বলে আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। এটা আরো পরের দিকের ঘটনা। কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্যারেন্ট-টিচার মিটিং চলছে, স্বয়ং প্রিন্সিপাল উপস্থিত। বিভিন্ন বিষয়ে মতামত আদানপ্রদান চলছে। কোনো এক ছাত্রের বাবা খুব উত্তেজিত হয়ে অভিযোগ করছিলেন যে তার ছেলে মধ্যরাত্রেও ফোনে কার সাথে যেন গুজুরগুজুর করে। এই নিয়ে বাড়িতে যথেষ্ট অশান্তি। এদিকে অন্য এক অভিভাবককের মতামত হল যে আধুনিক টেকনোলজির ব্যবহার এইসব তরুণ প্রজন্মকে করতে দিতে হবে, না হলে তারা পিছিয়ে পড়বে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপারটা তর্কবিতর্কের মধ্যে দিয়ে বেশ জটিল হয়ে উঠছে বুঝতে পারলাম। যথারীতি প্রথম অভিভাবক ভদ্রলোকের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছে মোবাইল জিনিসটার ওপর এবং তিনি মুখ লাল করে সেটা প্রকাশ করছেন। প্রিন্সিপাল স্যার একটু অপ্রস্তুত। এমন সময় শুনতে পেলাম কার যেন মোবাইলে কিশোরকুমারের একটা বাংলা গান বাজছে। মুহূর্তের মধ্যে ঘরে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। বুঝলাম আমাদের নতুন শিক্ষক নীলাঞ্জন-এর রিংটোন। তড়িঘড়ি করে নীলাঞ্জন ফোন বন্ধ করে একমুখ আতঙ্ক নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। যাই হোক সে যাত্রা সুখেনই কোনোরকমে অন্য প্রসঙ্গ তুলে ব্যাপারটা থামিয়ে দিয়েছিল।

নীলাঞ্জন এর কথা উঠতে আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। ওর পায়ে একবার হঠাৎ করে একটা সাইটিকার যন্ত্রণা শুরু হয়। ডান পা-টা কোনোমতেই ভাঁজ করা যাচ্ছে না। সেই অবস্থায় ওকে ছুটি করানোর জন্য প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে নিয়ে গেছি। দেখি ঘরে অনেক লোক। পা সোজা করে রেখে ওকে একটি চেয়ারে কোনোরকমে বসিয়ে রেখে অপেক্ষা করছি প্রিন্সিপাল কখন ফাঁকা হবেন তার জন্য। এমন সময় হঠাৎ করে ঘরে ঢুকলেন ফিজিক্সের একজন খুব সিনিয়র অধ্যাপক। ভদ্রলোক এমনিতেই খুব ভালো কিন্তু একটু কড়া প্রকৃতির। ঘরে ঢুকেই তার চোখ পড়ল নীলাঞ্জন এর দিকে। একে নীলাঞ্জন নতুন এসেছে, তার উপর এতটাই কম বয়স যে তাকে দেখে ছাত্র বলেই মনে হয়। তাকে প্রিন্সিপাল রুমে পা ছড়িয়ে বসে থাকতে দেখে ভদ্রলোক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। তারপরেই প্রচন্ড বকাঝকা শুরু করে দিলেন। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা। কিন্তু তিনি কোনও কথা কানে না নিয়ে তার

বক্তব্য রাখতে থাকলেন। নীলাঞ্জন কাচুমাচু মুখ করে বসে রইল। এইসময় চেঁচামেচি শুনে প্রিন্সিপাল স্যারের নজর পড়ল আমাদের দিকে। তিনি বুঝিয়ে বলতে সেই প্রবীণ অধ্যাপক একগাল হেসে জিভ কেটে বললেন যে এত বাচ্চা অধ্যাপক তিনি আগে কোনোদিন দেখেননি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তিনিই আবার আমার সঙ্গে ধরাধরি করে নীলাঞ্জনকে রিকশায় তুলে দিলেন।

তিমিরের আরেকটি ঘটনা বলে লেখা শেষ করব। আমাদের অংক বিভাগের একজন সিনিয়র অধ্যাপক একদিন দেখি টিচার্স রুমে তিমিরকে 'উত্তম' বলে ডাকছেন। ভাবলাম হয়তো নাম ভুলে গেছেন। গিয়ে বললাম যে ওর নাম উত্তম নয়, তিমির। তাতে উনি যা উত্তর দিলেন সেটা অসাধারণ। একদিন নাকি কদমতলার কাছে তিমির সাইকেল চেপে ওঁকে ধাক্কা দিয়েছিল। শুধু তাই নয় — সেইসময় তিমির নাকি আবার গান গাইছিল — 'এই পথ যদি না শেষ হয়...'। সেই থেকে উনি নাকি তিমিরকে উত্তম বলেই ডাকেন।

With Best From :

Mob : 8910131011

Conslt : ESI, PF, GST

With Best Compliments From :

PSPL
MAKING STEEL WORTHY

A
Well Wisher

With Best Compliments From :

Mob : 8910697017

Prop. : Subham
1, LILMANI MULLICK LANE
HOWRAH-1

অন্তরের প্রবহমানতা—একঝলকে ফিরে দেখা

অর্পিতা বসাক

****

নদীর মতো প্রবহমান মানুষের জীবন। ঈশ্বরের অশেষ কৃপা, মনুষ্যজীবনই লাভ করেছি তার ওপর নারী। শৈশব থেকে যৌবন, তা পেরিয়ে মধ্য পর্যায় পর্যন্ত অনেক স্মৃতি বিস্মৃতিতে পরিণত হয়ে চলেছে। কর্মময় জীবনযাপন করার আস্বাদন নারী হিসেবে পাওয়া শুধু কর্মফল নয়, বিধাতারও হাত আছে বলে আমার বিশ্বাস। অধ্যাপনার সুযোগে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, তা প্রায় নয় বছর হতে চলেছে। প্রতিষ্ঠানের দর্শন বিভাগ এর মাহাত্ম্য বুঝতে আমার প্রায় এতগুলি বছর লেগে গেল। এখন গর্ব বোধ হয় যে, আমি এই বিভাগের-ই একজন সদস্য। অধ্যাপক হরিপদ ভারতীর মত জ্ঞানী, বাগ্মী, বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এই বিভাগের ঐতিহ্য, গৌরব। অধ্যাপক ভারতী মহাশয় ছাড়া, বিভাগের নক্ষত্র হয়ে আজও বিরাজমান হয়ে আছেন যে সমস্ত পণ্ডিত মানুষরা, তাদের প্রতি আমার শতকোটি প্রণাম। কাজেই, অংশ হিসেবে নিজের কেমন যেন একটা শিহরন বোধ হয় মনের মধ্যে।

সেই প্রতিষ্ঠান শতবর্ষে পা রেখেছে, সঙ্গে বিভাগও; তার আনন্দানুভূতি যে কতোটা, তা ভাষায় ব্যক্ত করাটা সহজ নয় একদমই। প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য, শুধু কয়েক যুগের নয়, একশত বছরের। তবে সেই পার্থক্যে বাদ সাধে নি, জ্যেষ্ঠদের আদর্শগুলি। ওঁদের কাছে আমি চিরঋণী।

প্রথম যেদিন এই প্রতিষ্ঠানে পা রেখেছিলাম, খুব যে আহা মরি ভাল লেগেছিল, তেমনটা নয়। দ্বিতীয় দিন আর আসতে পারি নি, কারণটা একদমই সুখকর ছিল না। জুলাই মাস, Release order নিতে পুরাতন কলেজ-এ যাচ্ছিলাম; এমন সময় একটি বাসের সঙ্গে আমাদের অটোটির সজোরে ধাক্কা লাগে, দুই থেকে তিনবার অটোটি ভল্ট খেয়ে উলটে পড়ে যায় তখন বাকি যাত্রীসহ আমি মুহূর্তের মধ্যে চেতনা হারিয়ে ফেলি, এমনকি অটোর চালকও। যখন চেতনা আসে, দেখছি কতকগুলো মানুষ আমাদের সামনে এবং মুখে জল ছিটাচ্ছে। শরীরে মনে হচ্ছে কোনো সাড় নেই, ব্যথাতে পুরো কুঁকড়ে পড়েছি। অটোচালক সহ একটি মেয়ে এতটাই আহত হয়েছিল যে, তাদের অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল, শুনেছিলাম। এইটি ২০১৪ সালের ঘটনা। আমার চশমা, ঘড়ি সব ভেঙে চৌচির; আমার চোখ, হাত, হাঁটু এবং শরীরের অন্য অনেক জায়গা ক্ষতবিক্ষত। আমি আমার এক বান্ধবীকে ফোন করে জানাই ঘটনাটি। ফোনটা ব্যাগ-এর ভিতর ছিল বলে রক্ষে পেয়েছিল। বাড়ির কাউকে ফোন না করে সামনেই একটি হাসপাতাল ছিল, বান্ধবীটির সহযোগিতায় হাসপাতালে পৌঁছে স্টিচ করিয়ে কোনোরকমে বাড়ি পৌঁছেছি; বাড়ির লোকজন আমায় দেখে হতবাক। গেলাম ভালো, আর ফিরলাম ক্ষত নিয়ে। বাবা ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে এলেন, উনি সব দেখে বললেন, কমপক্ষে এক সপ্তাহ বাড়ির বাইরে না যেতে। কিন্তু সদ্য চাকরিতে নিযুক্ত হয়ে এইরকম ছুটি পাওয়া সম্ভব হবে না জানিয়ে দিলেন প্রিন্সিপাল স্যার, তবে উনি আমাকে জানিয়েছিলেন, উনি নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ, নচেৎ উনি আমাকে এই অবস্থায় কখনই আসতে বলতেন না। তবুও উনি আমাকে তিন দিনের মধ্যে চাকরিতে যোগ দিতে বললেন, যাতে আমার চাকরি জীবনে কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয়। বিভাগের তরফ থেকেও আমাকে যেভাবে সাহায্য করা হয়েছিল, আমি তার জন্য চিরকাল-ই কৃতজ্ঞ থাকব।

এই দুর্ঘটনাটি থেকে একটি বিষয় শিখেছিলাম, মনকে শুধুই মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিনয়ী হলে চলবে না, যাদের মধ্যে প্রাণ নেই তাদের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল, বিনয়ী অবশ্যই থাকতে হবে। কলেজের বাহ্য রূপ দেখে আমার যে অস্বস্তি বোধ তৈরি হয়েছিল, তারপর কলেজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। বুঝেছিলাম ঈশ্বর আমাকে হয়তো বা সুযোগ দিয়েছিলেন নিজেকে একবার পরখ করে

দেখার জন্য। এই ঈশ্বর এর যাচাইয়ের ব্যাপারটা মৃত্যুর দিন অবধি বজায় থাকবে, আমার বিশ্বাস। আমাদের মানুষের জীবন নদীর সঙ্গে তুলনীয়। দার্শনিক Heraclitus-এর কথায়, একই নদীতে আমরা দুবার অবগাহন করতে পারি না, কেননা নতুন জল-স্রোত সদা প্রবহমান। কাজেই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের কিছু না কিছু শিখে চলেছে। শিখতে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছি, পড়ে যাচ্ছি, আবার উঠেও দাঁড়াচ্ছি। তবে দুঃখের বিষয় একটাই আমাদের জ্ঞান, আস্ফালনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, উচিত-অনুচিত এতটাই customized যে, নিজে যা করি তা সবই ঠিক এবং উচিত, অন্যরা যা করে, তা সবই অনুচিত বা একদম বেঠিক বলে মনে হয়। কী আর করা, নদীতে ভাঁটার সময় অনেক বর্জ্য পদার্থ শরীরকে ছুঁয়ে যায়, কিন্তু জোয়ারের জল আবার শরীর, মনকে দূষণমুক্ত করে তোলে। যারা যত নেতিবাচক মানসিকতা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারেন, তারা তত মুক্তির পথে এগিয়ে চলেন, সেটাই কাম্য। আর যারা পারেন না, তারা ভাবেন ঈশ্বরের উদ্দেশে উপবাস করে ফুল-ফল-মিষ্টি-ভোগ-আরতি-জপ-তপ করলেই আত্মা শুদ্ধ হয়ে যাবে। হয়তো বা হয়ও তবে আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখছি, আমার হয় না, বাকিদের নিশ্চয়ই হয়। তবে এই সদা প্রবহমান জীবনে দুঃখের অন্তরালে সুখই সর্বদা বিরাজ করে, যা আমাদের শান্তির পথে নিয়ে যায়। কাজেই সুখ-দুঃখ মিশ্রিত এই জীবনে সবাই যেন শান্তিতে থাকি, আনন্দে থাকি। তাই এই পত্রিকার নামকরণ যে 'প্রবাহ' তা সর্বতোভাবে যথার্থপূর্ণ বলে আমার মনে দাগ কেটেছে।

With Best Compliments From :

বাহাত্তর বছর পূর্বের স্মৃতি

প্রভঞ্জন দত্ত

****

সালটা ছিল ১৯৫১, শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ঐ কলেজেই পড়ব এটাই মনস্থির করেছিলাম। কিন্তু ভর্তি হতে গিয়ে বিপত্তি, বিএ পড়তে আসার সংখ্যা খুব কম, কর্তৃপক্ষ আমাকে নরসিংহ দত্ত কলেজে এ্যাডমিশন নেবার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কলেজে ভর্তি হলাম। রোল নং-৩, বিএ আর্টস প্রথম দর্শনেই অভিভূত। কি সুন্দর দুটি আয়নাশোভিত দরজা, বাইরে দীর্ঘ পামগাছ সারিবদ্ধভাবে। মনে হচ্ছে কলেজ নয়, এ যেন বোটানিক্যাল গার্ডেন। অতি মনোরম পরিবেশ। পর পর বিশাল পুকুর, চারিদিকে সবুজ গাছ ও ফুলের মেলা। কলেজ লাগোয়া পুকুরে কত মাছ দৃশ্যমান।

কয়েকদিন পরে তৃতীয় বর্ষ শুরু, সেই সময় ৫৭ নং বাস ছিল একমাত্র ভরসা, হাওড়া বেলিলিয়াস রোড হতে হাঁটা পথ ছিল বড়ো কষ্টকর। প্রথম দিনে ইংরাজী ক্লাসে সবাই পরস্পরের সাথে পরিচয়, আমার পূর্বের কলেজের দুই সতীর্থকে দেখলাম। কো-এডুকেশন আছে এখানে আমাদের বি.এ. ক্লাসে একজন মাত্র ছাত্রী। সব মিলিয়ে সংখ্যা ১১।

ইংরাজী ক্লাস আর্টস ও সায়েন্স গ্রুপ একসাথে। এস.কে.মিত্র পড়াতেন। এছাড়া বিএ আর্টসে ইংলিশ সাহিত্য পড়াতেন বিমলবাবু, বাংলা পড়াতেন নিবারণবাবু, ইকনমিক্সে দ্বিজেন বাবু। তবে নজরকাড়া ছিলেন হরিপদ ভারতী মহাশয়, পড়াতেন ফিলোজফি, তিনতলার একটি ছোট্ট ঘর, ছাত্র সংখ্যা ছয়জন। ওপরের সেই ঘর হতে দেখা যেত একটি বিস্তৃত এলাকা। অধ্যাপক ভারতীর ক্লাস কেউ মিস করতাম না। স্যারের চোখগুলি যেন কথা বলত। এত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন, প্রশ্ন করলে ক্লান্তি বোধ করতেন না।

অধ্যক্ষ জ্ঞান সেন ও সহ-অধ্যক্ষ রণদারঞ্জন চক্রবর্তী বসতেন একতলায় পৃথক ঘরে, অধ্যাপকরা বসতেন লাগোয়া একটি বড়ো ঘরে। কলেজে দু-বছরে কোনো বিক্ষোভ বা আন্দোলন দেখিনি। তবে একটি ছাত্র সংগঠন ছিল। হরিপদ ভারতী ছিলেন সভাপতি। উনি আমাকে সাংস্কৃতিক বিভাগ, ম্যাগাজিন প্রকাশে দায়িত্ব দেন। গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলাম, সময়মতো ম্যাগাজিন প্রকাশে, কভারটি এঁকেছিলেন সদানন্দ ভট্টাচার্য, কলেজের ছাত্র। এছাড়া হয়েছিল একটি বিচিত্রানুষ্ঠান, নামী শিল্পীরা এসেছিলেন। ওই সময় কলেজে বার্ষিক মেধাভিত্তিক পড়াশুনার কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হত। তিনটি বই পেয়েছিলাম ওইদিন। পড়াশুনা বাদেও একটি সুন্দর গুরু-শিষ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল মাননীয় হরিপদ ভারতীর সঙ্গে। কর্মজীবনেও এর ছেদ পড়েনি। মাঝে মধ্যে দেখা করতাম উপদেশ নিতে।

জীবনসায়াহ্নে খোঁজ করে দেখি বেশির ভাগ কলেজের বন্ধুরা পরলোকে। যারা আছেন প্রদ্যুৎ মুখার্জী, ধনপতি ব্যনার্জী, এরা শারীরিকভাবে অসুস্থ। প্রদ্যুৎ এমএ ফিলোজফিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। দীর্ঘদিন বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে ফিলোজফিতে বিভাগীয় প্রধান। এই কলেজের সে এক কৃতী ছাত্র। সামনে যা মনে পড়েছে, তা লিখেছি। ভুল ত্রুটি হলে মার্জনা করবেন। আমার সময়ের গুরুকুল ও বর্তমান গুরুকূলের সবাইকে সশ্রদ্ধ প্রণাম। বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।

With Best From :

metasleep
A Perfect Choice

Abhishak
9804272527

PARTHA
7980390453

With Best Compliments From :

Md. Afzal Khan

Hind Opticals

All Kinds of fancy Ladies & Gents
Frames, Sunglasses & Contact Lans
OPP. POLICE PHARI
Mob : 9231615201
E-mail. : mdafzalkhan7@gmail.com

With Best Compliments From :

Dhiman Neogi
Chief Executive
Mob : 9830425794

SARADA GLASS & CHEMICALS

Mfg. Of :
'SARADA' BRAND SCIENTIFIC GLASS APPARATUS.
Atuh. Stokist :
CDH/LOBA/RIVIERA/SCOTT DURAN
33, DIXON LANE, SEALDAH
KOLKATA-700 014
Phone : 2227 0387/6443
Email : saradaglasschemicals&yahoo.co.in
saradaglasschemicals2021@gmail.com
website : www. saradaglass.com

সময়ের ক্যানভাসে আমার কলেজ

সন্দীপ বাগ

****

শতবর্ষের নরসিংহ দত্ত কলেজে বছর তিনেক কাটানো, সময়ের নিরিখে বুদবুদ।তার ভালোবাসার তরঙ্গের অভিঘাত রয়ে যায় জীবনে। নতুন সময়ে পুরাতনের অভিঘাতে জন্ম হয় নতুন অনুভূতির। সেটা প্রাণ পায় এবছরের প্রথমদিকে কর্তব্যরত ইউনিফর্মধারী সিকিউরিটি গার্ডদের কড়া প্রশ্নবাণে ধরাশায়ী হতে হতে কলেজে প্রবেশ করতে পেরে। পূর্বসূচী অনুযায়ী রাজকুমারবাবুকে সঙ্গী করে প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডামের সঙ্গে ঘন্টাখানেক মিটিং ও পরে একঝলক কলেজটা চাক্ষুষ করতে পেরে। তারপর ১লা জুলাই সকালে শতবর্ষের ঐতিহাসিক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার বিশালতা ও সুশৃঙ্খলতা মনে দাগ কেটে গেল। এক তৃপ্তির আবেশে কলেজের অনুষ্ঠানগুলোয় জড়িয়ে আছি। কলেজের মূল ভবনের দোতলায় একজন শিক্ষক মহাশয়কে সঙ্গী করে একদিন উঠে অবশিষ্ট কাঠের দরজা জানালার ইউরোপীয় আর্চ, রঙ বেরঙের বেলজিয়াম কাঁচ, ঝুলন্ত বারান্দা, কাঠের কারুকাজ, থামের পঙ্খের শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ হলাম। কলেজবেলায় তো এসব পর্যবেক্ষণ করিনি। পর্যবেক্ষণ শক্তিটাই ছিল না হয়তো। দোতলার উত্তরের ঘরটি একটিই বড়ো হল ঘর ছিল বলে মনে হল। মনে মনে পার্টিশন ওয়ালগুলো অদৃশ্য করলেই চোখের সামনে ভেসে উঠছিল বিলাসবহুল বিনোদনের পরিবেশ, দিগন্তবিস্তৃত বেলিলিয়াস পার্কের ছবি। সেখানে হরিণ ও ময়ূরের সারি। পুরোনো পাম গাছের সারি পেরিয়ে ঘিঞ্জি দক্ষিণ দিকটাও নিশ্চয়ই একসময় উপভোগ্য ছিল। নিচে টিচার্স রুম দিয়ে জলাশয়ের সিঁড়িতে পা ভিজিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলাম কেন ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে বেলিলিয়াস পার্ক, জলাশয় ও এই বাগানবাড়িটিকে কলকাতার সুবিখ্যাত পার্কগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে মানা হত। সাহেব সুবা, ঘোড়ার গাড়ি, কোচম্যান, বৈদেশিক বাণিজ্যের খণ্ডচিত্র পেরিয়ে মনে এল, স্বাধীনতা আন্দোলনের তুঙ্গ মুহূর্তে স্বদেশিয়ানার রঙে মেতে উঠে একটি অংশে বেলিলিয়াস সাহেবের সম্পত্তি জনহিতকর কাজে ব্যবহারের কথা মাথায় রেখে এলিট বাঙালি ভদ্রলোকদের কলেজ গড়ে তোলার পর্বটুকু। হাওড়ার প্রথম কলেজের পথচলা, চড়াই উৎরাই এর পথে কত মাইলফলক ছুঁয়ে শতবর্ষে পা রাখা।

মুছে যাওয়া দিনের স্মৃতি থেকে : ফ্ল্যাশব্যাকে নিজের জীবনকে ধরার চেষ্টা করলে জানা যাবে, জেনারেল ডিগ্রি কোর্সে পড়ব এমন কোনো এ্যামবিশন ছেলেবেলায় একদমই ছিল না। হাওড়ার নামী স্কুলে উচ্চ-মাধ্যমিকে বিজ্ঞান পড়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনিক্যাল লাইনে পড়ার মানসিক প্রস্তুতি ছিল, সাংসারিক চাপে কম বয়সে রোজগেরে হবার সরলরৈখিক বাসনায়। সেটি ধাক্কা খাওয়ায় প্রথমে নাইটে বিএসসি ও পরের বছর ডে সেকশনে বি.এ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান সান্মানিক কোর্সে ভর্তি হয়ে শুরু হল কলেজ জীবন। সালটা ১৯৮৭। খানিকটা স্কুলের নামী বন্ধুদের চাপ আর খানিকটা ডবলুবিসিএস পরীক্ষায় পাশ করে লোভনীয় চাকরির প্রত্যাশায়। কিন্তু অদৃষ্ট সেদিন হেসেছিলেন। হিসাব উল্টে পাল্টে গেল। গত শতকের আশি-নব্বই এর দশকে কলেজের কোর্স শুরু হত উচ্চমাধ্যমিক থেকে। সেই কারণে কলেজে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা থাকত অনেক বেশি। রমরমিয়ে চলা ব্যবসার কেন্দ্রস্থল বেলিলিয়াস রোড, বেলিলিয়াস লেন, টিকিয়াপাড়া স্টেশনের আশেপাশে লৌহজাত ইঞ্জিনিয়ারিং কলকারখানার মাঝখানে আমাদের কলেজ যেন মরুভূমির মাঝে একটি মরূদ্যান। সেই সময়টার কথা ভাবলে মনে হয় মোবাইল ইন্টারনেটবিহীন এক প্রাগৈতিহাসিক জগতের বাসিন্দা ছিলাম। জীবনে প্রাচুর্যও ছিল কম। নব্বই-এর দশকের উদারীকরণ, ভোগবাদী আকাঙ্ক্ষা শুরুর আগে সাদামাঠা জীবনেই মানুষ খুশি থাকত। বেশ মনে আছে কলেজে একমাত্র গাড়ি আনতেন অধ্যাপক তপন চট্টোপাধ্যায়। ছাত্ররা বাইক নিয়ে এলে

আড়চোখে তাকাত। দশ টাকার নোট ভাঙিয়ে মামুর ক্যান্টিনে বিল মেটালে বড়োলোক বাড়ির সন্তান ধরে নেওয়া হত। এহেন সময় ভর্তির টাকা জমা দেবার সময় একইসঙ্গে লাইনের পাশে দাঁড়ানো এসএফআই কোন এক দাদাকে পঞ্চাশ পয়সা দিতে হত। কলেজ ইউনিয়নের বাধ্যতামূলক সদস্যপদ। ইউনিয়ন রুমটা ভিড়ে ভরা থাকত। কলেজের পাঠ শেষ হয়ে গেছে এমন ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি এলাকার শাসক দলের পরিচিত মুখেরা থাকত। স্কুলে ইউনিয়ন থাকে না, পরপর ক্লাস ও মাঝখানে টিফিন হয়। ভালো না লাগলেও ক্লাসটা করতে হয়। ভেবেছিলাম কলেজ সে ক্ষেত্রে ফাঁকিবাজদের মুক্তাঞ্চল। এই ফাঁকিবাজি করে, ক্লাস কেটে কাছাকাছি শান্তি ও পুষ্পশ্রীতে সিনেমা দেখে ছেলেমেয়েদের বখে যেতে দেখে বুঝলাম নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে ছোটোবেলায় দিনযাপন করা জীবনে কতটা জরুরি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে কিছু বলার আগে আমি বলতে চাই সেই সময়কার কলেজের অর্থনীতি বিভাগ নিয়ে। আমি যেহেতু বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসেছিলাম আমার কাছে পাস বিষয়ে অর্থনীতির লেকচারগুলোতে আকর্ষণ থাকত সবচেয়ে বেশি। অর্থনীতি বিভাগে SNG ছিলেন পপুলার। সবচেয়ে লাভবান হয়েছি RC এবং AKN এর ক্লাস করে। এখনো জীবনে কলেজে শেখা কয়েকটি তত্ত্ব মেনে চলি। যেমন অর্থনীতিবিদ সুখময় চক্রবর্তীর Theory of disguises unemployment বা ছদ্ম-বেকারত্বের তত্ত্ব, Value addition in product or service বা Marginal Utility ইত্যাদি ধারণা। শেষের দুটি তত্ত্ব Behavioural Sciences এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সমাজবিজ্ঞানের বা মানবিক সম্পর্কের ব্যাখ্যায় আজকাল ব্যবহার করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কথা : অনার্সে প্রথম দিনের প্রথম ক্লাস নিয়েছিলেন অধ্যাপক হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ (HG)। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় পর্বে প্রকাশিত হয়ে গেল এই বিষয়টা আগে কখনো পড়ি নি। তিনি আশ্বাস দিলেন, একটু মনোযোগ দিলে সব শিখে নেওয়া যাবে। একইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের সঙ্গে একে একে পরিচয় হল। এই বিভাগে দিবা বিভাগে মাননীয় শিক্ষক মহাশয়েরা ছিলেন - কল্যাণ সেন (হেড), হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, তপন চট্টোপাধ্যায়, প্রলয়দেব মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং তরুণ দাস। রাজনৈতিক আদর্শগত দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও শিক্ষকদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক ছিল। রাজকুমারবাবু ও তরুণবাবু সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ শেষ করে এসেছিলেন। এবং অবিবাহিত ছিলেন। সেজন্য আমাদের বিশেষ কাছের জন হয়ে উঠেছিলেন। তরুণবাবু গবেষণার জন্য কয়েক বছরের ছুটি নেওয়ায় কিছুদিন ডেপুটেশনে পড়িয়ে গেলেন বিমলশঙ্কর নন্দ। অনার্সে ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল আনুমানিক পঁচিশ জন। জনা পনেরো কুড়ি নিয়মিত আসত। বেশ কয়েকজন ছিল প্রথম প্রজন্মের কলেজ পড়ুয়া। মেধার শ্রেণীবিভাগ ছিল। পারিবারিক আয় ও মর্যাদার তীব্র অসাম্য থাকলেও আমরা পারস্পরিক বন্ধু ছিলাম। সাঁতরাগাছি হাওড়া হোমসের কাছে থাকা নীলাঞ্জনা সান্যাল বেথুন স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক অবধি পড়ে আমাদের কলেজে এসেছিল। কাছাকাছি থাকত গার্গী মিত্র। দুজনে একসঙ্গে বাকসাড়া মিনিতে কলেজে আসত। সেকেন্ড ইয়ারে কদমতলার সোমা চক্রবর্তী এল শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ থেকে। বাঁকড়ার শেখ রাজু হাটে ব্যবসা করতে করতে কলেজে পড়ত। সোম ও মঙ্গলবার ওকে পাওয়া যেত না। ডোমজুড়ের জহর হুদাতি ও প্রদীপ হুদাতিকে পড়াশোনার পাশাপাশি পারিবারিক চাষাবাদ দেখতে হত। দীপক আদকেরা দুই ভাই মেদিনীপুর থেকে বালিটিকুরিতে এসে, বাসাবাড়িতে বাবার সঙ্গে থেকে পড়াশোনা করত। বালিটিকুরি গভর্মেন্ট কোয়ার্টারে থাকত রীণা ও সুস্মিতা। সালকিয়ার সুজয় সাহাকে পড়াশোনার পাশাপাশি পৈতৃক হোসিয়ারি ব্যবসা দেখাশোনা করতে হত। শ্রেয়সীর দাদারা লোহার ব্যবসা করত। গ্রাম থেকে শহরে এসে দাদাদের রান্নাবান্না করে ও কলেজে আসত। শুভ্রা ও পূর্ণিমা আসত যথাক্রমে নলপুর ও শ্রীরামপুর থেকে।

সৌম্য থাকত কাছেই চ্যাটার্জীপাড়ায়। শুক্লা, দীপান্বিতা, মিঠু, মৌসুমী,শিপ্রা,মিনতি,অনুরাধা,অতসী প্রমুখরা কাছাকাছি থাকত। এই কথাগুলোর মাধ্যমে বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের একটা আভাস পাওয়া গেল। একসাথে আমরা বইমেলায় গেছি, নলপুরে গঙ্গার পাড়ে ও জগদীশপুরের একটি

বাগানবাড়িতে পিকনিক করেছি। শেখ রাজুর বাড়িতে ঈদে লাচ্চা পরোটা, মুরগির মাংস, সিমুই খেতে দলবেঁধে গিয়ে ওখানকার মানুষের বিস্ময় ও আনন্দময় মুখগুলো দেখেছি। এর পাশাপাশি করেছি হরেক রকমের অনুষ্ঠান।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে দুটি আলোচনাসভা : আমরা বিভাগের উদ্যোগে কলেজে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভা করেছিলাম। একটি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল। বিষয় - স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা। মূল বক্তা ছিলেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও হোসেনুর রহমান। সেখানে আমি বলেছিলাম - স্বামী বিবেকানন্দের রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে। কলেজের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাও এটি শুনতে আগ্রহী ছিলেন। অধ্যক্ষ কেশব মুখোপাধ্যায় এজন্য অর্ধ দিবস ছুটি ঘোষণা করেছিলেন। বিভাগীয় সেমিনার সারা কলেজের গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান হিসেবে সফল হল। পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট মাথাচাড়া দেবার সময় আমরা কলেজের দ্বিতীয় বছরের পড়ুয়া। ভাবলাম এটা নিয়ে একটা বড়ো করে আলোচনার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়। আমাদের এই ভাবনার সঙ্গে প্রথম ও তৃতীয় বছরের পড়ুয়ারা যুক্ত হল। ভাবনাটা স্যারদের কানে গেল। সেখান থেকে সারা কলেজের সমস্ত শিক্ষকমহলে। শেষে দারুণ রূপ পেল। ওই বছর শুরুর দিকে বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর সেমিনারটা মেগা হিট হয়ে সবার মুখে মুখে ঘুরছিল। ফলে স্যারদের উৎসাহ প্রবল। আর একটা বড়ো কারণ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সংকট যেন অকল্পনীয় ছিল সে সময়। খেটে খাওয়া মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের জুড়ি আর ছিল না। তাই এই আলোচনার আবেদন ও গুরুত্ব ছিল প্রচুর।

আমরা বন্ধুরা অনেক চিন্তাভাবনা করে, কলেজের সব বিভাগের স্যারদের সঙ্গে আলোচনা করে দিন ঠিক করলাম পুজোর ছুটির মুখে হবে এই সেমিনারটা। আলোচনার বিষয় হবে - "সাবেক মার্কবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত"। মূল বক্তা হিসেবে ঠিক করা হল প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্যারকে। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ১৯৮৮ এর অক্টোবরের সাত তারিখ দুপুর একটায় সেমিনারের ব্যবস্থা করা হল। বিষয় - "সাবেক মার্কবাদ এবং গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রোইকা"

আমি আর রাজকুমারবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের দ্বারভাঙা বিল্ডিং এর দোতলায় ওঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কলেজের অধ্যক্ষ কেশব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিঠি নিয়ে নিমন্ত্রণ করতে গেলাম। সেই প্রথম আমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা। এখানেই কলা বিভাগের প্রায় সব গণ্যমান্য অধ্যাপকেরা বসতেন। আলিপুর ক্যাম্পাস তখনও তৈরি হয় নি। দিকপাল অধ্যাপকদের বসার জায়গায় খানিকটা বসার সৌভাগ্য হল। অবশ্য বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রচণ্ড আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। রাজকুমারবাবু আমাকে সেদিন চিৎপুরের বিখ্যাত রয়্যালের বিরিয়ানি খাইয়েছিলেন। সঙ্গে চিকেন বা মটনের আরো একটা পদ ছিল। স্যারের সঙ্গে বেশ কয়েকবার কলেজ স্ট্রিট বাটার পাশে তখন থাকা আমেরিকান লাইব্রেরিতে গেছি। হেনরি কিসিঙ্গারের বই নিয়ে আসতাম, মার্কিন সিনেমা দেখার সুযোগ হত। অনুষ্ঠানের দিনকয়েক আগে কলেজের মধ্যে অন্যান্য বিভাগের স্যারদের গুঞ্জন সেমিনারটা একটার বদলে দুটোর পর শুরু করলে তারাও শুনতে পারেন। আমাদের চিন্তা স্যারকে তো একটায় সেমিনারের সময় জানানো হয়ে গেছে। দর্শন বিভাগের অধ্যাপক সঞ্জীববাবু বুদ্ধদেববাবুকে কাঁকুড়গাছির সরকারি আবাসন থেকে ট্যাক্সিতে নিয়ে আসবেন। উনি বললেন কোনো চিন্তা নেই। ট্যাক্সি পোস্তা দিয়ে নিয়ে আসবেন। ওখানে মিনিমাম এক ঘন্টা জ্যাম হবেই। তখন কলকাতার রাস্তায় বা হাওড়া ব্রিজে এক ঘন্টা জ্যামে আটকে থাকা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। যাই হোক নির্দিষ্ট সময়ের একটু পরেই অনুষ্ঠান শুরু হল। বুদ্ধদেববাবু হাওড়ার রসগোল্লা খুব পছন্দ করতেন। তিনি সেদিন পেট ভরে দুলাল ঘোষের রসগোল্লা খেয়েছিলেন। পরে স্যারের ট্যাক্সিতে রাজকুমারবাবু এক হাঁড়ি রসগোল্লা বাড়ির জন্য তুলে দিয়েছিলেন। সেমিনারে মূল বক্তব্য রেখেছিলেন

বুদ্ধদেববাবু। তবে ওঁর সঙ্গে নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সবুজ সেনের যুক্তি প্রতি যুক্তির লড়াইটা বেশ জমে উঠেছিল। সবুজদা এই কলেজের মুখ্য স্থপতি পূর্বতন অধ্যক্ষ জ্ঞান সেনের পুত্র এবং বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউটশনের প্রাক্তনী। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেক বছর অবধি আমরা দুজন এই সেমিনারের স্মৃতি রোমন্থন করেছি।এই সেমিনারের আলোচনায় আমাকেও বলার সুযোগ দিয়েছিলেন স্যাররা।

সেমিনারে আমার বক্তব্যের বিষয় ছিল - "পেরেস্ত্রোইকা ও সোভিয়েত অর্থনীতি।" এই বিষয়ে সেদিন যেটি বলেছিলাম সংক্ষেপে এখানে সেটা আলোচনা করছি।

'পেরেস্ত্রোইকা' ও 'গ্লাসনস্ত' রুশ শব্দভান্ডারের স্বল্প পরিচিত এই শব্দদ্বয়কে নীতি আকারে সোভিয়েত সমাজে প্রয়োগের প্রচেষ্টা আধুনিক কালের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এটা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সংকট মুক্তির উপায়, নাকি পুঁজিবাদের কাছে সমাজতন্ত্রের আত্মসমর্পণ? সেটা নিয়ে মার্কসবাদ বিশেষজ্ঞরা বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখছেন। বিষয়টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত, নাকি ধনতন্ত্রের সাবানে সমাজতন্ত্রের ধোলাই মাত্র। বিতর্কের ঢেউ আছড়ে পড়ছে সচেতন মানুষের মনের অন্দরে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পেরেস্ত্রোইকা ও সোভিয়েত অর্থনীতির আলোচনা আসছে।

বিভিন্ন বিশ্লেষক পেরেস্ত্রোইকা বলতে সোভিয়েত সমাজের ব্যাপক পুনর্গঠনকে বুঝিয়েছেন। মিখাইল গর্বাচেভের মতে-এটির সারমর্ম হল বিপ্লব। এটি সোভিয়েত সমাজের বহু আকাঙ্ক্ষিত আর্থ সামাজিক আর সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাবে। এটি দ্বিতীয় রুশ বিপ্লব। গ্লাসনস্ত বলতে খোলা হাওয়া বা উদারীকরণ বোঝানো হচ্ছে। তথ্যের ওপর কড়াকড়ি, সংবাদমাধ্যমের ওপর খবরদারি আর নয়। সব কিছুই খোলামেলা মুক্ত। এই গ্লাসনস্তের খোলা হাওয়ায় উড়ে আসা বা লিক হয়ে বেরিয়ে আসা তথ্যের দিকে তাকিয়ে জানা যাচ্ছে যে, লেনিন পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বগ্রাসী আমলাতন্ত্রের সার্বিক সরকারি ও প্রশাসনিক প্রাধান্য সোভিয়েত অর্থনীতিকে পঙ্গু করেছে। এই সমাজব্যবস্থা চালু হবার সময় থেকেই দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপাদন বা কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের দিকে নজর দেওয়া হয় নি। পরিবর্তে সামরিক অস্ত্র ট্যাঙ্ক নির্মাণ ও বিভিন্ন ভারী শিল্পের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে খাদ্য সমস্যা, নিত্যদিনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে অসুবিধা হয়েছে। পাশাপাশি ঘাটতি বাজেট, আন্তর্জাতিক বাজারে রুবেলের মূল্যহ্রাস, আর্থিক উন্নয়নের অধোগতি, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি সোভিয়েত অর্থনীতিকে ক্রমে পঙ্গু করেছে। এছাড়া স্থায়ী সরকারি চাকরি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীদের অলস করেছে। শ্রম না করেই আয় করার মানসিকতার ফলে পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। গর্বাচেভ পেরেস্ত্রোইকার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মন্দাজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলা করে এটিকে সঠিক পথে চালিত করতে চান।

কি পরিকল্পনা ছিল সেদিন গর্বাচেভের? সেটি জানার আগে আমাদের জানতে হবে কেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এই রকম সংকটের মুখোমুখি হল? এটি জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সোভিয়েত বিপ্লব পরবর্তী সময় কালে। কতকগুলি সমস্যার কথা আলোচনা করা প্রয়োজন—

১) সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবের পর সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেল। সমাজতন্ত্রে দেশের সমস্ত সম্পদ কলকারখানা কৃষি জমি রাষ্ট্রের অধীনে আসার কথা। কিন্তু তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতিতে লেনিন সব সম্পত্তি ও উৎপাদনের উপকরণ জাতীয়করণ করতে সমর্থ হন নি। বিশেষতঃ কৃষি খামারগুলো ব্যক্তি মালিকানায় ছিল। সেগুলো তিনি সমবায় বা যৌথ মালিকানায় পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন। লেনিনের বক্তব্য ছিল রাষ্ট্রের মালিকানাধীন ক্ষেত্র হল সমাজতন্ত্রের পরিণত রূপ এবং সমবায় যুক্ত গোষ্ঠী মালিকানাধীন ক্ষেত্রগুলি সমাজতন্ত্রের অপরিণত রূপ। সোভিয়েত ইউনিয়নের লক্ষ্য হবে এই অপরিণত সমাজতন্ত্রের রূপকে পরিণতি দেওয়া।

২) মতাদর্শ সংগ্রাম বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অভাব -

মার্কসীয় ভাবধারার অঙ্গ হিসেবে রাজনৈতিক লড়াই জেতার পর দেশের অন্যান্য অংশের মানুষকে এই

ভাবধারার সঙ্গে একীভূত করার জন্য তাদের মগজ ধোলাই বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন হয়। মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুযায়ী কোনো সমাজব্যবস্থার অর্থনীতি হল সেই সমাজের ভিত্তি বা বেস। এটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে মতাদর্শ, ধ্যান ধারণা, সাহিত্য যেটি উপরিকাঠামো বা সুপার স্ট্র্যাকচার। বেস যদিও সুপার স্ট্র্যাকচারকে প্রভাবিত করে আবার কখনো উল্টোটাও হতে পারে। জারতন্ত্রের আদর্শ ভাবধারা বা অভিজাত শ্রেণির প্রভাব লুকিয়ে ছিল সোভিয়েত ব্যবস্থায়। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জারতন্ত্র এবং প্যান স্ল্যাভবাদ সোভিয়েত বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ইহুদি জার্মানিকে রুখতে। সেনাবাহিনীতে অনেক রুশ বীরের বীরত্ব গাথা রচিত হয়েছিল, যেগুলো ছিল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার পরিপন্থী। এর পরে ১৯৫৬ সালে নিকিতা ক্রুশ্চেভ কমিউনিস্ট পার্টির বিশতম কংগ্রেসে পারমাণবিক বোমার ভয় দেখিয়ে মার্কসবাদের কিছু সংশোধন করে নতুন এক তত্ত্ব খাড়া করলেন - যেটি তিন শান্তির তত্ত্ব নামে পরিচিত হল। প্রথম - শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, দ্বিতীয় - শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা, তৃতীয়-শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ। দ্বাবিংশতম সোভিয়েত কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ সরাসরি সর্বহারা একনায়কত্বের ধারণার বিরোধিতা করে "সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার কথা এবং সর্বহারা শ্রেণির পার্টির বদলে "সমগ্র জনগণের পার্টির" প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি পুঁজি লগ্নির পক্ষে ছিলেন। তাঁর মতে কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রগতি হচ্ছে না। সামগ্রিক অর্থনীতির হাল ভালো নয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জমিতে ব্যক্তি মালিকানার পক্ষে সওয়াল করেন। স্তালিনের সময়কার পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি থেকে সরে এসে ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা জন্য উন্মুক্ত করেন এবং মুনাফাকেই অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। এর ফলে ওখানে একচেটিয়া পুঁজিবাদের অধীনে চলে আসে অর্থনীতির অনেকটা অংশ, যারা আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে ক্রমশ দূরে সরে যায়। পরবর্তী কালে ব্রেজনেভ জাতীয় আয়ের কুড়ি শতাংশ সামরিক ক্ষেত্রে ব্যয় করায় দেশের সামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ ধাক্কা খায়। এই প্রেক্ষিতে গর্বাচেভের পেরেস্ত্রোইকা অর্থনৈতিক নীতির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

এই নতুন নীতি আসলে কেমন হবে? এর উত্তর দিতে গিয়ে বিশিষ্ট সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ অ্যাবেল আজানবেগিয়ান লিখেছেন - We want a highly efficient economy to reach the highest productivity level in the world, to be at forefront in technology and quality of production. গর্বাচেভের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মূল নীতি এই highest productivity level এ পৌঁছোনোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এর সঙ্গে থাকবে সৃজনশীলতা এবং বাজারজাত করবার মত আকর্ষণীয় পণ্য। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক - আর্থিক স্বাধীনতা, ঋণদান, যৌথ মালিকানা প্রদান করার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

গর্বাচেভ অর্থনৈতিক ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ উন্নত করার নীতি নিয়েছেন। যৌথ মালিকানা প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের একটি সুন্দর মেলবন্ধন করতে চাইছেন। সেই জন্যেই পার্টির সম্মেলনে কলকারখানার নিজস্ব অর্থ লগ্নি, নিজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, সমবায় আন্দোলনে উৎসাহ দান, উৎপাদন বাড়াতে নানা ধরনের লীজ, কন্ট্রাক্ট প্রভৃতির প্রচলন,জমি ও চাষির বিচ্ছিন্নতা কাটাতে চাষিকেই উৎপাদনের যথার্থ মালিকানা প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন সাধারণ নীতি গৃহীত হয়েছে। যথার্থ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে "বৈষয়িক প্রেরণা" বা মেটিরিয়্যাল ইনসেনটিভ দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ টাকা বা উপঢৌকনের লোভে পরিশ্রম করবে। বুর্জোয়া অর্থনীতির এই ধারণাটা যখন সমাজতন্ত্রে চালু করতে হয় তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্যানধারণায় হয় এদেশে অপমৃত্যু হয়েছে, এই মূল্যবোধ বিপ্লবের সময় থেকে গড়েই ওঠে নি। সবটাই ওপর থেকে জোর করে চাপানো। তাই এখানে নতুন ব্যবস্থায় শ্রম অনুযায়ী অর্থ রোজগারের ব্যবস্থা করা হল। কারখানার মাল বাজারজাত করার পর মুনাফা হলে মাহিনা হবে। বিক্রি না হলে বা কোম্পানির লাভ না হলে কর্মীদের ছাঁটাই করা হবে। নতুন ব্যবস্থায় নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিসের উৎপাদন ও বন্টন রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে। বাকি সবই ব্যক্তি

মালিকানায় বাজারের ওপর সম্পৃক্ত করে চলবে। গর্বাচেভের দাবি যুগের প্রেক্ষিতে এই ভাবে ব্যক্তির সৃষ্টিশীল ও দায়িত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে মজবুত করবে। রাষ্ট্র বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী। এই প্রতিযোগিতায় তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে বিরোধ হলে রাষ্ট্র সেগুলো শান্তিপূর্ণ পথে মীমাংসা করবে। গর্বাচেভের এই অর্থনৈতিক পদক্ষেপ বা খোলা হাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রকে এবং অর্থনীতিকে নতুন দিশা দেখাবে কিনা, সমাজতান্ত্রিক বন্ধ্যা অর্থনীতিকে গতিশীল করবে কিনা সেটা সময়ই বলবে। তবে নিন্দুকদের মতে এটা মার্কসবাদের নাম করে সোভিয়েত অর্থনীতিতে অভিজাত আমলাতন্ত্রদের সঞ্চিত পুঁজিকে লগ্নি করার একটা তাত্ত্বিক বৈধতা দেবার চেষ্টা। একদলীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোকে ধরে রেখে এর অধীনে পুঁজিবাদকে বিকশিত করার কৌশল এটা। বোঝাই যাচ্ছে সোভিয়েত দেশ সমাজ অর্থনীতিকে মুক্ত সমাজের উপযোগী করার পথে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

শেষের কথা : এসব হইহুল্লোড়ে তিন বছর কেটে গেল। লেখায় বক্তৃতায় খানিকটা সচলতা এল। একটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করার দক্ষতা অর্জন করলাম। এদিকে আবার কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ-তে আমি একমাত্র চান্স পেলাম। কিছুতেই সেখানে পড়তে যেতে রাজি ছিলাম না। তপনবাবু সহ সব স্যারেরা জোর করে পাঠালেন।এই কলেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গভীরে যাওয়ার যে পথ দেখালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমের লেকচারে, স্যার ম্যাডামদের রুমে, করিডরে, সেমিনারে, জাতীয় গ্রন্থাগার, আমেরিকান লাইব্রেরিতে ছোটো ছোটো অক্ষরগুলোতে ভাবনার জগতে আরো গভীরে গিয়ে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। কলেজ ছাড়ার তেত্রিশ বছর পরেও এখনো হাবুডুবু খাচ্ছি।এ থেকে আর বেরোতে পারলাম না। তেত্রিশ বছর হয়ে গেল কেউ কথা রাখেনি, কেউ কথা রাখে না।

With Best From :

Kaushik Mukherjee
Sr. Manager Marketing
Mob. : 824070708/9007004075

SALES & SERVICE
ALL PYPES OF KITCHEN CHIMMNEY & RO WATER PURIFIER
AVALIABLE HERE

ফিরে দেখা

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

****

১৯৭৮ প্রথম ব্যাচ দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল বেরোল। হাওড়া স্টেশনে গেজেট দেখে মনটা খুব ভালো। বাবা নেই, দুঃখ কষ্ট করে টিউশনি, বাড়িতে বসে মাকে ঠোঙা বানাতে সাহায্য করে জীবনটাকে কোনোমতে চালিয়ে নিয়ে চলেছি। কলেজে ভর্তি হতে মন চায়, কিন্তু একটা থেকেই যায়। কী পড়ব! খুব ইচ্ছে বাংলা নিয়ে পড়ব। মায়ের প্রবল আপত্তি বিজ্ঞান ছাড়া চলবে না। ১৯৭৮-এর প্রবল বন্যার পরে গুটিগুটি পায়ে গেছি নরসিংহ দত্ত কলেজে। বেলিলিয়াস রোডে তখনও জল থইথই করছে। অফিস ঘরে তখন সবাই আলমারি, টেবিল সব বাঁচাতে ব্যস্ত। বাধ্য হয়েই নিচের বিরাট টেবিল আর তার চারপাশে থাকা অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের দিকে ভীরু চোখ মেলে এগোতেই সবাই আমার মার্কশিট দেখতে চাইলেন। কেউ বললেন, কেমিস্ট্রি পড়তে। অধ্যাপক বি বি জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ফিজিক্স কেমন লাগে! সংকুচিত হয়ে বললাম ভালো। ওটাই নাও বুঝলে। এই সময় চোখে পড়ল সাদা পাঞ্জাবি ধুতি পরিহিত বেশ লম্বা একটি মানুষ। হ্যাঁ, উনি অমল সরকার(এ এস)। স্মিত হেসে বললেন জুলজি পড়ো বুঝলে, আনন্দ পাবে। আগামী ১০ই জুলাই এলিজিবিলিটি টেস্ট আছে, আজ আবেদন করে যাও। কেমন একটা ভরসা পেলাম। আন্তরিকতার একটা পিতৃস্নেহের মন্দাকিনী প্রবাহ যেন বয়ে গেল। আবেদন করলাম। পরের সপ্তাহে পরীক্ষা দিলাম। যথাসময়ে ফলাফল বেরোলো। বিস্মিত হলাম এই দেখে আমার নামটাই সবার ওপরে জ্বলজ্বল করছে। বহু কষ্টে ভর্তি হলাম। কিছুদিনের মধ্যেই ক্লাস আরম্ভ হল। মোট চোদ্দো জন ছাত্রছাত্রী। তার মধ্যে তিন জন ছাত্র আর বাকি এগারো জন ছাত্রী। এখন যেটা বটানির স্টাফরুম ওটাতেই আমাদের জুলজি অনার্সের ক্লাস হত। সত্যি বলতে কি একটা পরিবারের মধ্যে যেন ঢুকলাম।

আমরা বেশ আনন্দে কলেজ যেতাম। ফিরতে মন চাইত না। ভীষণ ভালো লাগত এস এমের ক্লাস। জেনেটিক্স এর রাজপুত্র মনে হত ওঁকে। বেশ মনে আছে ওঁর প্রিয় শার্টের রঙ ছিল স্কাই ব্লু। এছাড়া এস কে জি কে আমরা আর্থোপোডা বলতাম। আর এম পি কে মোলাস্কা। কিন্তু এ এসের কোনো তুলনা হয় না। পড়ানোর থেকেও কার কোথায় অসুবিধা হচ্ছে দেখাটা ওঁর নিত্যনৈমিত্তিকী ছিল। হঠাৎ একদিন আমায় বললেন : তুই ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি চিনিস ? বললাম হ্যাঁ স্যর। তুই আজ সন্ধ্যেবেলা চলে আয়। কথা আছে। দেখা হতে বললেন, তোর বাবা নেই। শুনেছি। তোর যেখানে অসুবিধা হবে এখানে চলে আসবি। দেখি তুই তো রানিং নোটস লিখিস খুব। ওগুলো ফেয়ারে টুকে নোটস তৈরি করে আমাকে দেখিয়ে নিবি। মনে হল, ঠিক যেন একজন বাবা কথা বলছেন। নরসিংহ দত্ত কলেজের জুলজি বিভাগের কোনো তুলনা নেই। আজও শুক্লাদি, সুব্রতদা, মহুয়া, শাশ্বতী বা অন্যান্যরা কাল বদলালেও মানুষগুলো অটুট অমলিন আছেন।

১৯৮৩ তে হঠাৎই এলাম বাংলা বিভাগে। অনেকটাই কর্মক্ষেত্রের প্রেরণায়। তদানীন্তন সময়ে আমি শিক্ষক ছিলাম দমদম মতিঝিল কলিজিয়েট স্কুলে। সেখানের প্রধান শিক্ষক অতনুবাবুর অনুরোধে আবার কলেজে এলাম। তখন স্পেশাল অনার্স দু'বছরের ছিল। যেতেই বিভাগীয় প্রধান ধ্রুববাবু জড়িয়ে ধরলেন। আগেই আলাপ ছিল আবৃত্তির সূত্রে। এই বিভাগের আন্তরিকতা ও শৃঙ্খলা মুগ্ধ করেছিল আমায়। বীরেনবাবুর অনবদ্য পাঠদান বেশ মনে আছে।

সকলেই তিন বছর কলেজে পড়লেও আমি পড়েছিলাম পাঁচ বছর। কারণে অকারণে আজ এই প্রৌঢ় বেলায় জীবনের পশ্চিমাকাশে যখন সূর্য অস্তমিত প্রায় তখনও কলেজকে ভুলতে তাই পারি না। স্মৃতির ইজেলে নরসিংহ দত্ত কলেজের ছোঁয়া আজও আমার জীবনে অমলিন।

কলেজে সুখ-দুঃখের দিনগুলো

তরুণ কুমার মন্ডল

****

প্রিয় বান্ধবী পৌলোমী,

স্মৃতির সরণি বেয়ে ভেসে আসে অনেক না বলা কথার ঝাঁপি। আজ আর প্রথমেই তোর সঙ্গে ঝগড়া করব না। যদিও বা অনেক জমানো ব্যথা বেদনা তোকে বলার আছে - আর আমরা দুজনেই জানি আমাদের এই বলার মাধ্যম চিঠি—এই চরম প্রযুক্তির যুগে সোশ্যাল মিডিয়ার রমরমার মধ্যেও আমাদের মনের কথা আমরা বলছি চিঠির মধ্য দিয়ে—এটা আমাদের পরম তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টির বিষয়। আসলে আমাদের ওয়েভ লেংথ এক বলেই হয়তো আমরা বছরের পর বছর টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছি এমন সুন্দর একটা সম্পর্ক যার অনেকটাই এখনো রহস্যাবৃত। জানিস পৌলোমী আজ সকাল থেকেই নস্টালজিয়া ভর করেছে মনের মধ্যে। সেই কত বছর আগে ছেড়ে-যাওয়া কলেজ আর সেখানে তিন বছরের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার দিনগুলো যেন কুয়াশার আস্তরণ সরিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আজ সেই স্মৃতিচারণই করি তোর কাছে।

আমার কলেজ হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজ—যা হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডের উপর অবস্থিত। পৌলোমী এর আগে তোকে আমার স্কুল জীবনের কথা বলার সময় বলেছিলাম আমার পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত কেটেছিল এই বেলিলিয়স রোডেই হাওড়া আই আর বেলিলিয়াস ইনস্টিটিউশন স্কুলে। তার পাশেই এই কলেজ বলা যায়। ইতিহাসে পরে আসছি। আগে তোকে বলে নিই আমার সেই ফেলে আসা দিনগুলির কথা

'মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে'—এই গানটা মনে পড়ল এখনই—সত্যি আজ যেন অতীত বার বার এসে ধাক্কা মারছে বুকের মধ্যে। আর এই গানটির সঙ্গেই মনে পড়ল বাচ্চুকে (সুনির্মল আচার্য)। আমাদের অফ পিরিয়ড থাকলে আমরা সবাই ভেসে যেতাম তার গানে। একটা গান বাচ্চু প্রায়ই শোনাত আমাদের—ভুপেন হাজারিকার 'একখানা মেঘ ভেসে এল আকাশে'। বেশ সুন্দর ফুরফুরে ছিল দিনগুলি। আর গানের কথা উঠল বলে আর একজনের কথা না বললেই নয়—সে হল চন্দ্রিমা দে এখন দাস এবং হাওড়ার একজন নামি সংগীতশিল্পী। চন্দ্রিমার সঙ্গে এখনো যোগাযোগ আছে খানিকটা পেশার সূত্রে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কভার করতে গিয়ে দেখা হয়, কথা হয় চন্দ্রিমার সঙ্গে। পেশায় চন্দ্রিমা অবশ্য একজন শিক্ষিকা—ডোমজুড় নেহেরু বালিকা বিদ্যালয়।

পৌলোমী আর একটা ব্যাপার না বললেই নয়। তখন সৌজন্য প্রদর্শন ছিল অত্যন্ত আন্তরিক যা এখন প্রায় দেখাই যায় না। আমি ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শী হলেও সেই সময় কলেজের এস এফ আই ছাত্র সংসদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ভাল। এখনো মনে পড়ে টয়দা (জয়ন্ত মুখার্জী), আশিসদা, বিশ্বনাথদা আর সেই সময়ের জি এস শর্মিলাদির (শর্মিলা মহিন্দর) কথা। এঁরা নানাভাবে পড়াশুনার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন।

এই কলেজ এ বছর শতবর্ষে পা দিল। ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠা হয় এই কলেজ। উনিশ শতকের প্রথমদিকে ইহুদি ব্যবসায়ী আই জ্যাক রাফেল বেলিলিয়স ব্যবসায়ের মুনাফার অর্থ দিয়ে বাগানবাড়ি ও পার্ক ক্রয় করেন। তার দেখাশোনার ভার দেন তখনকার বিশিষ্ট আইনজীবী নরসিংহ দত্তকে। তিনি মারা যাবার পর তাঁর পুত্র সুরঞ্জন দত্ত এই কলেজের সূচনা করেন। বর্তমানে এটি জেলার প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম কলেজ। বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে নিয়ে চলেছেন কলেজকে। ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে পদযাত্রা, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, রক্তদান শিবির। সারা বছর ধরেই চলবে অনুষ্ঠান।

পৌলোমী আজ আর অন্য কথা হল না। আগের চিঠিতে তোকে কথা দিয়েও এবার বলতে পারলাম না

অনামিকা আর সুস্মিতার কথা। পরের চিঠিতে নিশ্চয় বলব। পুজো আসছে। তুই তো এবার আসবি বলেছিস। অষ্টমীর দিন শাড়ি পরিহিত তোর পাশে দাঁড়িয়ে আমি পুষ্পাঞ্জলি দেব—ভাবতেই লাগছে রোমাঞ্চ আর শিহরন। সেই আশাতেই আজ কলেজজীবনের স্মৃতিবিজড়িত মনে অনেক অনেক আনন্দ জমা হচ্ছে। পাশাপাশি কলেজ জীবনের স্মৃতি তোর সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে ভালো লাগছে আর সেই ভালো লাগার জায়গা থেকেই আমার একান্ত চাওয়া এই কলেজ আরো আরো উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে চলুক। চিঠি দিবি—লম্বা বড়ো চিঠি। আর পুজোয় তো আসছিসই। তখন হবে আরো কথা, ঝগড়া।

ইতি

তোর তরুণদা

With Best Compliments From :

Eureka Chemicals &
Laboratary Equips

Dealers in

Scientific Instruments & Chemicals

HOWRAH-711101

নানা রঙের দিনগুলি :

শ্রাবন্তী গের ঘোষ

****

'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি..'

একটা সময়ের পর পুরাতন দিন পুরাতন মুহূর্তরা সত্যিই স্মৃতি হয়ে যায়! রয়ে যায় কিছু পিছুটান আর সোনালি বিকেলজোড়া আবছায়া স্মৃতিরা। সেই স্মৃতির অতলে ডুব দিলেই উঠে আসতে চাইবে কোটি টাকার চেয়ে দামি নানান মুহূর্তরা। আমার নিজস্ব এই মুহূর্তদের ভিড়ে জ্বলজ্বল করছে একটি শ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘ সময় কলেজজীবনের তিনটি বছর। সেই তিনটি বছর যা আমাকে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে সুযোগ করে দিয়েছে, দিয়েছে এমন কিছু সঙ্গ যা সত্যিই অসাধারণ।

যেদিন প্রথম আমার কলেজে পা রেখেছিলাম সেই দিনটা আমার বেশ মনে আছে। অ্যাডমিশনের আগে ভেরিফিকেশন হবে তাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলেছি কলেজের দিকে। যদিও বাস থেকে নেমে ছয়-সাত মিনিট হাঁটা পথ তবুও চোখে মুখে একটা উত্তেজনা, কোন দিকে যাচ্ছি জানি না সবদিকেই বড়ো বড়ো লোহালক্করের কারখানা। ঘেমে একাকার হয়ে যখন কলেজের মেইন দরজায় দাঁড়িয়েছি তখন মনে হচ্ছিল খুব একটা নরম অথচ গমগমে ভয় যেন খেতে আসছে আমাকে। এত লম্বা একটা ক্যাম্পাস কোন দিকে কোন রুম আমি তো কিছুই চিনি না। তখন একজন শ্যামবর্ণ, লম্বা, মাঝবয়সী, নীল পোশাক পরা ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন 'মরার আগে কখনও ভূত হবি না।'—এই কথাটা এবং ঘটনাটা আমার কাছে বারংবার স্মরণীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। তিনি আমাকে রুম নম্বর দেখে তিন তলার আট নম্বর ঘরে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই প্রথম দিন থেকেই দারোয়ান কাকুকে আমি মনে মনে ভীষণ শ্রদ্ধা করতাম। কলেজে যাতায়াতের সময় তাঁকে দরজার সামনে বসে থাকতে দেখে যেন আপনার বলে খুব হালকা একটা অনুভুতি হত। আর যেদিন থেকে ওই চেয়ারে অন্য কাউকে বসতে দেখেছি সেই দিন থেকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি দারোয়ান কাকুকে দেখার জন্য।

এভাবেই রোজ ভোরে উঠে যেতে হত মর্নিং ক্লাসে। খুব কম হাতে গোনা কয়েকজনকে নিয়ে শুরু হত সকালটা। বেলা গড়িয়ে দুপুর যখন হত তখন কলেজে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মতো ফাঁকটুকুও খুঁজে পাওয়া যেত না। ক্যাম্পাসের পুকুরটা বর্ষাকালে জল ছাপিয়ে নদীতে পরিণত হলেই দোতলার বারান্দা থেকে দেখতে বেশ ভালো লাগত, কিন্তু সকলকে দুর্ভোগ পোহাতে হত ভালো লাগার চেয়ে অনেক বেশি। আবার এই পুকুরটা যখন নিজের রূপে ফিরে যেত তখন এর পাড়ে বসে কত বন্ধুর দল কত গান কত গল্পের আসর জমিয়ে তুলত তা আজ ইতিহাস। ওই দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে আঠারো বছরের তরুণীর দল নিজের নতুন প্রেমের কবিতা আওড়াত। কিছু ছেলে সিগারেট ফুঁকে ধোঁকাবাজ মেয়েটাকে কটাক্ষ করত। আমি দেখতাম গুগলি আর মাছগুলো কীভাবে সিঁড়ির কাছে এসে ভেসে উঠছে আর অন্য কারো হাত থেকে পাওয়া পাউরুটি কিংবা খাবারের টুকরোটা নিজের মনে করে দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করছে।

আর সেই ক্যান্টিনটা আমার সব বন্ধুদের খুব প্রিয় ছিল। আমরা প্রতিদিন ক্যান্টিনে বসেই প্রাতঃরাশ করতাম। বাড়ি থেকে যে যা পারতাম আনতাম, কখনো বা ক্যান্টিনের লুচি-ঘুগনিই জলখাবারে খেতাম। তবে সঙ্গে থাকত গরম গরম ডিমের ডেভিল। আহা! সেই দিনগুলো এতই রঙিন ছিল যে যাঁরা উপভোগ করেনি তাঁরা কতটুকু বুঝবেন বলতে পারছি না।

তবে প্রত্যেক কলেজেরই একটি আকর্ষণীয় জায়গা বোধ হয় লাইব্রেরি। উফফ্ যখনই যেতাম মনে হত পৃথিবীর সুন্দরতম একটি স্থান হল বইমহল। কলেজের দোতলার একটা বিল্ডিং কি যথেষ্ট এত বড়ো একটা পৃথিবীর এত রকমের বৈচিত্র্যময় ঘটনাকে ধরে রাখতে?

কত দেশ- বিদেশের কত জানা-অজানা রহস্য ভিড় করে আছে ওই দেওয়াল জোড়া শেল্ফগুলোতে। এ কোন দেশ এ তো সেই বইয়ের দেশ, রূপকথার রাজ্য। আসলে স্কুলে এত বড়ো লাইব্রেরি ঘর ছিল না, তাই কলেজের আলমারি ঠাসা বইগুলো ভীষণ আবেগ সৃষ্টি করত মনের ভিতরে। আর নিস্তব্ধ কাঠের চেয়ারটেবিলে বসে যখন কাউকে একমনে পড়তে দেখতাম মনে হত ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় ধনী আর কেউ নেই এই পৃথিবীতে।

অনার্সের ক্লাসগুলো অনাবিল সুখের হাওয়া নিয়ে বয়ে যেত। এক এক অধ্যাপক এক একরকম ভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করতেন, কেউ পড়াতেন মধ্যযুগের কবি ও কবিতা, কেউ 'চৈতন্যচরিতামৃত', আধুনিক সাহিত্য নিয়ে যখন কেউ পড়াতেন তখন বেশ ভালো লাগত, পড়তে হত 'ধ্বনি' ও 'রস'। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'য় যখন ভালোবাসাকে প্রথমবার আকণ্ঠ পান করছি ঘড়ায় তোলা জল এবং দীঘির জলের মধ্যে দিয়ে তখন যে প্রেমসায়রে আত্মনিমজ্জন করতে চাইনি তা কিন্তু একেবারেই নয়। আবার শক্তিবাবুর খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়াতে ভয় লাগলেও নিঃসঙ্গ নিঃশ্বাসও যেন বলে যায় জীবন পড়ে রয়েছে অসময়ে চলে যাওয়া উচিত হবে না। অনেক ঊর্ধ্বে উঠে যখন এই সাম্মানিক বাংলা পড়ার সুযোগ ঘটে তখন অথৈ সাগর অথৈ জল, ও মন চিরজনম পড়ব বল। তবুও তো সময় ফুরিয়ে আসে; সাইকেল গ্যারেজের ওপারে যে ফাঁকা মাঠটায় আমাদের নবীন বরণের অনুষ্ঠান হয়েছিল সেটা চোখের সামনে সবুজ আগাছায় অযত্নে নিজেকে বিকিয়ে দিতে থাকে ক্রমশ। আর কখনো যাওয়া হয়নি মাঠে। এদিকে আমাদেরও 'নানা রঙের দিনগুলি' একে একে ফুরিয়ে যেতে থাকল।

এগিয়ে এল তৃতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা। একটার পর একটা পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছি, পথে চোখের কোণ গড়িয়ে ঝরে পড়ছে যারা তারা আমার কলেজ জীবনের শেষ প্রহর, আমার প্রতিদিনের রোদ সরে গিয়ে ঝাপসা হয়ে আসা ভাদ্রমাসের বর্ষা। পরীক্ষা তো ভালোই হচ্ছে ফললাভও বেশ ভালোই হবে স্থির বিশ্বাস কিন্তু নরসিংহ দত্ত কলেজের আঙিনা জুড়ে যে পায়রার দল ধান খেয়েছে তিন বছর ধরে সেই ধানের মেয়াদ যে শেষের পথে। আবার একদল নতুন পায়রা আসবে, পুরাতনকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয় আগামীর পথে।

আমার এই লেখা আমার কলেজের স্মৃতিচারণায়। বাঁধাধরা শব্দসংখ্যায় কখনও এই স্মৃতি-ক্যানভাস ভরানো যায় না। কলেজের দিনগুলো, নতুন তৈরি হওয়া ঘরগুলো, প্রতিদিনের বেঞ্চগুলো, বিভাগের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, কলেজে আসা-যাওয়া, প্রিয় বন্ধুর দল, প্রিয় অভিভাবকদের থেকে পাওয়া শিক্ষা সবই তো ভীষণ আবেগমথিত বিষয়, যেগুলো সবই সুখছবি হিসাবে অঙ্কিত হয়ে রয়ে গেল এ হৃদয়পটে।

ফিরে দেখা ১৯৭০-১৯৭৩

অভিনন্দা দাস বন্দ্যোপাধ্যায়

****

দেখতে দেখতে 'হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজ' শতবর্ষে পদার্পণ করল। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে পদযাত্রায় পা মেলাল। আমার দুর্ভাগ্য আমি সেই পদযাত্রায় সামিল হতে পারিনি। তবে এখন ফেসবুকের দৌলতে সবটা না হলেও অনেকটাই উপভোগ করলাম। পুরোনো কলেজ বিল্ডিংটাকে দেখে, নতুন করে 'পুরানো সেই দিনের কথা' মনে পড়ে গেল।

১৯৭০ সাল হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে বাবার সঙ্গে ভর্তি হতে গিয়েছিলাম নরসিংহ দত্ত কলেজে। অপেক্ষাকৃত ছোটো হাওড়া যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুল থেকে গিয়ে পড়লাম নরসিংহ দত্ত কলেজের প্রাঙ্গণে। দিদিমণিদের কড়া শাসন আর ডিসিপ্লিনের স্নেহচ্ছায়া থেকে গিয়ে পড়লাম স্যার ম্যাডামদের দরজায়। এখানে নেই কোনো অনুশাসনের বেড়াজাল। কলেজে পৌঁছে কোনো প্রার্থনার বালাই নেই। ইচ্ছামতো ক্লাস করা যায়। Roll-Call-র সময় উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত বলতে হয় না। ইয়েস স্যার বা ম্যাডাম বললেই হয়ে যায়। অন্যের হয়ে প্রক্সি দেওয়া যায় সেটা কলেজে গিয়েই শিখলাম।

যাই হোক, ভর্তি হলাম জুলজি, বটানি আর anthropology নিয়ে। স্কুলে জুলজি, বটানি পড়ে এসেছিলাম, anthro-টা নতুন subject। জুলজি পড়াতেন A.S. অর্থাৎ অমল সরকার। একটু বয়স্ক, সাদা পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে আসতেন। সুন্দর করে পড়াতেন। আর একটুখানি পড়িয়েই বলতেন—do you follow? আর ছিলেন—M.P. অর্থাৎ মদন পালিত (পদবিটা ভুল হতেও পারে)। ছিলেন R.M.C.। আর ছিলেন একজন ম্যাডাম D.B.—ধীরা ভদ্র। অল্পদিনের মধ্যেই এঁরা আমাদের খুব প্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন। আরে! আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি ইতিমধ্যে প্রচুর বন্ধুবান্ধব হয়ে গেছে। সকলেই স্কুল থেকে সবে কলেজে এসেছে, বন্ধুত্ব হতে দেরি হয়নি।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম—বটানি পড়াতেন, S.D, M.K.D, M.C. (মণিময় চ্যাটার্জী) আর একজন ম্যাডাম S.M.।

Anthropology পড়াতেন M.C. মুকুল চ্যাটার্জী। পড়াতেন খুব ভালো, মানুষটাও ছিলেন ভীষণ সাদাসিধা এবং পরোপকারী। D.M. দীপক মুখার্জী। ভাল গান করতেন। একজন ম্যাডাম—L.N. (লাকু নন্দী)। সেকেণ্ড ইয়ারে উঠে আর একজন নতুন অধ্যাপককে পেলাম—S.S. সবুজ সেন। বলা যেতে পারে পাড়ারই লোক। বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশনের ছাত্র। Sociology পড়াতেন। খুব ভালো কাটত দিনগুলো। কিন্তু হঠাৎ একদিন কলেজে গিয়ে দেখলাম কলেজে লোকে-লোকারণ্য। পুলিশ ভর্তি। Class বন্ধ। দু-এক জনের সঙ্গে দেখা হল—সবাই ভীত-সন্ত্রস্তভাবে বাড়ির দিকে ছুটছে। খবর নিয়ে জানলাম কলেজ কম্পাউন্ডের মধ্যে ঝিলের জলে কচুরিপানার জঙ্গলে পড়ে আছে দুটো ডেডবডি। কলেজেরই ছাত্র তারা। SFI করত। কিন্তু, মারলো কারা? তখন—নকশাল নামধারী এক উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারাই মেরেছে এমন অভিবেশ। ধরপাকড় শুরু হল। কলেজ আপাতত বন্ধ। তবে এই উৎপাত খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। আবার শুরু হল কলেজের ক্লাস। দেখতে দেখতে test exam শেষ হল। বাড়িতে বসে পড়াশোনা। মাঝে মাঝে কলেজে গিয়ে Practical Class। এখানে আমাদের laboratory-assistant-দের কথা না বললেই নয়। কারণ, Practical পরীক্ষার সময় তাদের সাহায্য না পেলে খুব অসুবিধায় পড়ে যেতে হত। জুলজির সাহায্যকারীদের নাম—সন্তোষদা আরো দু'জন ছিলেন—তাঁদের নাম ভুলে গেছি। সেইরকম বটানি ও Antrhropology-রও দুজন করে ছিলেন। Part-I পরীক্ষার বছরটা ছিল—নকশাল আন্দোলনের বছর। রাজনৈতিক খুনখারাপির কারণে অনেক তাজা প্রাণ চলে গিয়েছিল। আমাদের বরাবর

home-centre হত, অর্থাৎ নিজেদের কলেজেই সিট পড়ত। কিন্তু, সেবারে রাজনৈতিক কারণে আমাদের centre cancel হয়ে গেল। কলেজ থেকেই ব্যবস্থা করে মেয়েদের সিট পড়ল হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজে। এবং ছেলেদের পড়ল দীনবন্ধুতে। যাই হোক, নির্বিঘ্নে পরীক্ষা শেষ হল। Result বেরোবার আগেই থার্ড ইয়ারের class শুরু হয়ে গেল। আবার class, আবার পড়াশোনার ফাঁকে বন্ধুদের সাথে আড্ডা।

এখন আমরা অধ্যাপকদের অনেক কাছে চলে এসেছি। থার্ড-ইয়ারে উঠে আমাদের Anthropology-র excursion-এ যেতে হয়েছিল। স্থান মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে। দশদিনের excursion। সকালে উঠে প্রাতঃরাশ সেরে পায়ে হেঁটে গ্রামের ভিতরে গিয়ে alloted বাড়িগুলোতে ঘুরে ঘুরে census করা, data collection আর সন্ধ্যেবেলায় স্যারদের কাছে note-submit করা পরের দিনের কাজ ঠিক করা আর রাতের খাওয়াদাওয়ার পর খাতা লেখা। এতকিছুর মধ্যেও বড়ো আনন্দে কেটেছিল এই দশ দিন। থার্ড-ইয়ার মানে বিদায় বর্ষ। তবে থার্ড-ইয়ারে কলেজ- সোশালে একটা নাটক করেছিলাম মনে আছে।

আমাদের কলেজে খুব বড়ো করে College-সোশাল হত। বড়ো বড়ো গায়কগায়িকারা গান শোনাতে আসতেন। সারা রাত অনুষ্ঠান হত। তবে আমাদের সময় রাত নটার পর বাইরে থাকার অনুমতি ছিল না। তাই প্রথমদিকে কিছু উঠতি গায়কগায়িকার গানশুনেই বাড়ি ফিরে আসতে হত।

একদিন Part-II পরীক্ষাও শেষ হয়ে গেল। অতএব বিদায় নরসিংহ দত্ত কলেজ। তোমার আঙিনায় তিনটি বছরের লীলাখেলা সমাপ্ত। তখন ১৯৭৩ সাল।

With Best Compliments From :

NARENDRA NATH GHARA
DIRECTOR
918017316383/919433139750
nnghara&kemelindia.in

KERNEL SOLUTIONS PVT LTD

WWW.KERNELINDIA.IN

OFFICE :
3, MOHINI MOHAN ROAD, BHOWANIPUR,
KOLKATA-700 020

HEAD OFFICE :
DAMODAR APARTMENT, 1ST FLOOR,
BALTIKURI KALITALA, HOWRAH-711 113
WEST BENGAL, INDIA, PHONE : 033-2653 2157
REGD. OFFICE :
SHANPUR, SHIBTALA, DASNAGAR,
HOWRAH-711 105, WEST BENGAL, INDIA

মুহূর্ত জন্মায়, মরে না

অনমিত্র রায়

****

. আমার বেশ সুন্দর একটা 'ইশকুল-বেলা' ছিল। ক্লাস ওয়ান থেকে ফোর, আবার ফাইভ থেকে টেন। ফাইভ থেকে টেন-এর গল্প আগেই লিখেছি আর তা 'ইশকুল-বেলা' নামে বই হয়ে ছেপে বেরিয়েওছে। কিন্তু আরও অন্যদের মতো আমার কোনো 'কলেজ-বেলা' ছিল না। তার কারণ কলেজ-বেলা শেষ হওয়ার আগেই আমি সে-পথ থেকে সরে আসতে বাধ্য হই। পরে অন্য পথে আলাদা এক কলেজ-বেলা পেরোই।

কিন্তু মুহূর্ত জন্মায়, মরে না। আর তাই হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে আমার পৌনে দু-বছরের যে অসমাপ্ত কলেজ-বেলা তার টুকরোটাকরা মনে রয়ে গেছে। মনে রয়ে গেছে কলেজ ক্যাম্পাসের ছায়া, মনে রয়ে গেছে সেই কলকে ফুলের গাছটাও। আরও মনে রয়ে গেছে প্রফেসর সুহাস বিশ্বাসের ভরাট গলায় প্রিয় কবি ব্রাউনিং-এর বিখ্যাত কবিতা 'দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার' পড়ানোর সেই অবিস্মরণীয় দিনটার কথা। রুম নম্বর ৫৯-এর জানলার বাইরে আকাশ ঘন মেঘে ঢেকে গেছে শেষ বিকেলে। দু-এক বেঞ্চ আগে দাঁড়ানো স্যারের মুখটাও আবছায়া। এমনকী পাশে বসা বন্ধুও কেমন অস্পষ্ট। বান্ধবীরাও। তার মধ্যেই মন্দ্রস্বরে কানে বাজতে থাকে

I said— Then, dearest, since, 'tis so,
Since now at length my fate I know,
Since nothing all my love avails,
Since all, my life seemed meant for, fails,

একসময় মোহজাল ভাঙে। আমরা যে যার পথে বাড়ি ফিরি।

একবার ঠিক হল আমরা বেশ ক-জন মিলে সুব্রতদের বাড়ি যাব একদিন। ওর বাড়ি বাগনানে। প্রায় সবাই চেনে। আমি চিনি না। একা একা লোকাল ট্রেনে চেপে যাওয়ার মতো যথেষ্ট বয়েস হয়ে থাকলেও, আমি তখনও সে-ব্যাপারে ঠিক সড়গড় নই। ঠিক হল, সুমন্ত সিঙ্গুর থেকে এসে হাওড়া স্টেশনে নির্দিষ্ট জায়গায় আমার জন্য অপেক্ষা করবে। তারপর আমি পৌঁছোলে দুজনে মিলে যাব বাগনান। বাকিরা যে যার মতো চলে যাবে।

হাওড়া স্টেশনে নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করার চিরকালীন অর্থ হল, বড়ো ঘড়ির তলায় দাঁড়ানো। কিন্তু সুমন্ত বলেছিল, বড়ো অ্যাকোয়ারিয়ামটার সামনে দাঁড়াতে। কেন, তা আমি আজও জানি না। যেখানেই দাঁড়ানোর ব্যাপার হোক, আমাকে কারুর একটা সঙ্গে যেতে হবে। কারণ, আমি তো ঠিকঠাক চিনি না। পাকড়ালাম মেজোমামুকে। সেদিন সুমন্তর সঙ্গে মেজোমামুরও আলাপ হল।

এরপর লোকাল। কী লোকাল আজ আর মনে নেই। ট্রেন ফাঁকাই ছিল। দুজনে গল্প করতে করতে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি, চেকার। লোকাল ট্রেনেও চেকার ওঠে! কী জানি বাবা, হবে হয়তো ! একের পর এক টিকিট চেক করতে করতে ভদ্রলোক আমার আর সুমন্তর সামনে এসে হাত পাতলেন। আমরা আমাদের টিকিট বের করে দেখালাম। ভদ্রলোক বললেন, 'পঞ্চাশ টাকা ফাইন !' 'ফাইন! কেন? টিকিট তো কেটেই উঠেছি!' 'এটা ফার্স্ট ক্লাস কামরা। টিকিট সেকেন্ড ক্লাসের। তাই ফাইন লাগবে।' আমাদের তো আকাশ থেকে পড়ার অবস্থা। লোকাল ট্রেনেও ফার্স্ট ক্লাস! সে এক নাকানিচোবানি কাণ্ড! যত বলি, 'কাকু, জেঠু, আমরা প্রথম যাচ্ছি, আমরা জানতাম না,' কিছুতেই শোনেন না। শেষমেষ পঞ্চাশটা টাকা খসল। একে তখন হাতে গোনা দু-একটা টিউশনি করি, মা-বাবার দেওয়া হাতখরচাই ভরসা, তার ওপর পঞ্চাশটা টাকা! দুজনে মিলে চুক্তি করি, এ ঘটনার কথা কিন্তু বেমালুম চেপে যেতে হবে। না হলে আর রক্ষে নেই।

তারপর তো বাগনান স্টেশনে নেমে সুব্রতর বাড়ি

যাওয়া। কীভাবে গেছিলাম মনে নেই। সারাটা দিন বেশ হইহইয়ে কাটল। শেষ দুপুর বা বিকেলের দিকে ছাদে উঠলাম। বেশ বড়ো ছাদ। আড্ডা চলল। আকাশে এদিকে মেঘ জমছে। এক ফাঁকে পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনে বিস্তৃত ফাঁকা জমি। সবুজ। ততক্ষণে মেঘ বেশ ঘন হয়েছে।

হঠাৎ দেখি অনেকটা দূর থেকে কী যেন একটা আসছে বলে মনে হচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তুমুল বৃষ্টির একটা ঝাপটা এসে ভিজিয়ে দিল। জীবনে প্রথমবার বৃষ্টিকে মাঠঘাট পেরিয়ে উন্মাদের মতো ছুটতে দেখলাম। বৃষ্টি আসার পরমুহূর্তেই নীচে নেমে আসি। তারপর একসময় বাড়ি ফেরা। এখনও, এত বছর পরেও মাঝে মাঝেই মনে হয়, 'ওহ! সে এক বৃষ্টি দেখেছিলাম।'

এর পরে অনেকগুলো বছর ফাঁকতালে পালিয়েছে। হঠাৎ খবর পাই, সুব্রত আর নেই। আর কোনোদিন ওদের ছাদে বৃষ্টি দেখার সুযোগ হবে না। হয়তো ও-ই একদিন মুষলধারে ভিজিয়ে দিয়ে বলবে, 'একদিন আয়, আমি বৃষ্টি হয়ে তোদের সঙ্গে মাঠ পেরোনো মুষলধারা দেখি।'

কিছু স্মৃতি থাকে, কিছু ছেড়ে চলে যায় . . .

স্মৃতির পাতায় আমার কলেজ

প্রত্যুষা সিংহ

****

আমি এই নরসিংহ দত্ত কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী। এই কলেজের সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে যখন প্রথম কলেজে, আমি তখন বুঝতেও পারিনি তিন বছর পর কলেজ থেকে পাশ আউট হবার সময় এতটা কষ্ট হবে। আমি হচ্ছি এই কলেজের ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের ব্যাচ অর্থাৎ ২০২০-তে করোনা মহামারির সময় আমরা এই কলেজেই পড়ছি। অনলাইনেও যে পড়াশোনা হতে পারে এই কথা আমরা জেনেছি সেই সময়ে। সোম থেকে শুক্র রোজের থাকত দুটো করে ক্লাস, সকালে এবং বিকালে আর শনিবার থাকত একটা ক্লাস। আমরাও যেমন অনলাইন পড়াশোনার ব্যাপারে একেবারে নতুন, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে স্যার ও ম্যাডামরাও এই ব্যবস্থার সঙ্গে নতুন ছিলেন। কাজেই প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হলেও পরে তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। কিন্তু ক্লাসরুম, চক, ডাস্টার, প্র্যাকটিকাল ক্লাস, কলেজ এক্সপারশন, কলেজের টিচার্স ডে, রিইউনিয়ন ও অন্যান্য অনুষ্ঠান এই সবকিছু থেকেই আমাদের বেশ অনেকদিন, প্রায় চারটে সেমিস্টার বঞ্চিত থাকতে হয়।

ধীরে ধীরে মহামারি কাটল, সবাই ভ্যাকসিন নিল, এবং কলেজ শুরু হল। আবার সেই আগের ছন্দে ফিরতে শুরু করলাম। ব্ল্যাক বোর্ড, চক প্র্যাকটিকাল ক্লাস বন্ধুদের সঙ্গে মজা করে টিফিন খাওয়া ফিরে পেলাম। আগে অনলাইনে শিক্ষক দিবস, পরিবেশ দিবস এবং জাতীয় আম দিবস- এইগুলো উদযাপন করেছিলাম। কলেজ খুলতে সেগুলো পালন করলাম অফলাইনে অর্থাৎ স্যার ম্যাডামদের সামনে। ষষ্ঠ সেমিস্টারে ওঠার পর স্যার ম্যাডামদের অনুমতি নিয়ে আয়োজন করলাম বোটানি ডিপার্টমেন্টের পঁচিশতম রিইউনিয়ন। যখন প্রথম সেমিস্টারে পড়তাম, তখন আমাদের সিনিয়র দিদি-দাদারা আয়োজন করেছিল, তারপর করোনার পর প্রথম আমরা করেছিলাম। সেসব নিয়ে কত স্মৃতি, কত মজা, সেইসব অনুভূতি লিখে প্রকাশ করা সম্ভব না। যেহেতু আমি নাচ শিখি তাই আমার দায়িত্ব ছিল নাচের ক্যারিওগ্রাফি করে জুনিয়রদের শেখানো, তনুর দায়িত্ব ছিল সঞ্চালিকা হিসাবে এবং লেখালিখিতে, আমাদের সবার প্রিয় স্বাগত ছিল এই রি-ইউনিয়নের সেক্রেটারি, অর্ণব, বিশ্বদেব, রুবিনা, তনু, সুপ্রভাত এরা সবাই শুভজিৎ স্যারের পরিচালনায় নাটক করেছিল। পিউলি ছিল গানে ও আমার সাথে নাচে। সবাই মিলে একসাথে আলপনা দেওয়া, কেনাকাটা করা, রিহার্সাল দেওয়া; সব মিলিয়ে সে অনুভূতি এক অন্য অনুভূতি যা জীবনে ভুলে যাওয়ার না।

রি-ইউনিয়ন তো হল, কিন্তু আমাদের সবারই এক প্রবল ইচ্ছা ছিল কলেজ এক্সকারশনে যাওয়া। যেহেতু দ্বিতীয় সেমিস্টারে আমাদের এক্সকারশন যাওয়ার কথা ছিল; তারিখটা এখনো মনে আছে, ২৩-এ মার্চ। কেন জানেন? কারণ এই দিন থেকেই লকডাউন শুরু হয়। এখনও ভাবি, ভাগ্যিস যাওয়াটা আগেই ক্যানসেল করে দিলেন স্যার ম্যাডামরা নয়তো যা বিপদে যে পড়তাম সেটা ভগবানই জানে। কিন্তু এক্সকারশন যাওয়া হয়নি বলে, একটা আক্ষেপ রয়েই গিয়েছিল। কলেজ খোলার পর পম্পা ম্যাডাম এবং অদিতি ম্যাডামের কাছে আমরা আবদার করলাম, 'আমরাও এক্সকারশনে যাবো ম্যাডাম, জুনিয়রদের সাথে।' প্রথমে না বলেও বললেও আমাদের ইচ্ছাপূরণ করেছিলেন আর আমরা ম্যাডামরা। প্রথমবারে যাওয়ার কথা ছিল শিলং,যা যাওয়া হয়নি, পরের বারে ঠিক হল ইচ্ছে গাঁও কালিম্পং। আমার জীবনে এই ঘুরতে যাওয়াটা ছিল এক অন্যতম অনুভূতি। প্রথমত আমি সেই বাড়ি প্রথম পাহাড় দেখেছিলাম, এর আগে কোনদিনও দেখিনি। সাথে সাথে বন্ধু ম্যাডামদের সাথে যাওয়া, সে এক আলাদাই ব্যাপার। শিয়ালদহ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

এক্সপ্রেসে আমরা গিয়েছিলাম। সময়ের অভাবে, শেষ মুহূর্তে সেকেন্ড ক্লাসে টিকিট পেয়েছিলাম তাই গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই যাওয়াটা ফার্স্ট ক্লাসে যাওয়ার থেকেও অনেক বেশি মজাদার ছিল। গান, নাচ, গল্প করতে করতে পৌঁছলাম শিলিগুড়ি, সেখান থেকে গাড়ি করে গেলাম ইচ্ছেগাঁও। আমরা পম্পা ম্যাডাম এবং তেনজিং ম্যাডামের সঙ্গে গিয়েছিলাম। আমাদের হোম স্টেতে একটা বড় ব্যালকনি ছিল যেখান থেকেই পাহাড়ের সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করতে পারতাম। আর তার সঙ্গেই একটা লিভিং এরিয়া অ্যাটাচ ছিল যেখানে বসে আমরা গল্প করতাম, খেলতাম, নাচ গান করতাম। হারবেরিয়াম বানানোর জন্য স্পেসিমেন প্রেস করতাম সাথে সাথে ফিল্ড নোট বুকও বানিয়েছিলাম আমরা। এইভাবে এক্সকারশনের আনন্দ করতে করতে লাস্ট সেমিস্টারের এক্সাম চলে এল, ভয়ে ভয়ে উতরেও গেলাম আমরা লাস্ট সেমিস্টারের অফলাইন এক্সাম। কিন্তু স্মৃতির পাতায় এই মন ভরা আনন্দ আর অনেক অনেক ভালোবাসায় মোড়া কলেজ লাইফ আমার জীবনের এক উজ্জ্বল আভা হিসাবে রয়ে যাবে সারা জীবন। আমার কলেজ নরসিংহ দত্ত কলেজ....

আমার কলেজ

দোলন দাস

****

আমি আমার কলেজের একজন প্রাক্তনী মাত্র। কিন্তু তাও সবসময়ই কলেজের দিনগুলো মনের মধ্যে ভিড় করে। কত স্মৃতি মনের অন্দরমহলে উঁকি দেয় মাঝেমধ্যে। আমি দোলন, আমার কলেজ মানে নরসিংহ দত্ত কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্রী। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছেই তাঁর নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুব ভালোবাসার একটা জায়গা; আমার ক্ষেত্রেও তা একই। কলেজ পেরিয়েছি প্রায় পাঁচ বছর হল কিন্তু তাও এখনও মনে পড়ে যায় ক্যান্টিনের আড্ডাগুলোর কথা। West Block-এর একতলার মাঝের ক্লাসরুমটায় প্রথম ক্লাস করা থেকে শুরু করে মাঝে মধ্যে ক্লাস অফ করে বন্ধুদের সাথে কলেজ মাঠে বসে হইহই যেমন করেছি তেমনই আবার শান্ত লাইব্রেরির নিস্তব্ধতায় বই পড়েছি। স্যার ম্যামদের ভয়ও পেয়েছি একটু আবার তাদেরই সাহায্যে প্রতিটা পরীক্ষা দিয়েছি। প্রথম দিন থেকেই কলেজ ক্যাম্পাসটাকে ভালেবেসেছি। অনেকের মুখেই শুনেছি যে তারা H.S. পাশ করার পর কলকাতার নামীদামী কলেজে ভর্তি হতে চায়। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই চেয়েছি আমার N.D. কলেজকে যেখানে একটা বড়ো পুকুর আছে, একটা সুবিশাল মাঠ আছে আর আছে প্রাচীনতার গন্ধ; তার সাথেই মিশে রয়েছে কলেজের জন্য শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষদের ভালোবাসা। এখন সব থেকে বেশি মনে পড়ে ক্লাস করার জন্য দৌড়ে দৌড়ে কলেজে পৌঁছানোর কথাগুলো, আবার কখনও মনে পড়ে যায় ক্লাস করতে ইচ্ছে না গেলেও ৭৫% উপস্থিতির ভয়ে কীভাবে কলেজ গেছি। কিন্তু কলেজ ফেস্ট আর সরস্বতী পুজো কি মিস করলে চলে নাকি, ওদিনগুলোয় তো উপস্থিত থাকতেই হবে, না হলে কি চলে! সবমিলিয়ে আমার কলেজ আমার কাছে বেস্ট। জীবনের কিছু মূল্যবান সময় এখানে কাটিয়েছি বলেই হয়তো অমূল্য স্মৃতির দল মণিকোঠায় ভিড় করে রয়েছে। এখন আর খুব বেশি কলেজ যেতে পারি না, তাও যখন শতবর্ষের অনুষ্ঠানগুলোর কথা শুনি মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। মনের মধ্যে এক অদ্ভুত গর্ববোধ হয় যে ১০০ বছর বয়সি এই প্রতিষ্ঠানে আমিও কখনও সময় কাটিয়েছি। আর পাঁচটা শিক্ষার্থীর মতো আমিও মিস করি আমার কলেজকে, কলেজের বন্ধুবান্ধবকে আর আমার প্রতিষ্ঠানের পরিবেশটাকে। আরও এগিয়ে যাক আমার কলেজ ১০০ বছর পেরিয়েও নতুন যৌবনের অধিকারী হোক সে, যাতে আজীবন গর্ব করে বলতে পারি হাওড়ার সব থেকে সুন্দর N.D. কলেজের ছাত্রী আমি।

Recollecting in Tranquility: An Address

Shruti Lahiri.

****

My dear youths,

Can you recognize me? I am your college, Narasinha Dutt College, now a hoary entity, having an existence of hundred years. From the relics of immemorial past I hail you. O my budding youths, who return to me again and again to fill my lap with delight, with joy, with bliss as the waves of the ocean do return with double vigor to splash on the shores. Decrepit and tottering under the burden of ripe age, I still stand upright with my tall buildings, surrounded by lush greenery and a pond brimming to the full at the centre of my campus. Can you guess why I do remain so agile? This is only because, I get your enlivening touch every day, every hour, every moment. So, I live on and on and on through days, through months, through years. The leaves of my trees dry up in summer, my pond looks pale in the scorching heat, but my withering trees regain their green pigment again in monsoon, the cormorant and the kingfisher have their day in my overflowing pond and the flower-beds again blush with the full bloom of blossoms. My appearance changes again in winter. Full-bloomed buds deck me up with their colours, with hues of many shades. But the cold gusts of air that blows across the pond chills all to the very core.

O you young souls, amid this paradise, your cries, your laughter, your calls, your gossips, your friendly chats rejuvenate me, keep me fresh and gay. Because of your touch, age can neither crumble nor diminish my grandeur.

Much have I deliberated on the present hour. Now, can you afford a little time to hear the story of my past, my heritage, my glorious lineage? Howrah is my birthplace. Do you want to know how Howrah was in the distant past? It was most unlike the place we see today: full of clamor of iron and steel, congested, bursting with its population. My motherland was then just a settlement of five villages: Salica (Salkia), Harirah (Howrah), Cassundeah (Kasundia), Ramkrishnapoor (Ramkrishnapur) and Battar (Bator). In 1819, the Howrah district was tagged to the Hooghly district, only to become a separate entity in 1843. That was much before I came to exist. It was in 1924 that the late I.R. Bellilious with his wife Rebecca Bellilious founded me with just seven teachers and one twenty-four students at his residential building. Since then, I am living on, proliferating from time to time in size, structure and activities. My centre of attraction, as I have told you, is a lovely large deep pond, surrounded by huge buildings. I most enjoy when the cormorants in the sunny noon dip their head into the cold water only to rise up after a few seconds.

I feel delighted to see the kingfisher, sitting cautiously on the twigs of a tree, keeping a careful watch on its prey and swooping down like a lightening to catch the fish it has targeted. The cool breeze blows through the shimmering leaves of the huge trees, through the lush greenery to make ever-widening ripples in the pond. Fish abounds in my pond. Besides the pond, lies a patch of green lawn.

Some days ago, a boy drowned in the pond.

Helpless cries throttled my voice. I could not save him. I was benumbed seeing his cold lifeless body.

O youths, your mirthful presence entertains me all day, but when I see you anxious, when I see you agitated, when I see you aggressive, I can longer remain tranquil. Fright grips me. I share my happiness with you, as equally do I share my anxiety with you. As the blue sky overhead, the green trees, the flowerbeds, the black pond are my existence, so are you. So, I hail you again and again, summon you to come to me in hundreds, in thousands. You delight me with your youth, with your presence, with your loving touch. I will impart you education, I will enlighten you, I will guide you to bright future prospects.

Ever yours,
Narasinha Dutt College.

My Journey at Narasinha Dutt College

Suman Kumar Maity

****

Our Narasinha Dutt College has proudly crossed a century and we are celebrating the legacy of the college through different Centenary programs. Narasinha Dutt College is one of the oldest and highly renowned educational institution in Howrah District which is established at the residence of Issac Rafael Belilious on 1924. It was founded by Sri Suranjan Dutt, the son of Narasinha Dutt who was a renowned Notary of his time. The college was affiliated to the University of Calcutta by the then Registrar Sir Ashutosh Mukherjee. This historical institution has played a major role to shape the socio-economic structure of the surrounding areas.

Before joining, I had very little idea about this college; that may be owing to my ignorance. Only information about the college I had that is related to waterlogging in the college premises. After the completion of long procedure and formalities, finally I joined the Department of Chemistry on July 2017. Meanwhile, I have received the prestigious Alexander von Humboldt Fellowship to pursue postdoctoral research at Germany. Therefore, after joining the college, I tried to avail extraordinary leave so that I could travel to Germany and pursue the research while keeping my job here. In the meantime, one day Principal Madam asked me to talk to the Convenor of Admission Committee and I have been included in the committee. At that time, on 2018, online admission was rare in UG colleges, however, we were running the process successfully for past few years. The admission procedure in UG colleges in our state was going through a difficult phase. Lots of allegations were reported, even suicide case of a student was surfaced as a victim of that situation. However, we were able to conduct the online admission peacefully and successfully at that tough period which was also highlighted in electronic media.

One of the most important events in the history of UG studies in West Bengal happened in the year of 2018, that is the introduction of semester system in the form of "Choice Based Credit System (CBCS)" following the UGC guidelines. It appeared that the number of classes increased and it was difficult to adjust the three sections (morning, day evening). However, the college has overcome all the shortcomings and set forward to cope up with the new system. An eventful year was passed away in no time. Meanwhile, I have applied for extraordinary leave which was granted by the College, thanks to Principal Madam for her kind support without which it was impossible. The matter was then placed to the higher education department, and after a lot of effort, finally the leave was sanctioned. After successful completion of the research abroad, I returned to the college on October 2019. Things were going normally and quietly after that. The situation changed rapidly in 2020, cases of Covid-19 were reported worldwide. Death toll in China, Europe, America and other countries had shaken the world. At the beginning of 2020 we were not aware that Covid-19 is going to strike India so badly, thus we were not prepared at all. Naturally, cases started to increase in India resulting the initial closure of educational institutions including our college. On March, 2020,

nationwide lockdown was declared. All of us were home bound and campus activities were totally on halt. Initially it was a challenge to continue teaching learning process in the new ordeal situation. Narasinha Dutt College started its own YouTube channel to disseminate knowledge through video lectures by teachers. Our college was one of the few pioneers among the UG colleges of West Bengal to start virtual teaching learning process at the early stage of lockdown. Later, online classes through Google meet were started in our college. The whole online teaching process was completely a new experience to us. Students remained silent during the class all the time, some of them were even not in front of the screen, doing something else. Teachers could not get any response after repeated enquiry. Anyway, online classes and examinations were going through like this way, students were getting huge marks without even preparing for the examination. The system created a severe damage to the students as they have lost the habit of studying and preparing for examination. Albeit, the year 2020 was a very depressing and painful to all, it brought some good news also. Three of our students qualified JAM exam and placed to IIT-Bombay for master degree. One of them secured all India rank 1 in JAM exam, which was a very proud moment for Department of Chemistry as well as Narasinha Dutt College. Cases of Covid-19 gradually decreased and the situation gets normal at the end of the year 2021. Educational institutes started their regular on campus functioning. The University decided to conduct examination through offline mode and the decision led to a massive agitation and protest from students. They wanted online examination; however, their demand was not fulfilled. Offline examination held and a lot of students failed to clear all the papers in a semester. Pandemic left its mark on the education system and on the career of the students.

Meanwhile, the third cycle of NAAC was approaching which was delayed owing to the pandemic. Our college has already started preparation for NAAC visit, and as a member of IQAC I am involved in different NAAC related activities. Thus, a very important time frame for Narasinha Dutt College is passing by and we all are contributing up to our capacity to make this period memorable and historical. In the meantime, UGC has declared new education policy 2020, in short NEP 2020, and suggested the educational institutions to follow the NEP. In 2023, the Govt. of West Bengal has decided to follow NEP after a lot of ifs and buts, and implemented to the Universities and undergraduate colleges. Academic framework has been changed as the time span for honors courses becomes four years. Surprisingly, all over West Bengal, the admission of students to B.A /B.Sc. honors courses has decreased significantly. The reasons for this decrease are manifold. The lack of job opportunities and the increased time frame to complete the honors courses compare to the previous system are the leading causes. The misconception among the students regarding research in honors courses is also a major factor.

On 1st July 2023, the centenary celebration was started by a stunning colorful rally, which was featured in prime newspapers. The very eventful and august inaugural program was held on 25th August 2023. The centenary celebration will continue throughout the year by different beautiful and creative events. I wish all the success to the centenary celebrations and all the prosperity of the college in future. I strongly believe that the college will shape many more intelligent minds and will give them wings to fly high in their future endeavors.

Back ground in brief of Late Principal Motilal Chatterjee

Deb Sundar Chatterjee

****

With the growth of education in the country the people of Howrah city started feeling of having a college in the Howrah city around the time 1920 and onwards. Thus the people of Howrah was in dire need of a college in the city reached to the ear of the then an wealthy man of the city Mr I.R. Belilious who came forward and agreed to provide funds not only for foundation but also for it's maintenance even the Principal for the proposed college was selected by him only. He also agreed to donate his own residential building for the purpose of college. He directly approached to Late Motilal Chatterjee who was Principal of the Allahabad K.P. College and Visiting Professor of English of Allahabad University. Principal Chatterjee with the momentary decision gave up his post to accept the offer of joining the new college of his own home land. It may be re called that he was succeeded by the Late Ramananda Chatterjee, the renowned journalist.

This may be recalled that Principal Motilal Chatterjee was the teacher of Sir Asutosh Mukherjee and competitor of Late Haraprasad Sastri in the University of Calcutta. It may not be the out of place to mention that Principal Chatterjee carried a brilliant academic carrier in the University and through-out his carrier he always secured the highest position. He attracted the attention of Pandit Iswar Chandra Vidyasagar who picked up him up as the Professor of English in Vidyasagar College erstwhile Metropolitan College.

MY FEELINGS ABOUT MY COLLEGE

Saradindu Chattaraj

****

Introduction : On saturday, the 8th of July, 2023 an article in the "Kolkata Karcha" of the Anandabazar Patrika States that Narasinha Dutta College, the oldest college in the Howrah district has started to celebrate hundredth year of its, foundation with the Pravat Ferry organised by the students old and present. After reading the article I felt pride in being myself once a student of this college.

I was admitted into this college in 1963. I was the student of the 2nd batch of English (Hons.). The college started imparting English Hons. course under Calcutta University from the year 1962. So, those who started pursuing English Hons. in 1962 were the first batch of students. They sat for the part one examination in 1964. Of the eight or ten students only my senior Shyamal Paladhi obtained the qualifying marks to sit for the part II examination in 1965. He sat for the first two papers of five and unfortunately did not complete other three papers. So he appeared for the part two examination as a continuing candidate in 1966, the year when I went in for my part II examination after I had obtained more than the qualifying marks in the part I. We both passed in second class with Hons. in English. So we live eligible to pursue M.A. in the Calcutta University in the 1966-1968 session.

In the article I have leart that the college was established by Mr. Suranjan Dutta, son of Mr. Narasinha Dutta in a gorgeous mansion standing on a sprawling and vast land left by one broad-hearted Jewish business man sir Isaac Raphael Belilious with the help of his generous wife Mrs. Rebeka. Mr. Suranjan Dutta a man of erudition and be-nevolence did not lose any moment to set up a college in Howrah after his noble father's name in 1924. Calcutta University (Now Kolkata) offered its affiliation and recognition.

In 1962 the college started English Hons. Course and all Hons. courses in Economics, Political Sciene, History, Philosophy, Sanskrit. Students had to sit for their first three papers in 1964 for their part one Examination. In the part two (II) examination they had to sit for their five Hons. Papers. But when we the 2nd batch of students sat for our part I we had to folow the revised regulation time—four papers in the part one and other four papers in the part two II, time-four hours for each paper system. Both my senior Shyamal Paladhai and I were successful in obtaining Hons. marks in English for the first time in the history of Narasinha Dutt College—Paladhi as continuing candidate and I as regular one. We were allowed to be admitted to the M.A. (Eng.) degree by the Caslcutta University in the 1966-1968 session. After doing our M.A. we both became at first teachers (assistant), later were appointed H.M. Senior Paladhi became HM in Santragachi H.S. School and I as HM in Bantul Mahakali High School (H.S.) in Bagnan, Howrah.

Now, I desire to write about the ambience, surrounding and atmosphere that prevailed in the then college. My feelings were that we learnt under the wise and erudite professors

of all the departments. So I am writing about those revered professors who taught us English, Philosophy, Political Science, Economics, History, Sanskrit, Bengali, Physics, Chemistry, Mathematics, Biology (Hons. and Pass.). We the students could not help offering our reverence, esteem, good behaviour, obedience and gentleness to them. Before them we could not but bow down heads for their vast knowledge on their subjects and their dignified demeanour and their wonderful technique of teaching. They could make complex lessons turusimple so that we could learn at ease.

Now, about our English Department. Prof. S.B. Prof. C.M. Sarkar, Prof. P.N. Sinha, Prof. P.R.M., Prof. M.P. and Prof. A. Das. We were a bit shy before Prof. S.B. (Satinath Bhattacharyya) for his dignified appearance, Julius Caesar like demearour and personality. When he taught Julius Caesar, We remained spell bound. Prof. Charu Mohan Sarkar taught us in a very simple way so that we could learn easily. His simple language made us understand the lesson at ease. Prof. Paresh Nath Sinha was a master of most of the papers save Philology. His use of synonymous words made us wonders, His had writing as well as his style or putting clothes was a matter to be copied or emulated. Our senior Shyamal Paladhi tried to emulate his writing or hand writing. Prof. P.R.M. (Priya Rajan Mitra) asked us what to be taught in the period when he came. When we asked him to teach us a particular chapter, he told us, he was not prepared and he would teach us the next day; and he did so wonderfully; he was a man of forgetfulness. His teaching was really thought provoking. Prof. Ajit Das, an advocate of Howrah Court taught us in a jovial way. He said after; when you feel depressed, put on your best dress or attire. Most sundays I used to go to his chamber to have lesson from him, As soon as he saw me coming he asked his clients to leave the room to teach me. He was very much ????? other professors failed to defeat him as his arguments on any subject were really hard to come ones. Prof. M.P. gave us notes on Philology, very hard to memorise, Prof. Sen, a young one, one of the best students of Howrah and a precidention who was recruited a few months back was very close to me. He helped by offering some text books of M.A. Later on. I came to know, he died a premature death very sad for the college.

A few words for other professors in other subjects. Some Professors of Bengali implanted their impression on us. Two or three professors of Political Science were familiar to us. Their teaching made us thingk. We must say about Prof. Bharati who taught philosophy. His oratory and gentle behaviour moved us greatly.

Now, I have something more to say about one of the members of the Duttas. After the part one I was the only student of English Hons. All Englisht Professors taking up the Attendance Register came into the room to teach me. I was all alone. But my name was not in the A.R. For want of money I could not let my name registered. But the Professors did not say anything to me. I told my father about my condition.

He took me to one of the members of the Duttas, known to him. He at once advised the office of the college to register my name so that I could sit for the part II examination. Had he not done so I could not appear for the examination though I was the only student of Eng. Hons. from the College. I tried to keep the prestige of the members as well as the College as a whole.

Now, about all the staff members,—office bearers, clearks, subordinate workers were greatly helpful to us. Whenever we needed their help, they tried their best to satisfy us. Their behaviour was plwasant, and they loved us greatly.

I must say something about the students who were senior, junior and clasmates both boys and girs. We passed our leisure hours talking about our problems, about professors. Our seniors were helpful and advised us when we needed their help. In the shpere of games and cultural activities we were not lagging behind But during the rains we passed dully and morosely because water everywhere, no where to go for entertainment.

My great desire : I wish I were a student of this college and take part in the year long celebration. But I am a bit in disposed. I hope, if the generous organisers publish this article after necessary correction or omission and commission in the magagine that will be brought out, I will be extremely happy and feel complacent.

What an amazing matter it is, whenever I think professors were taking my classes in the room, where only one student was a taught. The room was hall like and only a student learning. I also feel delighted whenever the memory of classmates—Suprakas Ghatak, Ashim Adak, Abdul Zabber come into my mind. Their association really was pleasant and is present in my mind slip. But our life is not stagnant; it is ever moving and following.

I was not a brilliant student but the help that the professors offered made me capable or undertaking different and acduous tasks in our life.

College Days : A Journey Through the Golden Years of Guidance and Joy

Peu Mondal

****

In the tapestry of life, certain threads stand out with vibrant colours and intricate patterns, forever etched in the fabric of our memories. One such vibrant thread in my life's tapestry is the chapter of my college days—a time brimming with exuberance, guidance, and the joys of camaraderie.

My college days were a golden era, a time when I experienced the perfect amalgamation of education and personal growth. The academic corridors echoed with the footsteps of eager learners, like me, ready to absorb the wisdom imparted by the professors who stood as beacons of knowledge and guidance. Their influence was profound, shaping not only our academic understanding but also our outlook towards life.

I vividly recall the moments when our professors mentored us, nurturing our inquisitive minds and encouraging us to delve deeper into our chosen fields of study. Their dedication was unmatched, and they went above and beyond to ensure we grasped the intricacies of our subjects. The encouragement they provided kindled a flame within us, inspiring us to reach for the stars academically.

Equally significant was the bond of friendship that flourished during those college days. The laughter, the late-night study sessions, and the occasional struggles with exams formed an unbreakable bond amongst us. These were not mere acquaintances but friends who stood by in both good and bad times. The sense of unity and shared experiences heightened the joys and diminished the sorrows, making the journey through college an unforgettable one.

The freedom that came with college life allowed us to explore not only the academic realm but also our own identities. We were encouraged to voice our opinions, engage in debates, and challenge existing paradigms. This environment fostered critical thinking and taught us to be more open-minded, accepting, and tolerant.

However, amid the euphoria of newfound independence and academic challenges, there were moments of longing for the past—the simpler times when responsibilities were lighter, and life was less complicated. As time progressed, the weight of adulthood and the realities of life began to settle in, making me yearn for the golden days of college, where the biggest concern was acing exams or meeting project deadlines.

Now, as I look back, the nostalgia envelops me like a warm embrace. The laughter in the hallways, the insightful lectures, the friendships, and even the academic stress—all these aspects shaped me into who I am today. It's a realization that the college days weren't just about acquiring knowledge; they were about moulding character, building relationships, and learning life skills.

The echoes of those golden days reverberate in my heart, serving as a reminder

of the incredible journey I had during my college years. The professors and friends who walked with me, hand in hand, through this journey, have left an indelible mark on my soul. Their influence is a guiding light, steering me through the labyrinth of life.

My college days were a kaleidoscope of emotions, experiences, and growth—a chapter I treasure and revisit often in the story of my life. The memories of those golden years continue to inspire me, reminding me of the potential that lies within, instilled in me by the profound education and nurturing environment of my college.

সুরের কূলের নাইয়া : নির্মলেন্দু চৌধুরী

সিদ্ধার্থ সেন

****

এখন প্রায় যে-কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই লোকগানের একটি পর্ব থাকে। আর সেই পর্বে অনেক ক্ষেত্রেই লোকগানের নামে যে ধরনের সংগীত পরিবেশিত হয় তার বেশির ভাগই চারিত্র্যধর্মে কতখানি লোকগান আর কতখানি নানা যন্ত্রানুষঙ্গে কানফাটানো চিৎকার এ নিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধন্দ জাগে! কিন্তু তা শুনেই প্রেক্ষাগৃহ বা খোলা মঞ্চের চারপাশে হাততালির ঝড় বয়ে যায়! কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। আসল কথা, লোকগান গাইলেই কেউ লোকশিল্পী হয়ে যান না, যাঁরা লোককবি, লোকগান যাঁরা বাঁধেন তাঁরা অনেক বড়ো দার্শনিক, গ্রামীণ মানুষ-অক্ষর পরিচয় না থাকলেও অনন্য কথায় ও সুরে শরীর নির্মাণ করতে পারেন লোকগানের যার মধ্যে উঠে আসে প্রকৃতি, প্রেমজাত সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-বিরহ সহ নানা ব্যক্তিগত অনুভূতি আবার কর্মমুখর শ্রমের ক্লান্তি দূর করার জন্য সুরের জালে শব্দকে আষ্টেপৃষ্টে জড়ানোর মায়ার খেলায় মেতে ওঠা। লোকসংগীতের অঞ্চলভেদে একটা নিজস্বতা আছে। সেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা সংগীতকে বর্ণময়তায় রঙিনও করে তোলে মানুষের ভাব-ভাষা-ধর্ম-লোকাচার-রসিকতার সংযুক্তিতে। বাংলা লোকগানে অনেক প্রবাদপ্রতিম শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের একজনের কথা সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচিত হবে এই নিবন্ধে, তিনি নির্মলেন্দু চৌধুরী খুব নিশ্চুপেই যিনি পেরিয়ে গেছেন জন্মশতবর্ষ সংকটপূর্ণ কোভিডের সময়পর্বে। তাঁকে 'লোকগীতি সম্রাট' অভিধায় আজও সম্বোধন করা হয় তাঁর মৃত্যুর চারটি দশক পেরিয়ে গেলেও। তিনি জন্মেছিলেন সিলেটে যে অঞ্চলের লোকগানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন রাধারমণ দত্ত, হাছন রাজা, দূরবীন শাহ, শীতালং শাহ, শাহ আবদুল করিম, হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখ। পরবর্তীকালে সেই অঞ্চলের পরম্পরাকে বহন করে লোকগানের জনপ্রিয়তা বজায় রেখেছেন অকালপ্রয়াত শিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও তাঁর লোকগানের দল 'দোহার'।

নির্মলেন্দু চৌধুরী জন্মেছিলেন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার সুখাইর গ্রামে মাতুলালয়ে। বড়ো হয়েছেন বাপ-পিতামহের গ্রাম জামালগঞ্জ উপজেলার বেহেলী গ্রামে। তাঁর পিতা নলিনীনাথ চৌধুরী ও মাতা স্নেহলতা চৌধুরী। মা স্নেহলতা সংগীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং প্রথম থেকেই পুত্র নির্মলেন্দুকে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁকে সংগীতের তালিম দেন। এ বিষয়ে বাবা নলিনীনাথেরও প্রবল উৎসাহ ছিল। সংগীতের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য পাশাপাশি বাড়িতে একজন সংগীতশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নির্মলেন্দু রেওয়াজ করতে শুরু করেন। বেহেলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি সিলেটে চলে আসেন এবং রসময় মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এম.সি. কলেজে ভর্তি হন এবং এই সময়ই বামপন্থী কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে প্রতিবাদী গান কণ্ঠে নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন, রাজনৈতিক কারণে একাধিকবার কারান্তরালে বন্দি হন। সুরের পাখি তো তাঁর উদাত্ত মধুর কণ্ঠে খেলে বেড়াত তার ডানা মেলার ইচ্ছে জাগল একটি বিশেষ দিনের ঘটনায়। সেদিন দলের কাজে খাসিয়া পাহাড়ের কোলের একটি গ্রাম পার হওয়ার সময় নির্মলেন্দু দেখলেন যে একদল নারী সন্তান কামনায় সারাদিন হাতের তালুতে জ্বলন্ত প্রদীপ রাখার পর সেইগুলি বেলাশেষে সন্ধ্যার সমাগমে নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে আর আশ্চর্য মধুর সমবেত কণ্ঠে গাইছে এক বন্দনাগান! সেই সুর তাঁকে ঠেলে দিল বাংলা লোকগানের অন্দরমহলে—ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, চটকা, জারি, সারি, ধামাইল, ভাদু, ঝুমুর, প্রভাতী ইত্যাদি নানা গানের

পাশাপাশি কীর্তন ও বাউল গানেও। তার আগেই তিনি যুক্ত হয়েছিলেন গণসংগীতের প্রবাহে। সংগীতও যে রাজনীতির দোসর হয়ে উঠতে পারে তা দেখিয়েছেন বামপন্থী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক জগতের কুশীলবরা—কাজি নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, সত্যেন সেন, রমেশ শীল, খালেদ চৌধুরী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পরেশ ধর, আবদুল জব্বার, আবদুল গফফর দত্ত চৌধুরী, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, অজিত পাণ্ডে, শুভেন্দু মাইতি, কল্যাণ সেন বরাট প্রমুখ। সিলেট তথা পূর্ব বাংলার গণজাগরণেও সংগীতকে বিশেষ আবেদনে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। তিনি ছিলেন গীতিকার, সুরকার। আর তাঁর কথা ও সুরের সার্থক রূপায়ণ ঘটত নির্মলেন্দু চৌধুরীর উদাত্ত মধুর কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য বিস্তারে। মাঠে-ময়দানে-জনসভায় তাঁর গানের টানে উপস্থিত হত হাজার হাজার মানুষ। সিলেটে সুরসাধক প্রাণেশ চন্দ্র দাস এবং পরবর্তীকালে তাঁর পরিবার সিলেট থেকে ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হলে সেই সময়ের দুই প্রখ্যাত লোকগানের প্রশিক্ষক আবদুর রহিম ও আবদুল মজিদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন নির্মলেন্দু। এছাড়া শান্তিনিকেতনে কবি অশোকবিজয় রাহার কাছে রবীন্দ্রসংগীত শেখেন এবং পরবর্তীকালে কলকাতায় আসার পর তিনি শ্রীসুরেশ চক্রবর্তীর কাছে তালিম গ্রহণ করেন। সিলেটের গণনাট্য সংঘের শিল্পী হিসেবে মধ্যমণি হয়ে ওঠা নির্মলেন্দু চৌধুরী সম্পর্কে বিপ্লবী হেনা দাস তাঁর 'চার পুরুষের কাহিনী' নামের আত্মজীবনীর এক জায়গায় লিখেছেন : '...সিলেটের গণনাট্য আন্দোলনে আমরা একজন প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পীকে পেয়েছিলাম। সে হলো উপমহাদেশখ্যাত পল্লীসংগীতশিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী। হেমাঙ্গদার নেতৃত্বে গঠিত সুরমা উপত্যকা কালচ্যারাল স্কোয়াডের কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যমণি ছিল নির্মল।... একক গান পরিবেশনে তার জুড়ি ছিল না। মাঠে-ময়দানে হাজার হাজার শ্রোতাকে নির্মল মাতিয়ে তুলত তার উদাত্ত কণ্ঠের সুর ও ঝঙ্কারে, তাদের অন্তরের গভীরে পৌঁছে দিত প্রতিটি গানের মর্মবাণীকে।'

প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা রোহিণী দাসের সঙ্গে নির্মলেন্দুর পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। স্থানীয় কৃষকদের সংগঠিত করতে রোহিণীবাবুকে সহায়তার সূত্রে তিনি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। বেহেলী গ্রামে নিজেদের জমিদারি থাকলেও অন্যান্য অনেক ভূস্বামীদের মতো তাঁর পরিবার ব্রিটিশ সরকারকে সহায়তা করেননি পরিবর্তে শাসকবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মানুষজনকে সাহায্য করেছেন। বেহেলী ছিল হাওড়বেষ্টিত গ্রাম। সেই কারণে ছিল বিপ্লবীদের জন্য নিরাপদ গোপন স্থান। ওই প্রাকৃতিক পটভূমি হয়তো তাঁর রক্তে বুনে দিয়েছিল ভাটিয়ালির সুর। সেই গ্রামটিও ছিল সংগীতপ্রিয় মানুষদের বাসস্থান এবং নির্মলেন্দুদের বাড়িটি ছিল লোকসংগীত ও গণসংগীতের প্রাণকেন্দ্র। তাঁদের পরিবারে প্রায় প্রত্যেক সদস্যই সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। আর তাঁর মা ছিলেন অসাধারণ গায়িকা। একসময় রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় নির্মলেন্দু সিলেট হয়ে কলকাতায় আসেন এবং কঠিন জীবনসংগ্রামের মুখোমুখি হন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শহরে অনুষ্ঠিত বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে তিনি 'শ্রীহট্টের লোকসংগীত' শিরোনামে লোকসংগীতের নানা ধারার গান পরিবেশন করেন। যেমন, 'প্রেম জানে না রসিক কালাচান' (ভাওয়াইয়া), 'সুহাগ চাঁদ বদনি ধনী' (বৌনাচের গান), 'লোকে বলে বলে রে' (হাছন রাজার গান), 'আমি কি হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া' (ধামাইল) ইত্যাদি যেগুলি পরবর্তীকালে তাঁর রেকর্ডের গান হিসেবেও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। সেই বছরই শান্তিনিকেতনে সংগীত পরিবেশনের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানেও একাধিক অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের মনমাতানো সংগীত পরিবেশন করে তিনি সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক-ছড়াকার অমিতাভ চৌধুরীর 'নির্মল হৃদয়' নামের স্মৃতিচারণমূলক রচনায় এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

এই লোকপ্রিয়তার ফল জুটল শিল্পী নির্মলেন্দুর জীবনে। মন্ত্রী (ভারত সরকার) শ্রীঅনিলকুমার চন্দের সহায়তায় নির্মলেন্দু তাঁর ছোটোভাই শিবু চৌধুরীকে দোহার হিসেবে সঙ্গে নিয়ে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে পূর্ব ইওরোপ সফরে যান। সেই সফরে ওই দলে ছিলেন অনেক বিখ্যাত শিল্পী। যেমন,

বিলায়েত খাঁ (সেতার), সিতারা দেবী (কত্থক), বাহাদুর খান (সরোদ), শান্তাপ্রসাদ (তবলা), দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় (কণ্ঠশিল্পী) প্রমুখ। বিদেশযাত্রার আগে দিল্লিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নির্মলেন্দু এমন মানের সংগীত পরিবেশন করলেন যা তাঁকে পৌঁছে দিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহেরুর কাছে। তারপর যত বিদেশি অতিথি এদেশে এসেছেন তাঁদের সম্মানার্থে আয়োজিত সভায় তাঁর আসনটি ছিল বাঁধা। পরবর্তীকালে তিনি একাধিকবার বিদেশ সফরে গিয়েছেন। ওই ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দেই তিনি পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ শহরে আয়োজিত বিশ্ব যুব উৎসবের অঙ্গ হিসেবে আন্তর্জাতিক লোকসংগীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অর্জন করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাঁর এই সাফল্য তাঁকে আন্তর্জাতিক পরিচিতি এনে দেয়। আমেরিকা, জার্মানি, সোভিয়েত রাশিয়া, হাঙ্গেরি, হল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, কানাডা, চিন প্রভৃতি দেশে গান শোনানোর আমন্ত্রণ পেয়েছেন তিনি।

নির্মলেন্দু চৌধুরী ছিলেন ডাকাবুকো, বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এক মানুষ। ছোটোবেলায় খুব ভালো ফুটবল ও ভলিবল খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি হয়ে উঠলেন এক অনন্য লোকসংগীত গায়ক। জীবনে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ভালোবাসতেন। বিদেশ সফরে সিতারা দেবীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে জয়ী হয়েছিলেন, অসুস্থ মায়ের জন্য সুনামগঞ্জ থেকে খরস্রোতা নদী সাঁতার পার হয়ে ইনজেকশন নিয়ে এসেছিলেন। আবার এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়কে সম্বল করেই ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে রানাঘাটে গান গাইতে যাবার সময় পথদুর্ঘটনায় সাংঘাতিক জখম হয়েও বেঁচে উঠেছেন এবং স্ট্রেচারে করে হাতে-পায়ে প্লাস্টার করা অবস্থায় ইডেন গার্ডেনে যুব উৎসবের মঞ্চে উঠে সুরের তুফানে শ্রোতাদের মন ভরিয়ে দেন। বিখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরীর সুরেও গান গেয়েছেন নির্মলেন্দু, গেয়েছেন শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরেও। সলিল চৌধুরীর সঙ্গে মুম্বাইতেও কাজ করেছেন। সলিল চৌধুরীর সুরে 'হায় হায় কি হেরিলাম', 'সুনয়নী সুনয়নী আর এ পথে যাইও না' (সবিতা চৌধুরীর সঙ্গে দ্বৈত) লোকসুরে অনবদ্য কম্পোজিশন! গায়কির ক্ষেত্রে তিনি লোকসংগীতে একটি নিজস্ব গায়নরীতি আরোপে সফল হয়েছিলেন, তাঁর শারীরিক অস্তিত্ব পৃথিবীতে না থাকলেও আজও তিনি গানের মধ্যে নাটকীয়তার নির্মাণে তিনি শ্রোতার হৃদয়ে এক অদ্ভুত ভালো লাগা সৃষ্টি করতে পারেন, আবেগ আর অনুভূতির সমন্বয়ে তৈরি করতে পারেন অপূর্ব এক আস্বাদন! অনেক গানের ক্ষেত্রেই তিনি সংযোজন করেছেন ভিন্নধর্মী সুরের মিশ্রণ তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকসংগীতের চারিত্র্যধর্মকে বজায় না রাখতে পারলেও জনসমাদর লাভ করেছে। জীবদ্দশায় প্রায় শতাধিক গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। সুরকারের ভূমিকাও পালন করেছেন তিনি। তাঁর দুটি সুরারোপিত বিখ্যাত লং প্লেইং রেকর্ড 'মলুয়া' ও 'চাঁদ সদাগর' গীতিনাট্য। একাধিক চলচ্চিত্রে গান গেয়েছেন। সেগুলির মধ্যে শ্রোতাদের মনে পড়তে পারে—'জনমদুখি কপালপোড়া গুরু আমি একজনা' (বনশ্রী সেনগুপ্ত-এর সঙ্গে দ্বৈত/'নিমন্ত্রণ'), 'চ্যাং ধরে ব্যাঙ' (গীতা চৌধুরীর সঙ্গে দ্বৈত/'নিমন্ত্রণ'), 'গঙ্গা গঙ্গার তরঙ্গে প্রাণপদ্ম ভাসাইলাম রে' (সমবেত/মান্না দে, ও অন্যান্য সহশিল্পীদের সঙ্গে/'গঙ্গা')। শুধু নেপথ্যসংগীতই নয়, চলচ্চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে তিনি অভিনয়ও করেছেন। উৎপল দত্তের সহশিল্পী হিসেবে তিনি এলটিজি প্রযোজিত 'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ', 'তিতাস একটি নদীর নাম' নাটকে অভিনয় যেমন করেছেন তেমনি অভিনয় করেছেন রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা', ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাঞ্চনমালা', হেমচন্দর 'নতুন ফসল' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে।

গায়ক হিসেবে তাঁর অনন্য প্রতিভার কথা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের স্মৃতিকথা 'উজান গাঙ বাইয়া' গ্রন্থে বিধৃত আছে। তাঁর সুরারোপিত একাধিক গান নির্মলেন্দু চৌধুরীর গলায় অতীব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য লোকসংগীতের সুরে বাঁধা বেশ কিছু গণসংগীত। যেমন, 'ও চাষী ভাই—/তোর সোনার ধানে বর্গী নামে দেখরে চাহিয়া', 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান্', 'দিব না দিব না, দস্যুকে পথ ছেড়ে দিব না', 'এগো বাটার উপর পইলো ঠাটা/গাল ভরি পান খাইতা নি' প্রভৃতি। প্রায় সারাজীবন তিনি শোষিত, নিপীড়িত মানুষের বঞ্চনা, প্রেম-বিরহ-আনন্দকে সুরের কাঠামোয় বেঁধে চমৎকার দক্ষতায় মানুষের কাছেই নিবেদন করেছেন। ১৯৬৯

সালে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল তাঁর তিরোধানের দিনটি পর্যন্ত সেই পদে তিনি আসীন ছিলেন। লোকসংগীত চর্চার কেন্দ্র 'লোকসরস্বতী' প্রতিষ্ঠা করে বাংলার লোকসংগীতের অসামান্য সংগ্রহগুলিকে সংরক্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য পুত্র উৎপলেন্দু চৌধুরী সেই দায়িত্বভার নির্বাহ করেছিলেন।

অসংখ্য জনপ্রিয় লোকসংগীত তিনি শ্রোতাকে উপহার দিয়েছেন। সেগুলির কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে—'সাগরকুলের নাইয়া রে', 'আহা, ভালা কইরা বাজান গো দোতারা', 'ও পঙ্খি, উইড়া যাও রে', 'সরল মনে এত দুখ দিলে', 'আমি বন্ধু প্রেমাগুণে পোড়া', 'কানাই কী অভাবে কার ভাবে ভাই', 'বৌয়ার ঝাল ঝাইলো না', 'মুসলমানে বলে গো আল্লা' ইত্যাদি। এক উদাত্ত অতি মধুর কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ, শব্দকে সুরের আবহে যথার্থ প্রক্ষেপণ, অনন্য গায়নশৈলী, বিভিন্ন গানের মধ্যে যথাযথ ভাব প্রতিষ্ঠা, কণ্ঠস্বরের অপূর্ব নিয়ন্ত্রণ—সব মিলিয়ে তাঁর গানে এক অতুলনীয় চিরকালীন আবেদন শ্রোতার কানে ও মনে প্রতিষ্ঠা করে দেয়! তাঁর গান সম্পর্কে আর এক দিকপাল লোকসংগীত গায়ক হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন : 'সুনামগঞ্জের হাওর, বিলের ঢেউয়ের বিস্তার ছিল নির্মলের গলায়, সেদিনকার সংগ্রামের দিনে, আমাদের কাছে সংগীত হয়ে উঠেছিল সংগ্রাম আর সংগ্রাম হয়ে উঠেছিল সংগীত।'

২০২০-এর কোভিড মহামারির সময়পর্বে প্রায় নীরবে পেরিয়ে গেছে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী। তাঁর জীবন ঘিরে জড়িয়ে আছে অসংখ্য কিংবদন্তি! কয়েকমাস আগে কলকাতায় 'লোকসরস্বতী' আয়োজিত তাঁর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তাঁর দুয়েকটি শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই লেখার পরিসরের কথা ভেবে সেইসব কথার কিছু শোনানোর ইচ্ছে থাকলেও সেই লোভ সংবরণ করতে বাধ্য হলাম। সম্পন্ন পরিবারের সন্তান, জমিদারের পারিবারিক আভিজাত্য তাঁকে কোনোদিন ছুঁতে পারেনি, মাটির গান গাইতে গিয়ে তিনি পৌঁছতে পেরেছিলেন মানুষের কাছাকাছি, লোকসংগীতকে পৌঁছে দিয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে। তিনি সুরের কূলের নাইয়া যিনি সুরের নৌকাটি নিয়ে ভাসমান অতীত থেকে ভবিষ্যৎ এক নিরন্তর প্রবাহে, যা হয়তো বহমান থাকবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। লোকসংগীত নিয়ে তাঁর একটি বইও রচিত হয়েছিল 'এপার বাংলা ওপার বাংলার গান' নামে। সেই বইয়ে দুই বাংলার লোকসংগীতের বৈভব ও বৈচিত্র্যের কথা ধরা আছে।

প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিসহ

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

****

অজস্র সংকট মাঝে জীবন যখন,
জ্ঞানের অন্বেষায় প্রদীপ্ত আমরণ
তখনই আমার চোখে ভাসে দেখি
সত্যসন্ধ ন্যায়নিষ্ঠ শিক্ষক জীবন।
দেশে দেশে কালে কালে তাঁরা মোর মর্মমূলে
দিয়েছে উৎসাহ আর প্রেরণার বারি;
জাগায়ে তুলেছে দেখি ঘোর নিদ্রা থেকে
সহানুভূতি মানবতা আর প্রেমের জগতে।
শিক্ষকের ব্রত জেনো আমৃত্যু তপস্যা,
জ্ঞানের সাধনা পাত্রে মৃত্যুঞ্জয়ী আশা।

অনন্ত সূর্যাস্ত যদি কোনো কালে হয়
সুন্দর দক্ষিণ বাতাস যদি পশ্চিমের প্রান্তকালে
আর না বহে কখনো
তাহলেও দিনশেষে উজাড় করিয়া দেয়
কে সে? সূর্যসম শিক্ষক জীবন।
দানের আনন্দে শুধু মহাসমারোহে
প্রদীপ্ত ভাস্কর যেন অনন্ত আমাতে।
অশান্ত পবনে যদি কাঁপে দেহমন
তবুও যে সুধামৃত সযত্নে করিয়া বর্ষণ,
সংসারের তুচ্ছ লাভ-ক্ষতি, ক্ষুদ্র টানাটানি
অতিক্রমি সেথা তার বজ্রমুষ্টি
নিয়ত প্রোজ্জ্বল হোক পদ্মসম প্রস্ফুটি।
হে প্রণম্য শিক্ষক,
তোমার চরণতলে আমি প্রণত আজ
আমাকে কী নির্মাল্য দেবে দাও।
এই নাও আমার শ্রম, আমার মেধা;
আমি উপমন্যু, আমি আরুণি,
আমি মৈত্রেয়ী।
আমি নবীন ভারত হবো,
শ্রাবণের প্লাবনে ভাসাবো
যত কিছু দেয়া-নেয়া, ব্যর্থ আস্ফালন,
কুরুক্ষেত্রের ভাঙা রথ,
লোভের অহংকার আর নিষ্কর্মার প্রলাপ।

হে উপাধ্যায়,
তোমার চন্দনচর্চিত হাত রাখো
আমার ললাটে।
আমি যেন জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে
হতে পারি সুসাধন তাপস সাধক,
পরের প্রজন্মকে দিয়ে যেতে পারি
তোমার অক্ষয় জ্ঞানের গাণ্ডীব।
তুমি আমাকে হায়নার হাসিঘেরা
প্রান্তর থেকে
নিয়ে চলো সূর্যের মিনারে।
অসহায় অথচ বিশাল ব্যথিত প্রান্তরে
তোমাকে ফেরাবো না জেনো
ব্যর্থ নমস্কারে।

চলে যেতে হয়

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

****

এক একটা দিন এমনি করেই কাটে—
স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে পড়ার টেবিলে
অথবা পাঁচ বাই তিন ফুট জানালার গ্রীলে,
বাসের ঝাঁকুনিতে,
স্যারেদের বকুনিতে
বন্ধুদের ঈর্ষায় বা ভালবাসায়।
কলেজের বিল্ডিং-এ বিল্ডিং-এ
ক্লাস না-হওয়া উদাস দুপুরে,
অথবা কলেজের করিডরে
উত্তপ্ত তর্কের জালে
মানিক না সুনীল ভালো!
বিষ্ণু না সুধীন!
কেনই বা জীবনানন্দ নয়।
'গর্ভধারিণী'তে সমরেশ কি করলো শেষটা?
'পরমা' কী সত্যই দেখার মতো!
শান্তিনিকেতনে কী মজাই যে হলো আমাদের!
বিভাগীয় প্রধানের ঘুরে ঘুরে হাঁটা
আর হেঁটে হেঁটে ঘোরা—
তোরা তো গেলিই না!

বেলিলিয়স রোডের ৫৭কে দেবদূত মনে করে
কলেজে ঢুকলেই পাবো—
ধুলোধোঁয়াহীন দুদণ্ড বসার শান্তি!
অনুচ্চার শান্ত সেই ফুলেদের আয়োজন—
তালগোল পাকানো দিনটা কলেজে যেন
বলে দেয়—ফুলের জাজিমে শোনা
প্রজাপতিদের ধাতব পদধ্বনি।
অথচ ঐখান থেকে চলে যেতে হয়।
মনে হয়, ডি.এম.-এর কবিতার ভরাট কণ্ঠস্বরে
গেয়েছিলাম পিকনিকে কোনো এক দৈব আয়োজনে।
মনে পড়ে—নতুন বাড়ির জন্য ভেজানো ইঁটের সোঁদা গন্ধ।
রবীন্দ্রনাথের গানের একটি কলির মতো
কলেজের বাতাসেতে মমতা জড়ানো ভালবাসা,
সঙ্গী, গাছপালা, টলমলে দীঘিজলে
কৃষ্ণচূড়ার ছায়া,
বন্ধুদের কথায় বার্তায় কথকের ঘুঙুরের মায়া।

[কবিতাটি সাম্মানিক বাংলা বিভাগের শান্তিনিকেতন ভ্রমণ উপলক্ষ্যে]

স্বরূপনগর

সুদীপ্ত মাজি

****

হারানো নৌকোর খোঁজে এক জীবন
দিব্যি কেটে যায়....

জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া শেষ বিকেলের আলো
জেটিঘাটে একা বসে থাকে....

মাল্লার গায়ের জামা ঘামে ভেজা, ওড়ে
রাতপতাকার মতো, একা, চরাচরে.....

হারানো নৌকোর খোঁজে ভেসে চলা মাঝিও কখন
হারায় সমুদ্রে, তার ফেলে যাওয়া চটি

কিছুদিন নদীতটে একলা পড়ে থাকে ...

শতবর্ষে কলেজ

মৌমিতা ধর (দে)

****

নরসিংহ দত্ত কলেজ জেনো
একটি পরিবার সম,
শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানাই
জন্মদিনে একশতম।
যাত্রা কবে হয়েছে শুরু
গড়ে উঠেছে পরিবার,
বৃহৎ থেকে বৃহত্তর
মন্দ সে কি আর?

কত গুণিজন পড়লো, পড়ালো
আরও কতজন আসবে,
শির উঁচিয়ে শতাব্দী পার
এই শিক্ষালয়ে বাসা বাঁধবে।

ND কলেজে কেন এলি ভাই
ইংলিশে অনার্স পড়তে?
'বাবা পড়েছেন, দাদা পড়েছে,
কেউ বলে দাদু ,ম্যাডাম,
এই কলেজেই আসতেন।
বংশ পরম্পরায় হাওড়াবাসী
নির্দ্বিধায় চলে আসি,
সেরকম কোনো কলেজ তো নেই
ম্যাডাম আশেপাশে,
এত বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি
স্নাতকোত্তর ও আছে,
মিছিমিছি কেন গঙ্গা পেরোই
এতসব যখন কাছে। '

ভাবি বসে আমি একশ বছরে
কিছু তো হয়েছে ঠিক,
বিভাগ পড়ছে উপচে আজকে
পড়ুয়ারা থিকথিক।

ফুটবল টিম—সে ও চ্যাম্পিয়ন
ক্যারাটে, যোগাসনও সাথে,
NSS, NCC, St. John's
পড়ুয়ারা আছেও তাতে।
ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরী, সবই accessible
তাই তো এখানে এতদিন ধরে
Topper রেজাল্ট possible।

যুগের সাথে অনেক বদল
শিক্ষণে, প্রাঙ্গণে,
তারই সাথে তাল মিলিয়ে
চলার চেষ্টা প্রাণপণে।

শতবর্ষের পূণ্য তিথিতে
এই প্রার্থনা আমার
আরও শতবর্ষ হয় যেন ভাই
শির উঁচিয়ে পার।।

সূর্যের রং

সৌমিত্র কুন্ডু

****

সূর্য ওঠে, অস্ত যায়
প্রতিদিন, নির্দ্দিষ্ট মহাজাগতিক সময়
পৃথিবীতে আবর্তিত হয়।
সূর্যালোকের প্রদীপ্ত আভায়
সূর্যের রং কি চেনা যায়?
কোনো অলস কর্মহীন দুপুরে
জানলা গলে ঘরে আসা
সূর্যালোকের রং হলুদ মনে হয়।
যে সকল বিকাল তার চঞ্চল বৈচিত্রের আনন্দে
মনকে মুক্তি দেয়
তখন সূর্যালোকের সোনালি আভায়
পৃথিবী রঙিন হয়
অন্যসময়, একঘেয়ে বিলম্বিত দিনে
সূর্যের আলো ধূসর, বর্ণহীন, নয়?
সকালের মৃদু রোদে যখন
প্রতিদিনের কর্মতৎপরতা শুরু হয়,
জীবনের দীর্ঘপথের সব কর্তব্য ও আশা মনকে উদ্দীপ্ত করে
তখন সূর্যের আলোর রং নীল।
সূর্য অস্ত গেলে
রাত্রি নেমে আসে পৃথিবীর বুকে
নিঃসীম মহাশূন্য হতে
নক্ষত্রখচিত শূন্যের তলায়
দাঁড়িয়ে বোঝা যায়
সূর্যের রং, সত্যের অখন্ড চেতনায়

মৃতের বয়ান

আকবর আলি

****

আজ প্রতীক্ষার অবসান।
তিন মুঠো মাটির চাপায়
অন্ধকার ঘরে ছেড়ে যাওয়া
আমার আর এক মৃতের মাঝে
দাড়িয়ে আছে মাটির দালান।

শহুরে আলোর আড়ালে
অন্ধকারে ছোট্ট ঝুপড়ি
কিংবা কোনো অন্ধগলিতে
ছিল অভাব, ছিল কষ্ট-হাহাকার,
দেখেনি কেউ, এড়িয়ে গেছে খেয়ালে।

আজ আমার আর্তনাদ শূন্যে
ধ্বনিত হয় বারংবার।
কারা যেন বলেছিল পাশে আছে
ডানে বামে আগে পিছে;
মৃতের বয়ান ভাসে শুধু গোরস্থানে।

সাম্যের ক্যানভাস

তাপসী খাড়া

****

পকেট থেকে বেরোল দুটাকা পঞ্চাশ পয়সা....তুমি নেবে তুলি ?
আমি! কিন্তু ছবিটার দাম তো দুটাকা!
এত সুন্দর ছবির দাম মাত্র দুটাকা? একটুও বেশি না? আচ্ছা,এত সুন্দর করে পুরুষের রূপ কীভাবে আঁকলে? শরীরের প্রতিটি অঙ্গ এত নিখুঁত! মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি....

শোনো না পঞ্চাশ পয়সা দিচ্ছি এই ক্যানভাসটির জন্যে....

পুরোনো রঙের পরিবর্তে একজন শূন্য ক্যানভাসটি আমায় দিয়েছিল....এর দাম যে এক পয়সাও নয় গো!
আরো একটি কারণে আমি নিতে পারব না ওই পঞ্চাশ পয়সা।

কী সেই কারণ?

যে পুরুষ আমার তুলির কাছে তার খোলা শরীরটি মেলে ধরে ছিল সে যে আমার কাছ থেকে দু-টাকাই নিয়েছে!

কিন্তু প্রশ্ন হল, যে পুরুষ তোমার তুলিতে ধরা দিয়েছে সেই পুরুষ কি কোনোদিন নিজেকে আয়নায় দেখেনি? এত সুন্দর চোখ,এত সুন্দর ঠোঁট,এত সুন্দর কাঁধ, এত সুন্দর চাহনি,এত সুন্দর .....

বিশ্বাস করো,মনে হয়েছিল ছুট্টে গিয়ে ওর বুকে নিজেকে সমর্পণ করি....ক্যানভাস জুড়ে শুধু নর নয় এই নারীও থাক ...

গোধূলির আলো পড়ুক ....
ওর সারা শরীর জুড়ে আমার ঠোঁট খেলা করুক.....
বিশ্বাস করো, তোমার মতোই আমিও একটা পঞ্চাশ পয়সা বেশি দিতে চেয়েছিলাম ...কিন্তু ও আমার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে বলেছিল, তুমি শিল্পী মানুষ... তাই ধরা দিলাম...আর এক থালা ভাতের দাম দু-টাকা.....তার এক পয়সাও বেশি না।

আমি পারব একবার তোমার ঐ পুরুষকে ছুঁতে?

নিশ্চয়ই

কবে পাব ওই সুন্দর শরীরের স্পর্শ? কবে পারব ওই ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে?

সেদিন পাবে, যেদিন তোমার পকেটের ওই পঞ্চাশ পয়সাটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে!

বারো মাসে তেরো পার্বণ

রজত পাত্র

****

বৈশাখে আজি দারুণ দহন
উষ্ণ পবন স্পর্শ,
হর্ষে তবু বাঙালির মন,
মানায় নববর্ষ।
গঙ্গাদেবী মর্ত্যে আসেন
দিনটি পুণ্যতোয়া,
সাফল্যকামী বাঙালি মানায়
শুভ অক্ষয় তৃতীয়া।
মাঝ গ্রীষ্মে তরুণ তপন,
তীব্র দগ্ধ জষ্ঠি,
মঙ্গলা আসে বাঙালি মনে,
মানায় জামাইষষ্ঠী।
আষাঢ় মাসের বৃষ্টিধারায়
শীতল স্পর্শ আনে,
আনন্দে মন নেচে ওঠে,
রথের দড়ির টানে।
শ্রাবণ মাসে ভরা বাদলে
বাঙালির ঘরে আলো,
ঘরের মাণিক ছোট্ট গোপাল
সবার মাঝে এল।
ভাদ্র মাসে বাদল কেটে
নীল আকাশের টানে,
ঘুড়ি লাঠাই আর বিশ্বকর্মা
খুশির পরশ আনে।
সেরার সেরা উৎসব যে আশ্বিনেতেই হয়,
দিকবিদিকে অসুর নিধন মা দুর্গার জয়।
কার্তিক মাসে হিমের পরশ শীতের পা ফেলা,
বাঙালি মজে রাস উৎসবে কৃষ্ণরাধার লীলা।
অঘ্রানেতে তোড়জোড় নতুন ধানের আশায়,
নলেন গুড় ও নবান্নতে বাঁধবে ভালোবাসায়।
পৌষ মাসে আনন্দগান নতুন ফসল ওঠে,
ঘরে ঘরে তাই বাউনি বেঁধে বানায় পুলিপিঠে।
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী বাগ্‌দেবীর পূজায়,
বিদ্যার্থী উপবাসে বিদ্যালাভের আশায়।
ফাল্গুনেতে দোলযাত্রা সাজিয়ে রঙের ডালি,
বাঁধ ভেঙে যায় চেনা-অচেনায় উল্লাসে বাঙালি।
চৈত্র মাসে শিবের পূজা আনন্দেতে আসে
শিবতলাতে চড়কমেলা মোদের স্কুলের পাশে।

আর্তনাদ

মিঠুন হাজরা

****

ছিলাম আমি তোমার কাছে গলগ্রহ, মাগো !
শাস্তি পেলাম বিনা দোষে ;
রইলে তুমি সুখের দেশে।
ছোট্ট কুঁড়ি ঝরিয়ে দিলে ;
ফোটার অনেক আগে।

ছিলাম আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি , মাগো !
বিজয়ার রঙে রাঙিয়ে বেদি ;
বেঁচে থাকুক তোমার জীবন ভেদি।
এই ধরণীর বুকের ঘ্রাণ ;
দ্বিচারিতায় মোর যায় যে প্রাণ।

ছিলো হয় ও ভীরু-অমানুষ, মাগো !
ওর হয় ছিলোনা পুরুষত্ব ;
কিন্তু তোমার তো ছিল বীরত্ব।
দোষ কি ছিল আমার বুঝি ;
চুপটি করে তাইতো খুঁজি।

পিতৃতন্ত্রের এই বেড়াজালে ভীত তুমি , মাগো !
বন্দী হলাম সংস্কারের সমাজেতে ;
তাই মুখ লুকালে আঁধারেতে।
খেলব না আর তোমার কাছে ;
রইবো না আর তোমার পাশে।

পূর্ণজীবন প্রত্যাখ্যান করতে তুমি পারো ? মাগো !
বাঁচার রসদ লুকিয়ে আছে ;
তোমার বীভৎসতার মাঝে।
ভ্রান্ত বোধের বিনাশ ঘটে ;
সাক্ষী রইল জীবন বটে।

হৃৎপিন্ডের ছন্দপতন দিচ্ছে তোমায় মুক্তি, মাগো !
ভুবনভরা স্নিগ্ধ হওয়া ;
দেখবো না আর মলিন ছাওয়া।
ডাকবো না আর মা মা করে ;
থাকবো পড়ে আঁস্তাকুড়ে।

খাদক আমায় বানিয়ে দিলে জন্মের পর , মাগো !
লালা ঝরে ওই জিভটি দিয়ে ;
তীক্ষ্ণ লোভের দৃষ্টি নিয়ে।
জুড়াই ওদের ক্ষুধার নিবৃত্তি ;
ভক্ষণে যে পরম তৃপ্তি।

১০০ তে পা

দেবনীতা ঘোষ

****

আমি নরসিংহ দত্ত কলেজ
১০০তে পা দিলাম,
কত ভালোবাসা, কত যত্ন
সকলের থেকে পেলাম।
আমার জয়ের মুকুটে গাঁথা
সেরার পালক শত শত,
সর্বদিকে সবাই আমায়
করেছো গর্বিত।
বেলিলিয়াস সাহেবের সহযোগিতায়
সুরঞ্জনবাবু আমাকে গড়লেন,
কত স্বপ্ন আর আশা নিয়ে
১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন।
আমার কত ছাত্র-ছাত্রী
নানান দিকেতে সেরা,
তাদের দক্ষতা আর যোগ্যতায়
গর্বে আমার বুক ভরা।
আমার যত শিক্ষক-শিক্ষিকা
আর শিক্ষাকর্মীগণ
সুদক্ষতায় করে চলেছেন
আমাকে লালন-পালন।
আমার শীতল স্নিগ্ধ পরশ
ভালোবাসায় ভরা,
সব দিক থেকে জয়ী হব
এটা পরম্পরা।

আমার ক্লাসঘর, ক্যান্টিন
আর সবুজ ঘেরা মাঠে,
প্রতিদিন কত নতুন কুঁড়িরা
হাতে হাত রেখে হাঁটে।
আমি কত ভাঙতে দেখেছি,
দেখছি কত গড়তে
আমার মাথা উঁচু রাখতে,
দেখছি তাদের লড়তে।
হাওড়া জেলার বুকেতে আমি
একটা অহংকার,
দ্বিতীয় বৃহত্তম কলেজ আমি
আমাদের এশিয়ার।
আরও শতাব্দী পেরোতে চাই
সকলকে সাথে নিয়ে,
সকলকে পাশে নিয়ে
বন্ধু হাতে হাত মিলিয়ে।

জল থইথই ভালোবাসা

প্রীতি ঘোষ

****

আমি যেদিন প্রথম তোমার কাছে এসেছিলাম
সেদিন ছিল এক বৃষ্টিস্নাত দিন;
ঠিক মুশলধারে নয় সারাটা দিনের নিম্নচাপ ছিল
সেদিন; তুমিই আমার প্রথম বন্যা দেখা
আমি যেদিন প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পেলাম
দিনটা ছিল আগস্টের চৌদ্দ ;
সততই একা বেরিয়েছিলাম নতুনের পথে
তুমিই ছিলে আমার প্রথম গন্তব্য..
আমি যেদিন প্রথম আলোর খোঁজ করেছিলাম
সেদিন তুমিই আমার সাহস হয়েছিলে;
আমার শব্দকে নতুন করে আপন করেছিলে
আমাকে দিয়েছিলে এক পশলা বৃষ্টির আনন্দ..
যেদিন জীবনের ইচ্ছেভুলগুলি বুঝতে পেরেছি
তখন তুমি শুধুই স্মৃতিচারণ;
তুমি বয়ে আসা নদীর শান্তি,বয়ঃসন্ধির হাতঘড়ি
আজ তুমি একশোয় একশো; পরিপূর্ণ শির
তোমার থেকে আমি শিখেছি গর্বিত হয়েছি
প্রতিটা গলির মুখে লিখেছি কলেজ জীবন ;
আমার কলেজ নরসিংহ দত্ত কলেজ
আমার জল থইথই ভালোবাসা ..

তাড়াহুড়ো

স্মরণিকা ব্যানার্জী

****

সময়, এত তাড়া কীসের তোমার?
চলতে তো পারো একটু ধীরে
যেতে তো পারো একটু পরে
জীবনের গল্পে আছে অনেক ধাঁধা
একটু হাসি নিয়ে একটুখানি কাঁদা
যদি চাওয়া পাওয়াকে সঙ্গে নিয়ে
হিসেবনিকেশ চুলোয় দিয়ে
যদি করতে পারো দুঃখের সাথে আড়ি
তবে হোক আজ একটু বাড়াবাড়ি
ভালো পাওয়ার জন্য আজ
খারাপের সাথে করব কাড়াকাড়ি
সময়, আজ থামতে হবে তোমায়
হারবে তুমি, জিততে হবে আমায়।

বোড়ে

শ্বেতা সরকার

****

নিভে আসা আগুনের স্তূপ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া, বাতাসে ভাসছে পোড়া মাংসের কটু গন্ধ। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষগুলো আগুনের স্তূপের ভিতরে কার্বন হয়ে এখনো ধিকিধিকি জ্বলে চলেছে। চারপাশে ভিটেমাটি স্বজন হারানোর আর্ত চিৎকার। দিনকয়েক আগে ধানজমির ভিতরে পড়েছিল মেয়েটার বাবার গুলিবিদ্ধ লাশ। পরিপক্ক ফসল কেটে ঘরে মজুত করতে চেয়েছিল বাবা। একটু দূরে পাথরের মতো বসে রয়েছে মেয়েটার মা। সামনে তাদের বাড়ির অবশেষটুকুর ভিতরে তখনো জ্বলছে বুড়ি ঠাকুমা আর ছোটো ভাই।
কোনো গোলমাল যেন না হয় তাই সতর্ক সিপাহির দল টহল দিচ্ছে এদিক থেকে ওদিক। ভাবখানা এমন যেন আধখানা হাত কেটে ফেলার পর দেখে যাচ্ছে কেউ ছটফট করছে কিনা। আচমকা একজন সিপাহির উদ্দেশে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে ওঠে মেয়েটা,

'কেন এসেছ তোমরা? এখানে কেন এসেছ?'

ভাবলেশহীন মুখে সিপাহি থমকায়। তার মনে ভেসে ওঠে নিকানো উঠোনে খেলে বেড়াচ্ছে তার সন্তান। উঠোনের একপাশে রোদ পোহাচ্ছে বৃদ্ধা মা, আর দরজায় তার পথ চেয়ে অপেক্ষায় স্ত্রী। মেয়েটি আবারও চিৎকার করে ওঠে,

"চলে যাও তোমরা, চলে যাও এখান থেকে।"

সিপাহি সামান্য ঘাড় নেড়ে মিশে যায় অন্ধকারে। শিকারী বেড়ালের মতো ভিডিওটি আপলোড করে সাংবাদিক। মুহূর্তে ভাইরাল হয় দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার সোচ্চার প্রতিবাদ।

'চলে যাও এখান থেকে।'

পরের দিন সিপাহির বাড়িতে তার শহিদ হওয়ার সংবাদ পৌঁছায়। ফুল মালার স্তূপে ঢেকে যায় সিপাহির পতাকায় ঢাকা কফিন। আর সেই দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার ক্ষতবিক্ষত শরীর পড়ে থাকে রাস্তার ধারে। কারণ মানবিক বোধসম্পন্ন সিপাহি আর প্রতিবাদী চিৎকার দুটোই শাসকের পক্ষে বড়োই বিপজ্জনক।

অকপট

এষা গাঙ্গুলী

****

তোকে নিয়ে আজ বসলাম
বাঁধতে কবিতার ছন্দে
আসবি তো আমার কলমে?
ধরা দিবি কি আমার আনন্দে?

অপার আনন্দে খুঁজিস প্রাণ
আমার দুঃখে দিস প্রলেপ
তোর মনের কথার ভিড়ে
আমার সময়রা করে আক্ষেপ।।

বন্ধু তুই অচিন দেশের
সঙ্গী তুই প্রাচীনতার
বদ্ধকূপের জলেই বাঁচি
কাহিনি আমার অভিন্নতার।।

হারাতে হবে জেনেও আমি
বেছেছি সেই অনন্ত পথ
হারানো সুরেই ফিরে পাওয়া
অমূল্য সময় অকপট।।

সাদা-কালো রুচির ভেদে
বাঙালি আমার চরিত্রকে
রক্তাক্ত শরীরে শক্তি
ফেরালি তুই সহজেতে।।

স্মরণে-বরণে হাসিতে পলকে
আগলে রাখতে চাস আমাকে
ওরে বোকা রঙিন তুলি
পাবি কি আমায় আর রাঙাতে?

জীবন

অভিরূপ বসু

****

জীবন মানে তো চলতে চলতে
কত পথ, কত শেখা
জীবন মানে তো সমুখে তাকানো
অসীম দৃষ্টিরেখা,
জীবন মানে তো হাসি-কান্নার
মেলবন্ধনে মালা,
দুঃখ-সুখের সাগর পেরোনো
পালা-বদলের পালা।
জীবন মানে অজানার পথে
পথ খুঁজে চলা মজা,
জীবন মানে অচেনার দেশে
উড়ানো বিজয় ধ্বজা।
জীবন মানে দরদে পরশে
মুছে দেওয়া কারো ব্যথা
জীবনের মানে হৃদয় জাগানো
ভালোবাসা মানবতা।
তাই তো বন্ধু দুঃখ যদি আসে
সুখের স্মৃতিতে হাসো।
পথের সাথীরে আপন নিরিখে
প্রাণপণে ভালোবাসা।

বন্ধুত্ব

অরিজিৎ দাস

****

বন্ধু মানে আমার গানে—
কথা ও সুরের কাছে ও দূরের সম্পর্ক;
মধু, চিনি, দুগ্ধ, দধি সবে মিলে বাঁধি
সুধার ন্যায় মধুপর্ক।
এইরূপ মিষ্টতা সুদূরে সরায়ে তিক্ততা
পৌঁছে দিল তোমাদের নিকট
নবজীবনের সন্ধানে জড়ায়ে নূতন বন্ধনে,
মুক্ত করিল সকল সংকট।।

বাল্যকালের ভোরবেলায় বিদ্যালয়ের মিলনমেলায়
মিষ্টি হাসিতে প্রথম আলাপ—
হাতে হাত মিলিয়ে দিলাম বিলিয়ে
সৌজন্যের অদৃশ্য হলুদ গোলাপ।
লেখাপড়া আর দুষ্টুমি আমার সঙ্গে সদাই তুমি
এভাবেই হয়েছ মোর জীবনের অঙ্গ,
ভেবেছিলেম তোমারে দেব না আঘাত দেব শুধু সওগাত
জানি হবে না কখনও এ সঙ্গভঙ্গ।।

তবু কখনও সহসা লাগি যেত বচসা;
ছিন্ন হইত সন্নিবেশ
আবার কাটিয়ে সন্দিহান পাইতাম সন্ধান—
পুনর্মিলনের নতুন পরিবেশ।
বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে শেষে ছড়িয়ে গেলাম নিজ নিজ লক্ষ্যে ভেসে
রয়ে গেল কত স্মৃতি কথা গ্রথিত হয়ে ধূসর শিলাস্তরে,
পুরানোকে জানিয়ে বিদায়, আগামী প্রাতের আলোকিত অধ্যায়—
কেউ যন্ত্রবিদ্যায়, কেউ চিকিৎসাবিদ্যায়, কেউবা স্নাতক স্তরে।।

সময়ের স্রোতে নদীর ন্যায় বহু শাখাতে
বিভক্ত হইল মোদের জীবন;
ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূত্রে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও গোত্রে—
পরনে জুটিল এক পেশার আবরণ।
যখনই তাকাই পিছনে ফিরে, দেখি তোমরা রয়েছ আমায় ঘিরে—
অথচ এ রূঢ় বাস্তবে আমি একলা দাঁড়িয়ে নিরালায়;

নেই তো আর তোমরা পাশে— ডানা মেলে উড়ে গেছো অসীম নীলাকাশে,
শুধু দিয়ে গেছো আঁখি ভরা জল বেদনার সুর তুলে বেহালায়।।

কর্মের অবসরে বুকে নিয়ে বন্ধু বিরহ প্রতীক্ষা করি অহরহ,
প্রশ্ন করি নিজ চিত্তে আমারে কী তারা গেছে ভুলে?
অনেক কালের ব্যবধানে নিয়তির আহ্বানে—
হয় যদি দেখা—তবে গল্প করিব প্রাণ খুলে
ভিন্ন ক্ষেত্রে অভিন্ন নেত্রে—
সকলই ছিল সময়ের মিত্র;
দিনের আলোয় রাতের কালোয়
শুধু বয়ে যাবে অরুণ-বিধুর গ্রহণ চিত্র।।

ভ্রমণ বিচিত্রা

অয়ন শেঠ

****

কোথায় ভ্রমণ না করেছে!
সিমলা-কুলু-মানালি,
যা বলছে সত্যি কথা
কুতুবউদ্দিন আলি।
নদী-সাগর-পাহাড়-টিলা
বন-জঙ্গল গুহাতে;
কোথাও হেঁটে কোথাও শুয়ে
হামাগুড়ি দু'হাতে।।
কোথাও বাসে কোথাও ট্রেনে
কোথাও উড়োজাহাজে
কোথাও বাঁশের রণ পায়ে আর
সাথে শ্রীরাম সাহা যে।
কোথাও গেছে নৌকা চেপে
কোথাও উটের পিঠেতে
কোথাও গেছে গেছে গাধার পিঠে
ঠাকুরদাদার ভিটেতে।
কোথায় ভ্রমণ না করেছে
পাছ না আর কিছু!
তাই সে এখন ভ্রমণ করে
ছায়ার পিছু পিছু।।

জীবনের কথা

স্নিগ্ধা বিষ্ণু

****

কখন যে এতটা সময় বয়ে গেলো!
কখন যে মোটা বিনুনি দুটো ছোট্ট ক্লিপে আটকে গেল, বুঝতে পারলাম না!
কত কথা রয়ে গেলো অব্যক্ত.. কত কিছু অজানা

সেই যে একদিন নৌকা করে যাবার পথে,হাত ফসকে পড়ে গেল প্রিয় লাল জলের বোতলের ঢাকনাটা..
স্রোতে ভেসে গেলো..দূর থেকে দূরে...
ছোট্ট হৃদয়ের সেই কষ্ট কাউকে তো বলা হল না!

মামাবাড়ি থেকে লুকিয়ে এনেছিলাম পাতাবাহারের পাতা,দিদিমার গন্ধ কাছে রাখব বলে,
কখন যে পাতাগুলো হারিয়ে গেল!
কবে যে দিদিমার কোলে চড়ে ঘুমভাঙা চোখে দিনের প্রথম আলো দেখার দিন ফুরিয়ে গেল..!
কবে যে তাঁর আচারের শিশিটা চিরদিনের জন্য খালি হয়ে গেল.. বুঝতে পারলাম না!

জানতে পারলাম না চির স্মিতহাস্যময়ী মা আমার
অসময়ে কেন এমন করে হারিয়ে গেল
জানা হল না কতটা অভিমান জমা ছিল তাঁর বুকে!
মা-কে জড়িয়ে ধরে শোনা হল না তাঁর ব্যথা ..
মায়ের চোখে দেখা হল না তাঁর শৈশব..!

দারিদ্র্যের সাথে বড্ড বেমানান সদাআনন্দময়ী মেজপিসি ফিরে যেত যখন তাঁর স্নেহে সিক্ত করে,
কিশোরীর বেদনার্ত চোখ খুঁজে ফিরত তাঁকে
সেই ফেলে যাওয়া পথটুকুর মাঝে
সে যখন চলে গেল চিরতরে
চিৎকার করে কাঁদতে পারলাম কই!

সেই যে কবিদাদু, ঝোলা কাঁধে আসত হঠাৎ করে
আর কথায় কথায় ছড়া বাঁধত মুখে,
কবে-কোথায় হারিয়ে গেল.. আর এল না !

ঠাকুমার বাটাপানের গন্ধ, রাজার মেয়ে-শেয়ালের গল্প
আজ বিস্মৃতপ্রায়!
শুধু দাঁতহীন সেই নরম গালদুটো-
কী প্রচন্ড ঠান্ডা হয়ে গেল একদিন..!
আঙুলগুলো যেন আজও অনুভব করে সেই স্পর্শ...

প্রিয় পেয়ারা গাছটা শুকিয়ে গেছে ক-বে,
ঠাকুরবাড়ির দাদুর সুর করে মন্ত্র পড়া থেমে গেছে,
মহালয়ার ভোরের শিউলি বিছানো উঠোন আর
বারান্দাভরা মানুষগুলো যারা একমনে শুনছিল আগমনীর গান..এক এক করে হারিয়ে গেল তাঁরা!
হারিয়ে গেল সেই দিনগুলো, চিরতরে
ঠিক যেমনকরে স্রোতে ভেসে গেছিল সেই ছোট্ট শিশুর প্রিয় বোতলের ঢাকনাটা.....

শুধু অনুভূতির স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে থাকা!
শুধু অসহায় চোখে চলে যাওয়াকে দেখা...!!

অবতরণ

দেবব্রত ঘোষ মলয়

****

হয়তো পাতা ঝরার সময় এল ... বসন্ত বিলাপে
দেখো কৃষ্ণচূড়ার উপরের ম্রিয়মান পাতাগুলো একাকী
ঝরে যাওয়ার অপেক্ষায় ... ঝকঝকে উজ্জ্বল সেই লাল রং
আজ অন্যরকম, ম্রিয়মান দৃষ্টির মত ... মেঘলা মেয়ের একা কান্নার মত ...

আজ জনসমাগমে হাততালি উন্মাদনা মাতন
সবই সবুজকে ঘিরে, যেখানে মিষ্টি কুঁড়ি আদর জানায়
এ মঞ্চ তো আমারই তৈরি, শুরুতেই জেনেছি নেমে যেতে হবে
নামতে না জানলে উপরে উঠতেই পারবে না ...

অসূয়া নয়, আমার জীর্ণ হাত বাড়িয়ে দিয়েছি আলিঙ্গনের জন্য
আমি জানি, জীবন মানেই সৃষ্টি ... সৃষ্টি মানেই নতুন
চাইলে, তুমি মেনে নিতে পারো, জড়িয়ে ধরতে পারো পূর্বসূরীর আঙুলগুলো
আবার না চাইলে অসতর্ক অবহেলা আর তীব্র উদাসীনতার সঙ্গে উপেক্ষাও করতে পারো ...

তারপরও, পঙ্কের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে উদ্ধার করে আনব মুক্ত
কোনো কৃতিত্ব চাইব না, চাইবো মঞ্চের শিখরে তুমি জ্বলজ্বল করো
তোমার উত্তরণই আমার সাফল্যের মাপকাঠি, আমার তৃপ্তি
ক'জন পারে সৃষ্টিকে খুঁজে আনতে ... নির্মাণের নাবিক হতে ...

তারপর, সন্ধ্যা নামে গোধূলি গগনে ... আসন্ন উল্লাস রাত্রির আমন্ত্রণ
নিজেকে সাজিয়ে তোলো, বহু জন মাঝে মাথা উঁচু করে সৃষ্টি করো
বহমান এ ধারাকে শিখরে নিয়ে যাও ... ধীরে ধীরে ভুলে যাও নেপথ্যে আমার ভূমিকা
সব রং মিশে যাক, নতুন পালক রাঙিয়ে তুলুক তোমার মুকুট

শুধু, এই তৃপ্তি বুকে নিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে পথ করে দাও আমায় ...

এক শতাব্দী পর

দেবলীনা চাওলে

****

এক শতাব্দী যদিও করেছ
তুমি পার, অশীতিপর নয়
তবুও তুমি, মনে হয়
বারে-বার।

কিশোর-কিশোরীর দল এসে
ভরিয়ে তোলে ঝাঁকে - ঝাঁকে,
তোমার রোদঝরা দিন, পড়ন্ত বিকেল,
আবছায়া সন্ধে।

পুকুর ধারে, মাঠের সবুজ ঘাসে,
ক্যান্টিনে, ক্লাসে ক্লাসে
টিচার্স রুমে; ছড়িয়ে আছে
তোমার ন্যুজ না হওয়া প্রাণ।

আকাশের বুড়ো সূর্যটার মতো তুমি।
রোজ সকালে নতুন জন্ম হয়
তোমার, আর তুমি ছড়িয়ে দাও আলো।
জ্ঞানের আলো।

এভাবেই আরও ক'য় শতাব্দী
করো পার। জিওনকাঠি ছুঁইয়ে
গেয়ো, নতুন প্রাণের
সুরবাহার।

ভিনদেশী পাখি

রাজ

****

যেই ময়ূরে ধরতে যাবে
সেই না দিয়ে ধরা।
ভিনদেশী শালিক ও শঙ্খচিলে
বাঁধবে তোমার সনে বাসা।

পায়রাদের বকম-বকম
ঘুঘুদের বাসার খোঁজ।
তার মাঝে তুমি আর এক
শালিক,শকুন,চিল,চড়ুই তুমি কি?

যেই পাখি হও না কেনো?
উড়তে ভুলো না, খাঁচায় ঢুকো না।
কারণ এ আকাশ তোমার প্রেমী
আর তুমি এর সেই চির অধরা প্রেম।

অতীতের পাতা থেকে

অশ্রুকণা পাল

****

স্মৃতির অভ্যন্তরে ফেলে আসা কিছু চোরা গলি
কিছুটা মসৃণ, কিছুটা অমসৃণ, তো কিছুটা শুধুই বালি।
বিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে অন্য স্বাদের আশা,
সিঁড়ির ধাপে প্রেমালাপে ক্ষণিক সুখের নেশা।
সবুজ মাঠের আলাদা গন্ধে উল্লাস-কলরব
নিঃশব্দ বইয়ের সারি, সাক্ষী কিছু যাযাবর।
হারিয়ে যাওয়া সুখের খোঁজে, বন্ধুত্বের ক্যানভাসে
মাতোয়ারা কিছু নতুন মুখ, পুরোনোরা ফেরে গা ঘেঁষে।
কোথাওবা দীর্ঘ অপেক্ষারত রোদেপোড়া কিছু মুখ,
কেউ বা চিন্তামগ্ন ফলাফলের আশায়, কেউ নিশ্চিন্ত হাস্যরসে-কৌতুক।
কারোর বিষাদের স্মৃতির মাঝে কারো প্রাপ্তির উৎসব
ফেলে আসা দিনগুলো আজ ভীষণ নীরব।
তবুও কিছু শান্তির ছায়াতলে, আজও হৃদয় খোঁজে
যদি আবার ফিরে আসে স্মৃতিরা নতুন রঙিন স্রোতে।

স্বাদবদল

কুশল বিশ্বাস

****

বয়স যখন দশ,
ধুলো মাখা সন্ধ্যের আগে ,
লুকিয়েছি কৃষ্ণচূড়ার পাশে
হাসি ঠাট্টা মজা আর খেলা ,
কৃষ্ণচূড়া দিচ্ছে সেথায় পাহাড়।
বয়স যখন কুড়ি,
মন হারালো চোখের ইশারায়
গোধূলি রঙে গোলাপি ছায়ায় ,
দখিনা বাতাস স্বপ্ন দেখায়
সাক্ষ্য দিলো সেদিন কৃষ্ণচূড়ায়।
বয়স যখন তিরিশ ,
আঁধার জগতে দুর্বিষহ মন ,
এবারের পথে কষ্ট সারাক্ষণ।
যন্ত্র যখন শান্তি চায়
আবার পেলাম কৃষ্ণচূড়ার আশ্রয়।
আজ এসেছি সত্তরে,
হবে দুই জীর্ণের মিলন ,
কৃষ্ণচূড়া, তোমার সেই স্বাদ ,
বলো, ফের বদলেছে কি?

ফিরে দেখা

প্রবীর কুমার পাছাল

****

বাস টার্মিনাসে অফিস ফেরত
হঠাৎ দেখি মানুষের ভিড়। না মন্ত্রী—
না নেতা, নেই কোন ফিল্মি তারকা
শুধু বিধবা নারীর বুকফাটা কান্না
ভিখিরী ছেলেকে নিয়ে যাবে লাশ কাটা ঘরে।
ওর শৈশবের নদী বয়ে চলে ঘোলাজলে
স্রোত টানে সারা দিন পাক খায়।
শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে, সারাদিন পায়ে ধরে
যদি একটি পয়সা পায়।
শিয়ালদা ফুটপাতে ছেলেটি শুয়ে বসে থাকে
পরনে নেই জেল্লাদার পোশাক, শুকনো মুখ।
পিছন ফেলে শহর থেকে বহুদূরে চলে যাই
বাড়ি ফেরার পথে রোজ দেখতে পাই।
যেখানে আমি থাকি আছে কুঁড়েঘর
ছেঁড়াকাঁথার বিছানা, অর্ধশায়িত
অবসাদে ভাবি বিধাতার একি ছলনা।
যেদিক পানে চাই ফেরাতে পারিনা মুখ
শুধু মনে ভাবি অপদেবতা তোমাকে কেন দিয়েছে
এত বারোয়ারী দুখ।
ধরণীর শেষ বিকেলের লালচে ক্ষীণ অলো
চেটেপুটে সন্ধ্যা হল। অন্তহীন অন্ধকারে
শীতের সন্ধ্যায় পায়ে ঠাণ্ডা স্পর্শ,
চমকে উঠি, দেখি পেছন ঘষে চলা
হাতে ভর দিয়ে ভিখিরী ছেলে
জ্বলজ্বলে মুখ, জোনাকীর মত মিটিমিটি চাওয়া
দুর্বল শরীরে মেলেনি, চেটে পুটে খাওয়া।
কোমর নিচে আঁকাবাঁকা পা দোলকের মত দোলা
দাঁড়াতে পারে না, দাঁড়ানো যায় না
নিঃশব্দে যন্ত্রণা সয়।
টিনের কৌটো দড়ি দিয়ে বাঁধা গলায়
হাতে কলাই করা বাটি
সারাদিন পথচলতি মানুষের পায়ে ভিক্ষা চায়।
আঙ্গুলের অস্পষ্ট আঘাতে বাজায় পাত্রখানি।
ফোঁটাফোঁটা অশ্রু ঝরে চোখ দুটি হতে।
কেউ শোনে না—ভিখিরীর করুণ কথা
একটি পয়সা দাও বলে সে হাত দিল বাড়িয়ে
কেহ দেয় একটি পয়সা, কেহ যায় মাড়িয়ে
যেন চালসে লেগেছে চোখে।
তাড়িয়ে দেয়, ঘড়ির কাঁটার মত ফিরে আসে
প্রতীক্ষারত মলিন মুখ—
চোখ সাদা, দুর্বল অভুক্ত শরীর, ফ্যাকাসে মুখ
যেন ধূমল ধূসর,
কখনো বসে থাকা আধো হেলান দিয়ে
গুটি কয়েক ছড়িয়ে থাকে খুচরো পয়সা
মনে ভাবে নির্দয় দেশে কেন জন্মেছিলাম মাতৃগর্ভে
ধাত্রীমা কেন আমার চোখে দিয়েছিল গোলাপজল।

রবিঠাকুর

দোলন দাস

****

তুমি...
তুমি আছো মননে, চিন্তনে, জাগরণে
তুমি বৈশাখের দাবদাহে, শরতের আকাশে
তুমিই আবার বিরাজ করো পৌষের পার্বণে।
প্রত্যেকটা বাঙালির গানের আসরে
আজও তুমি চিরউজ্জ্বল...
তুমি আমার রবিঠাকুর, আমাদের রবীন্দ্রনাথ।

আজও তুমি চিরউজ্জ্বল বাঙালির চায়ের আসরে,
প্রেমের স্বপনে, পাওয়া আর না পাওয়ার লড়াইয়ে।
তুমি দুঃখে, তুমি আনন্দে,
তুমি সূচনায়, শেষেও।
আজও তোমাতেই মগ্ন গোটা পৃথিবী।
তুমি আমাদের রবিঠাকুর, আমার রবীন্দ্রনাথ।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তোমাতেই মগ্ন গোটা পৃথিবী
সাহিত্যে, গানে, বিদ্রোহে সমগ্র স্থান
অধিকার করেছ যেমন, তেমনই
বাঙালির হৃদয়ের সর্বোচ্চ স্থানে তুমিই আছো।

তুমি তো বিশ্বকবি,
তুমি আনন্দের ধারক, নোবেল প্রাপক
তুমি রবীন্দ্রনাথ।

বাঙলাদেশের চিরউজ্জ্বল প্রকৃতির মতোই তুমি
বাঙালির হৃদয়ে চিরউজ্জ্বল থাকবে।
মৃত্যুতেই তো জীবনের গণ্ডি শেষ নয়,
তাই তো তুমি আজও উজ্জ্বল আমার মননে
প্রতিটা মানুষের স্বপনে।
নক্ষত্রের মাঝে চিরউজ্জ্বল নক্ষত্র তুমি রবীন্দ্রনাথ...
আমার রবিঠাকুর।

পূর্ণ অনুভূতি

প্রিয়া কুন্ডু নন্দী

****

বহুদিনের স্বপ্ন প্রথম পূর্ণতা পেয়েছিল,
যেদিন কাঁধে ঝোলা ব্যাগ ঝুলিয়ে-
শুধু পেন ডায়েরি ছিল সম্বল।
ক্লাসে যে কোনও বেঞ্চে বসা মানে,
নতুন আরো এক অনুভূতির সূচনা।
সাদা দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য,
ঝাপসা ও হিজিবিজি লেখা-
আজো চোখের সামনে ভাসমান।
টিচারদের জ্ঞান বিবরণ সর্বদা,
নীল কালি অক্ষরের খসখসে পাতায়-
পূর্ণ বিবরণী হয়ে উঠত।
চোখের সামনে সবুজে ঢাকা বিস্তীর্ণ মাঠ,
কলেজ প্রাঙ্গণ আজো চিরসবুজ।
সুখের মোড়কে সোনালি দিনগুলো,
চিরন্তনী হয়ে সোনার মতো চকচক করছে।
প্রতিদিন নতুন বন্ধুত্বের সমাগম,
সতেজ বাতাস বয়ে আনত।
এ গন্ডি বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয়,
স্বাধীনতার মাঝেও কড়া শাসন-
তাই ভালোবাসা মায়ায় জড়ানো রূপোলী স্মৃতি।

রাত্রি

সায়ন মণ্ডল

****

রাত্রি তুমি বড়োই সুন্দর
অনন্য তোমার রূপ ওই গভীর আঁধারে
তোমার নিশীথিনী শোভা
মুগ্ধ করল আমারে।

কে বলে আঁধার কালো?
এ এক মায়াবী খেলা
রাতের আলোর আকাশে আছে
হাজার নক্ষত্রের মেলা।

কে বলে তুমি নিস্তব্ধ?
তোমাতেই আছে আওয়াজ, আছে সুর
কান পাতলেই শোনা যায়
নিশাচর জীবকুল, দিগন্তে বহুদূর।

কে বলে তুমি ভয়ংকর,
তুমি নিষ্পাপ, তুমি নির্মল
কলঙ্কিত এই সমাজ, স্বার্থপর
লোভী, তাই তারা দুর্বল।

তোমার ওই অপরূপ সৌন্দর্যে
মোহিত বিশ্ব সংসার
রাত্রি,
কে বলে তুমি অন্ধকার?

বন্ধু

রাজদীপ রায়

****

তোর সমস্যার কথা
যখন অন্যের কাছ থেকে শুনি
দুঃখ হয়, ভাবি
তারাদের কষ্ট এতটুকু
পাশাপাশি থেকেও প্রভূত
দূর থেকে স্থির চেয়ে থাকে।

AN IMAGINARY CONVERSATION
between the Moon and Indu

Purnendu Bhattacharyya

****

Moon : ...So you men, not content with wrecking the beauty and property of the Earth, want to target me.

Indu : You mean India's landing on your south pole—our Chandrayaan 3. Oh India is on the Moon for the first time!

Moon : I think you are not neighbourly with your nearest natural satellite.

Indu : Actually, we're using science to have a better idea of the space, to dissolve the mystery of your birth, the treasure your womb contains, your atmosphere etc.

Moon : That is you're engaged in a demystication venture Aicc myths and an??dotes will no more entertain the men. Who would now believe that I am the issue of a Titan, move in a chariot in the sky, a symbol of life and fertility, kissed Endymion every night in his munending slumber etc.

Indu : Science is fact, and fact challenges myths and reveals the truth. Just see how you are a god and a godess in different myths. Indians worship you as Chandradev, Japs as Sukuyomi, the Norse as Mani, the chinese as Chang'e, the Mayans as Exchel, the Egyptians as Khonsu, the Romans as Luna, the Greeks as Artemis etc.

Moon : The question of gender has never irked me. You Indians say 'je kali sei krishna' (Kali the goddess and Krishna the incarnation of Vishnu are the same).

Indu : Science has revealed that you're 4.5 billion years old, you're four hundred times smaller than the sun, your diameter is one fourth of the Earth, you have no gravitation and so no atmosphere, have moonquakes etc. Moreover there are many more moons in the space eg Ganymede, Titan etc.

Moon : Your selenology has destroyed the beauty of such expressions as haply the Queen Moon is on her throne, | Cluster'd around by all her starry fays." People will no more enjoy Lyly's Endymion or Jonson's Cynthia's Revels or Shelley's The Moon. I've ever been an antidote to your sorrow, frustration, dejection, misery, I am a natural object of beauty, and your keats wrote in Endymion "A thing of beauty is a joy for ever". Children as well as adults enjoy Herze's Destination Moon or Explorers on the Moon. None would write such fiction any more.

Indu : Science has no relation with myth or fiction. None would believe your marriage with twenty seven daughters of Prajapati Daksha, but your special liking for Rohini which caused your near extinction by Daksha's Curse, from which Lord Shiva saved you by embedding you to his forehead. Now Rohini is a Nakshatra and this myth is scientifically

interpreted as your occultation with Aldebaran (Rohini).

Moon : But would you tell what your Vikram Lander and Pragyan Rover in Chandrayaan-3 are going to do?

Indu : They will see, inter alia, if there is water in your body.

Moon : Why water is of so much importance to you?

Indu : It will explain your origin, the origin of the seas on the Earth etc.

Moon : What will you do with water?

Indu : It will be split into hydrogen for fuel and oxygen for breathing. Without water we cannot make you inhabitable for man and animals.

Moon : Russia also sent a rocket but failed to land. I could disallow you too, but I became soft to remember the mothers' lullabies like "ai ai chandmama tip diye ja..." (maternal uncle moon, come and dot my baby's forehead with mark of your love). So many songs are there tagged with my name— 'e chandsa roshni chehra...', 'Chand mera die...', 'O mere chandni...', 'Khoya khoya chand...', 'Chandni ki chand ho...', 'Chanda bhi tu...' and many more. How sweet is the Tagore's song 'Chander hasir bandh bhengechhe', or Hemanta's composition of 'ei rat tomar amar, oi chand tomar amar...' lovers make me a witness of their love.

Indu : So you admit how the Earth and you are closely related.

Moon : But you have tarnished my image by such coinages as "moonstruck" to mean 'mad', 'lunatic asylum' for the abode of madmen, 'mooncalf' for the fool by birth', "moony" for the 'unreal', 'moonshiner' for the illegal supplier of liquor'. I am offended by such coinages.

Indu : But such terms are there for good sense—'Over the moon' refers to extremely happy condition, 'moonfaced' for a radiant and beautiful and sedate face. We also use you in nomenclature eg. Sashi, Sashikala, Diptendu, Purnendu, Dibyendu, Ardhendu, Shirshendu, Bidhan chandra, Bimalendu, Sukhendu, Krishnendu etc. We composed Durga Dhyan Mantra with your name 'Jatajuta samajukta mardhendukritashekavam, lochanatraya sanjuktam purnendusad is asanam."..

Moon : Well, you are the fourth country to touch me, Neil Armstrong was the first man to taste my virgin rock. His words have gone into history— "One small step for man, one giant leap for mankind". China, France, Russia, Japan are all in the foray.

Indu : You should be proud that a developing country like India is now a member of the elite space club ISRO has ranked India among the world's top four nations.

Moon : It is the cause, it is the cause of my worst apprehension. All of these countries will be in a rat race for plundering my resources. I admire Milton's criticism of this tendency of becoming rich by destroying the benefactor's resources, "...with impious hands/Rifled the bowels of their mother earth/For treasures better hid...". Your Mammonism will be your nemesis. You have polluted the Earth in many ways. Global warming will melt the permafrost to cause the extinction of may lives. You have destroyed so many species of fauna and flora in the Amazon Forest fire. You call this rainforest the "lungs of the world". Just feel the pain of the Earth.

Indu : Chandrayaan-1 of 2008, Chandrayaan-2 of 2019 failed but we knew that these were 'novel failures' and not incompetence. And the present soft-landing has increased India's confidence in space research which was so long the monopoly of the rich and the white. Satellite will serve for India's agriculture, warfare, weather forecast, drought, flood etc. Rocket selling will have a boom. Interest in Rocket studies and Space Science will increase, along with an increase of the number of selenophiles.

Moon : And you will also introduce lunar Economics when there will be attempts for building colonies by many rich countries and violate Outerspace Treaty of 1967.

Indu : The UNO shall look into the matter.

Moon : But the Big Five shall have the final say. Morever India should give priority to solving the problems of poverty, health, illiteracy, superstition, unemployment, communalism etc. Your helpless condition at the times of Spanish flue, the world wars, plague, COVID-19 pained me. You can not conquer cancer, and you want to conquer Moon. You wont be able to have a sustainable development of space.

Indu : This achievement shall help stop brain-drain and improve DORDO (Defence Research and Development Organisation) and INSAT (Indian National Satellite System).

Moon : In stead of building silk road to me, build your earthly roads and improve your own agriculture and industry and the global ecology. Why are you going against Nature, the existing discipline of the Universe? Dont be too ambitions. Why don't you pay heed to Mary Shelley's message in Frankenstein, Hemingway's warning in The Old Man and the Sea, Herman Melville's attitude to Captain Ahab in Moby Dick? Did your Aryabhatta or his disciple Barahamihir, Copernicus or his follower Galileo teach you to colonise the celestial bodies?

Indu : Actually astronomical studies and exploration are closely related. We can not help it.

Moon : But cant you foresee how geopolitics and international relations are closely related to this race for the search of the minerals in my possession. Russia—Once India's close friend and now a bit isolated because of the war with Ukraine—is upset at India's success and its failure in soft-landing and is shaking hands with China in a bid to materialise its 2021 agreement for space research. A cold war between India and Russia-China is a natural consequence. The Artemis Agreement will benefit the USA, China, Japan and rich countries, and not India. These rich countries have already destroyed nature in their own countries. Now they want to destroy the space. It is sad that India the land of the Upanishads is a competitor in the race.

Indu : India wants to prove that we are not inferior to others. We shall develop our launchers, rovers and landers for the best performance in space exploration.

Moon : Do as you like, but I sense some danger in becoming the apple of discord among nations. Moreover, I am receding 3.8 cm every year from the Earth. So a time will come when the people of the Earth will no more see me with my 'silver sphere' and so sing ruefully "Chand Keno asena amar ghare" or see me as a "jhalsano ruti."

Indu : Actually India wants to cohabit and not coerce with you.

Moon : I'm not worried by ISRO or NASA, but by your ulterior purposes, and of anothr Big Bang.

The Downtown Cafe

Souvik Chakraborty

****

It's the downtown cafe, where we first met;
It might be like, that was our fate;
Your glistening eyes and glittering scent, made my little heart faint;
Never thought it could be love;
Who could believe love at first sight?
Till I found out at midnight, that;

I have fallen in love with you, the moment I first saw you;
I have fallen in love with you, the moment I smelled the scent of you;
Oh! I have fallen in love.

Now I regret, not asking you out for a date, silly me!
But it wasn't my fault, cause it's my first time,
Falling in love at first sight, I was too dumb to act.
I think it's not that late, to ask you out for a date;
Cause;

I have fallen in love with you, the moment I first saw you;
I have fallen in love with you, the moment I smelled the scent of you;
Oh! I have fallen in love.

You are now like the Sword of Damocles;
Whenever I try to fall asleep, you make me awake.
It makes me a little sad, cause I want to dream about you and me
Where I am the Dragon you are the Queen, flying high above the sea.
Oh, Silly me!
It's still hard for me to believe;
That I have fallen in love at first sight.

The Pole Star

Pritam Makhal.

****

In the middle of a sea,
Searching for a shore;
I, being lost for years two or three,
Losing hopes more and more.

I encountered a tempest,
Which diverted my path again;
Unaware of the East or West,
My ship's heading towards the vain.

T'was only then,
I met the Pole Star when
I found the North,
Where the shore must be lying forth.

I don't know my shore is how far,
Yet, I will always follow my Pole Star.

Night Sky

Ranita Chakraborty

****

Amongst the glittering chaos
There is peace in the darkness
There is hope of beauty,
In the night-light;
Maybe a little dim.
The shaking leaves of coconut tree
Don't know where to stop
And how to, in the stormy waves
A trivial mind looking for likable silence
Amidst the monotony.
When the sky can't tell nature's destiny
It can wrap the globe with grey of clouds
It can behold the memories of love
That made the soil wet,
Plethora of imaginative lines
Drawing pictures of the night sky.

The Death

Anamitra Ray

****

'Long live the King'
And then the King dies.
The King dies
The Kingdom remains.
Unlit;
The courtiers become strangers
The *prajas* unknown
No one to stand before the throne
No one to hold the sceptre.
The wind blows between the walls:
Await the new dawn
Let the King live in death
Let the King live in peace.

A monochromatic boy

Sahan Das

****

So many people are around me
But when I look at myself I am alone.
I have people to laugh with me, joke with me
but when I am alone in my room
Not a single eye to watch me
It suffocates me to death.

I stare and stare and stare.
The dull and boring ceiling never grows boring to look at
because it's everything I can freely stare at.
No one judges, No one to think If I am gloomy again.
I sit alone at my bench contemplating over nothing.
Always wearing a mask with people who are close with me.
But the question is, Am I really close with anyone?

The lively world shines with bright colours
Looking at myself I see a monochromatic boy
rotting on his death bed.
Staring at the ceiling, contemplating over so many things yet his brain is empty.
He thinks about so many things, Yet he does nothing.

Heart heavy like a rock,
unable to shade any tears.
My tear ducts might not be broken, but my heart is.
The colourful world of joy exhausts me
makes me jealous, when all I have is the shades of grey.
I try to squeeze the fake colours out of me,
struggle with the colour palette and paint over my grey world,
The rain would just destroy everything.

ALONE

Dr. Jayita Roy (Ghoshal)

Crossing the 80th milestone
After 65yrs of companionship
She is finally alone.
She had experienced "The partition"
As a mere 8 year old child;
Sent off to a new territory
Which she had to call her country form then onwards
To look after her two of the three elder brothers
Studying in college in a land called India.
No one gave the three" refugee" children
A proper place to dwell
Children who were used to living in grandeur and prestige
And why not-they were the children of an erstwhile advocate;
They took shelter in an ill designated place
The little girl tending the kitchen with limited resources
Till her mother could arrive with rest of the siblings in tow from East Pakistan.
She was alone, but never alone.

The brothers she took care of
Got jobs,
But they forgot their little sister who had cooked for them with tender hands,
To accede to a request of an extra sari during Durga Pujo
For in Bengal, thousands were still in pains in the refugee camps along the border.
She was married off to a school teacher
Who was destined to achieve greater heights-
Bore the stress and agony of the political unrest, turmoil in tumultuous 70s
Fleeing Political prisoners;
She learnt to differentiate between the gong patterns of prison
For her husband is now a law enforcer.
Traversing across districts of West Bengal
Learnt the ways of prisons, convicts and
In cases, convicts on good behavior were under her jurisdiction

As she was the Home Minister
Alone but not apparently alone.

Her immediate elder brother,
With whom she fought most and had the sibling comraderies at best
Never failed to show up and stand by her unspoken
In Bhai Dooj, daughters' marriage, family addas and occasions
And occasional sharing of a drink or two and movies
A die-hard fan of her traditional dishes
Chose to leave her also
Succumbing to cancer
Her childhood connection severed - with silver streaks in the mane the siblings sported.
Her childhood memories left her alone, but
How could she be alone -she still had other siblings with no visible ties.

At the last few years of companionship
She struggled with aches and pains
To keep up to her culinary skills
Her partner of six decades and half was slowly
Succumbing to inevitable fate.
As she bade final goodbye
One autumn evening
She felt restless at her singlehood
But she preferred to be ALONE
In her own solitude,
In the dwelling she called her own,
At eighth decade of her life -
She has to learn to live alone

বাবা হওয়া

কৃষ্ণা ব্যানার্জী

****

অলি কদিন ধরে চুপচাপ ঘরে শুয়ে বসে আছে, ওদের যৌথ পরিবারে অনেক লোক, অলির বাবারা তিন ভাই, ওর জেঠু সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, অবসর নেওয়ার পরে এখন লেখালেখি, বই নিয়ে থাকেন, তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি দেখার মত, জেঠু অলিকে খুব ভালবাসেন, সেই ছোটোবেলা থেকে জেঠুর কাছে পড়াশোনা করেছে অলি, জেঠুই তাকে শিখিয়েছে অঙ্ককে ভালবাসতে, এখন সে অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স-এ এমএসসি করছে। অলির বাবা খুব ব্যস্ত সার্জন, আর ছোটোকাকু চাটার্ড অ্যাকাউটেন্ট,কাকুর কাছে অলির যত বিদঘুটে বায়না। অলির চার বছর বয়সে ওর মা মারা যান, তারপরে অলি ওর সোনামা মানে জেঠিমার কাছে বড়ো হয়েছে, দুই জ্যাঠতুতো দাদা, ঋষি ও আর্য অলির সম্পর্কে খুব পজেসিভ, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কত যে মারামারি করেছে, তারা বোনের দিকে তাকিয়েছে বলে, কাকুর ছেলে ,ঋক হল অলির সবচেয়ে কাছের, অলি ছোটো ভাইকে বড্ড ভালবাসে। এতজনের মধ্যে বড়ো হয়েছে বলে অলি মার অভাব তেমন বোঝে নি, কিন্তু গত তিন বছর ধরে সোনামার অসুস্থতা অলিকে একটু অস্থির, অসহায় করে তুলেছে। দ্বিতীয় বার কি ও মাতৃহারা হবে!!

অলি শুয়ে আছে, চোখ দিয়ে জল ঝরেই যাচ্ছে, ছোটোমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে চোখ ঢেকে দম বন্ধ করে শুয়ে থাকল, অলি, অলিমা উঠে পড়, খেতে চল রাত হয়ে গেছে। চুপ করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বিছানায় পড়ে থাকল অলি। খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করে ছোটোমা চলে গেলেন। অলির জেঠু খাওয়ার টেবিলে জিজ্ঞেস করলেন, অলিমা কই? খেতে এল না?

অলির কাকিমা উত্তর দিলেন, ও ঘুমিয়ে পড়েছে, কত ডাকলাম,উঠল না।

মা, দিদিয়া কদিন ধরে কেমন চুপ করে আছে, ইউনিভার্সিটিও যায় নি দুদিন, ঘরেই আছে, আমি গেলাম সকালে, দিদিয়া কথা বলল না, ঋক বলে উঠল।

অলির কাকু চিন্তিত ভাবে বললেন, মেয়েটার শরীর ঠিক আছে তো? মেজদা কাল সকালে তুই একবার দেখিস।

অলির বাবা কিছু উত্তর দিলেন না, জেঠু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, এবার একটু মেয়েটার দিকে নজর দে, শোক আঁকড়ে মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে?

অলির বাবা চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়লেন। রাত বাড়লে বাবা গেলেন মেয়ের ঘরে, গালে জলের দাগ, কেমন অসহায়ের মতো গুটিয়ে মেয়ে শুয়ে আছে, রাস্তার আলোয় মেয়ের মুখ আবছা দেখা যাচ্ছে,মেয়ের মুখে একেবারে মায়ের মুখের আদল, কত বছর মেয়ের মুখের দিকে তাকান নি, স্ত্রীকে এতই ভালবাসতেন যে স্ত্রীর মৃত্যুর পরে মেয়েকে জীবন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন, পলকে চোখের সামনে ভেসে উঠল মেয়ের শৈশবের স্মৃতি, স্ত্রী-মেয়েকে নিয়ে সিমলা যাওয়া, মেয়ের প্রথম চিড়িয়াখানা দেখার উত্তেজনা, প্রথম হামা দেওয়া, প্রথম টলমল পায়ে হাঁটা, গান গেয়ে মায়ের মেয়েকে ঘুম পাড়ানো। মা-হারা মেয়ে আর বাবার কাছে আসতে পারে নি, বাবার চারপাশের শোকের বৃত্ত ভেদ করে মেয়ে আর বাবার মনে যেতে পারে নি।

বাবা অলির পাশে বসে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন, শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল, অলি চোখ খুলে দেখল, বাবা বসে আছে মাথার কাছে, অলির বুকটা যেন ভেঙে গেল, এই স্পর্শ ও শেষ কবে পেয়েছে,ওর মনে নেই, ওর এখন এই আদরের,ভরসার ছোঁয়ার বড়ো দরকার ছিল, অলি বাবার কোলে মুখ গুঁজে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, কাঁদতেই থাকল, অনেক কষ্টে অলির মুখ ধরে বললেন বাবা, কি হয়েছে মা? আমায় বল মা, কি হয়েছে তোর?

বাবার মুখে মা ডাক শুনে অলির চোখ ফেটে জল এল আবার। অনেক কষ্টে মেয়ের কান্না থামাল বাবা, অলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, ওর জীবনের প্রথম বিশ্বাসভঙ্গের কথা, দীপের ওকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। বাবা ওকে বোঝাল জীবনের কথা, বিচ্ছেদের কষ্ট, সত্যকে সহজে গ্রহণ করার মন্ত্র, বললেন, কীভাবে তিনি নিজে শোকে ডুবে জীবনের কতগুলো বছর নষ্ট করেছেন, মেয়ের বড়ো হয়ে উঠা দেখেনই নি, পরম স্নেহে মেয়েকে বোঝালেন, জীবনকে বয়ে যেতে দিতে হয় নিজের স্রোতে, আজকের দুঃখ ওর জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করবে,বাবা, মেয়ে বাকি রাতটুকু গল্প করে কাটিয়ে দিল, অলির নিজেকে বেশ ভারহীন লাগছিল, আর ওর বাবার মনে হচ্ছিল, রুগী, অপারেশন থিয়েটারের বাইরেও একটা সুন্দর জীবন কত বছর ধরে অপেক্ষা করেছিল।

বাইরে ভোরের আলো ফুটছে, নামি সার্জন ইন্দ্রাশীষ সেনের মনে হল,বাইশ বছর আগে এমনই এক ভোরে ও এক সন্তানের জন্মদাতা হয়েছিল,আজ ও সত্যিকারের বাবা হয়ে উঠল।

A

Well Wisher

Soumik Das

Chatterjeepara, Howrah

ডাঃ গজেন

মনমিতা নাথ

****

তার নাম একটা কিছু ছিল কিন্তু সবাই তাকে ডাঃ গজেন বলেই ক্ষ্যাপাত। সে ডাক্তার ছিল না, যতদূর জানি, তার নামও গজেন ছিল না তবু তাকে কেন সবাই ডাঃ গজেন বলত আর বললে কেনই বা সে পাগলা ষাঁড়ের মতো তেড়ে আসত তা অজানা।

আমি প্রথমদিকে তাকে ক্ষ্যাপানোর দলে ছিলুম না কিন্তু যেদিন পটলা তাকে ডাক্তার গজেন বলে দৌড়ল আর গজেন দৌড়ে এসে আমার চুলের ঝুঁটি ধরে পিঠে গুম গুম করে কয়েকটা কিল মেরে দিল, সেদিন থেকে আমি দলবদল করলুম।

অম্বরীশবাবু ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। ভীষণ রাগী আর রাশভারী, তো একদিন আমার মাঠে ঘুড়ি ওড়ানো দেখছি, দূরে ডাঃ গজেন রাস্তা দিয়ে আসছিল। একটু দূরে স্যারও ছিলেন আমরা দেখিনি। আমাদের মধ্যে থেকে কে একজন ডাঃ গজেন বলতেই চোখা চোখা গালাগাল শুরু হল। হেডস্যার 'কে রে' বলতেই আমরা পড়িমরি করে পগারপার। কিছুক্ষণ পর আমরা একটা দোকানে এসে ঘড়ি কিনছি, স্যার আর ডাঃ গজেন দোকানে এসে বসলেন। স্যার বলতে লাগলেন, 'কিচ্ছু ভাববেন না, কাল স্কুলে গিয়ে সবকটাকে এমন ধোলাই দেব, আর কোনোদিন বলবে না।'

কিছুক্ষণ পর চা খেতে খেতে স্যার বলে উঠলেন, 'তারপর, ডাঃ গজেন, এবছর চাষ কেমন হল?' ডাঃ গজেন অন্যমনস্কভাবে বলল, 'ভালো', তারপর সম্বিত ফিরতেই চোখ কটমট করে বলল, 'শালা, মাস্টার হয়েছ! সব শেয়ালের এক রা! সবকটা কলেরায় মরবি।'

ক্রমে ক্রমে আমাদের ক্ষ্যাপানোর ঠেলায় ডাঃ গজেনের চুল ছেঁড়ার অবস্থা, কেউ একজন তাকে যুক্তি দিল, 'ওর কাকাকে গিয়ে বলো, কড়া লোক, পিটিয়ে ওকে শায়েস্তা করে দেবে।'

একদিন সকালে কাকার কাছে পড়ছি, ডাঃ গজেন এসে হাজির।

—তোমার ভাইপো আমাকে ক্ষ্যাপায়। একদিন জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো।

—কি বলে ক্ষ্যাপায়?

—সে বলে একটা কথা।

—কী কথা?

—সে বলে একটা।

—কী মুশকিল, কি বলে সেটা বলতে হবে তো! ডাঃ গজেন আমাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে প্রস্থানোদ্যত হতেই পিছন থেকে কাকার কণ্ঠস্বর, 'ডাঃ গজেন, একটু চা খেয়ে যান।'

এরপর ডাঃ গজেনের কথামৃত আর ভারতনাট্যম।

ডাঃ গজেনের পরবর্তী গন্তব্যস্থল পঞ্চায়েত প্রধান। সবাই তাঁকে মানত। গজেন গিয়ে তার কাছে আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করল। পঞ্চায়েত প্রধান একদিন সব ছেলেকে ডেকে সতর্ক করে দিলেন। আর ডাঃ গজেনকে বললেন সে এরপর ছেলেরা ক্ষ্যাপালেই তার কাছে এসে যেন তিনি বলেন।

এই প্রসঙ্গে বলি যে শুধু ডাঃ গজেন নয়, রসগোল্লা, গোরুর গুঁতো এইসব বললেও সে সমানে রেগে যেত।

একদিন ছেলেরা মাঠে খেলছে, পাশের রাস্তা দিয়ে ডাঃ গজেন আসছে, একটু দূরে পঞ্চায়েত প্রধান সাহেব। ছেলেদের একজন বলে উঠলো 'রসগোল্লা', সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ গজেনের মন্ত্রপাঠ শুরু। পিছন থেকে প্রধান সাহেব বললেন, 'কি হল? কই, কেউ তো ডাঃ গজেন বলেনি।'

—'ওই সম্বন্ধির ব্যাটারা রসগোল্লা বললে।'

'এ যে দেখছি শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম! তা তুমি বাপু কী কী বললে রেগে যাও তার একটা লিস্ট আমার

কাছে পাঠাও। আমি আগে সেগুলো মুখস্থ করি, তারপর অপরাধী ধরতে বের হব।'

তবে একবার ঠ্যালায় পড়ে সে নিজের নাম ডাঃ গজেন বলে ফেলেছিল। সেবার রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় কয়েকটা কুকুর তাকে চারদিক থেকে তাড়া করতে সে উপায় না দেখে গিয়ে উঠেছিল এক জামরুল গাছে। নীচ থেকে 'কে ওপরে?' জিজ্ঞেস করতে ওপর থেকে উত্তর এসেছিল, 'আমি ডাঃ গজেন।'

পুজো এসে গেছে। মহাসপ্তমীর দিন বিচিত্রানুষ্ঠানের আগে কিছু দুঃস্থ ব্যক্তিকে বস্ত্র বিতরণ করা হবে। মাইকে নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। প্রধান অতিথি এম.এল.এ. সাহেব একে একে আগত ব্যক্তিদের বস্ত্র দান করছেন। সঞ্চালক একটা নাম বার বার ঘোষণা করার পর হঠাৎ মঞ্চে আসতে দেখা গেল ডাঃ গজেনকে। সে মঞ্চে উঠেই হু হু করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বাবুরা মাফ করবেন, আমার ছেলেকে শ্মশানে দাহ করে এখানে আসতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। বড্ড গরীব বাবু।'

সমস্ত দর্শকাসন তখন নীরবতায় শ্মশান, একটা হতভাগ্য লোকের এতদিনের চোখের আগুন আজ জল হয়ে বের হয়ে এল।

Space Donated by

Sri Pradip Kumar Sengupta

চক খড়ি

অরি

****

ছোটোবেলার প্রেম, আমি ভুলতে পারিনি বিহান, ভোলা কি যায়? তুমি বলো না, তুমি কি ভুলতে পেরেছ? হয় তো বা পেরেছ। সেটা অবশ্য জানার কথা ও নয় আমার। কত্ত দূরে থাকো তুমি। কোথায় যেনো একটা! হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। Manhattan না কি যেনো! তুমি বলেছিলে একবার। সেবার তুমি তোমার দুই ছেলেকে প্রথমবারের জন্য এনেছিলে এই পোড়া দেশে, আমার পরিচয় দিয়েছিলে আন্টি বলে। বলেছিলে, 'এই দেখো দরিয়া, কারা এসেছে তোমার সাথে দেখা করতে।' আমি তখন আমাদের ওই ঝুল বারান্দার দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে ছিলাম, উপর থেকে তোমাদের দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু সাড়া দিইনি। কি জানি কি আতঙ্ক আমার মনকে গ্রাস করেছিল সেদিন। মুখের শ্রী তো ছিল ভয়ঙ্কর,তাই হয় তো তোমার ছেলেদের সামনে মুখ দেখাতে আমার বিবেক দংশাচ্ছিল। কিন্তু তুমি যখন উচ্চ স্বরে 'দরিয়া' বলে ডেকে উঠেছিলে তোমার সে ডাক আমি উপেক্ষা করতে পারিনি, কেন জান? সেটা আমি নিজেও হয়তো জানি না, হয়তো ভেবেছিলাম এতদিন পর তুমি আমাকে সেই কথাটি বলবে, হ্যাঁ সেই কথাটি যেটা আমি তোমার মুখ থেকে একবার শুনতে চেয়েছি।।

পূর্ব ১

চিলেকোঠার ঘর থেকে তোমার কথোপকথন শুনেছিলাম তোমার বাবা মার সাথে, তুমি বলেছিলে তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তুমি নষ্ট করতে পারবে না আমার সাথে এত তাড়াতাড়ি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। কাকিমা তখন বলে উঠেছিল, 'কিন্তু ওদের যে কথা দেওয়া হয়ে গেছে, তা কি করে ফেরাবো বলতো? আজ বাদে কাল বিয়ে!' হয়তো উনি ও তখন ছেলের উজ্জল ভবিষ্যৎ এর স্বপ্নে এতটাই বিভোর ছিলেন, যে, কাউকে দেওয়া কথার থেকেও তাঁর নিজের ছেলের ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে বেশি দামি ঠেকেছিল। কিন্তু কাকু প্রতিবাদ করেছিলেন, হাজার হোক মানুষটা তো চিরটাকাল আদর্শবাদী। 'না রে দরিয়া মা র সাথে এতটা অন্যায় করিস না।' তুমি তখন ওনাকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলে। না আমি আর কিছু শুনিনি,শুনতে পারিনি, পৃথিবীটা বড়ো অন্ধকার ঠেকেছিল। ঘোর কাটল উল্টো দিকের বিপাশাদির বাড়ির শাঁখের আওয়াজে।

পশ্চিম ২

উত্তর কলকাতার এক সরু গলির মধ্যে পলেস্তরা খসা বাড়িটাতে আজ বড়ো আনন্দের দিন। এই বাড়ির একমাত্র মেয়ে দরিয়া মুখার্জির আজ বিয়ে। বিয়ে বাড়ি আনন্দ তো হবেই। কিন্তু তা হলেও আনন্দের মাত্রা বড়ো বেশি। কারণ তিন বছর আগে মেয়েটির প্রথম বিয়ের রাতে অনেক অপেক্ষার পরও বর আসেনি। পাড়ার মধ্যে আর কাউকে পাওয়া যায় নি যে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। অতঃপর। তাই আজ বর আসার খবর শুনে বাড়িতে সাজো সাজো রব। শুধু মুখে হাসি নেই মেয়েটির। কি জানি বাবা কলি কাল কার মনে যে কি চলে সেটা সেই জানে !

দক্ষিণ ৩

অনেক কষ্টের পর ওই ভেঙেচুরে যাওয়া গাড়িটার মধ্যে থেকে যখন দরিয়াকে বার করে আনা হয়েছিল তখন ওর দেহে প্রাণ থাকলেও, অনিরুদ্ধর দেহে কোনো প্রাণ ছিল না। দরিয়ার মুখের গঠন পুরো বিগড়ে গিয়েছিল। নানা প্লাস্টিক সার্জারি হয়েছিল, একবারই। তাতে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। মেয়ের ভাগ্যের এই ভীষণ পরিবর্তন সহ্য করতে পারেননি বাবা, চিরঘুমে তলিয়ে গেলেন তিনিও। সেই থেকেই একাকী জীবন।

উত্তর ৪

সেই ফেলে আসা দিনগুলি বড্ড বেশি মনে পড়ছে, বিহান। সেই দিনগুলোর মতো রাতের আকাশে তারারা কি আর জ্বলে? সেই, সেই যে তুমি শুনিয়েছিলে রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর,

"আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে....." সত্যি গো হৃদয় জুড়ে তুমি ছিলে আমার কিন্তু তোমার হৃদয়ে আমি কি সত্যি ছিলাম? তোমার মনে পড়ে কিনা জানি না, সেই কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায় দুজনে হাত ধরাধরি করে অনেকটা রাস্তা হেঁটেছিলাম আর তুমি কিনেছিলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নদীর ওপার'। আর আমি কিনেছিলাম Dale Carnegie, তুমি খুব হেসেছিলে আর বিদ্রুপ করে বলেছিলে, 'জীবনদর্শন সম্বন্ধে তোমার ধারণা এত মজবুত করলে কবে?' এতে ভবিষ্যতে নাকি এই বিহান ব্যানার্জির সমস্যা হবে। ভাগ্যিস মজবুত ছিল নাহলে ভাগ্যের সাথে লড়াই করতাম কেমন করে!

আজ দুপুরে তোমার কাকার ছেলে বিধানের মুখে তোমারমৃত্যু সংবাদ পেলাম।।ওদের মধ্যে অবশ্য কোনো শোকের ছায়া দেখলাম না। তোমার বড়ো ছেলে তাদের নাকি জানিয়েছে। একেই সকালে কাজের লোকটি না আসায় আমার দুর্ভোগের শেষ নেই। ইদানীং কালে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে বড়ো কষ্ট হয়, খুব হাঁপাই। বাড়ি সারাই করার লোকটি আজ আবার খুব বড়ো ফিরিস্তি শুনিয়ে গিয়েছে। অনিরুদ্ধর জমানো টাকাই আমার ভরসা, জীবনে তোমার মতো কিছু করতে তো পারলাম না। কিন্তু দুপুরে তোমার ঘটনাটি শোনার পর থেকে মনটা যেন কোনো এঁদো গলি ছাড়িয়ে চলে গেল সেই ঠিকানায়, যেখানে যাওয়ার কথা থাকলেও যাওয়া আমার হয়ে ওঠেনি। সময়ের খাদে পড়ে যাওয়া আমি, কি ভীষণ ভাবে কাতরাচ্ছি। বেরোবার পথ নেই জানো। নিলে না কেন আমাকে বিহান তোমার সাথে? এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু জানো তো ,আমি ভাবছি তুমি কি ভীষণ স্বার্থপর! পারলে আমাকে কালাপাহাড়ের সাজা দিতে আমি মাথা পেতে নিতাম।

জীবন থেকে আমি পাইনি কিছুই কিন্তু দিয়ে দিয়েছি অনেক কিছু, একটুও কার্পণ্য করিনি।কিন্তু জীবনদর্শনের যে মজবুত উপাখ্যান আমি কল্পনা করেছিলাম সেই ইচ্ছেটাই যখন ভেঙে দেওয়া হল, তখন সেই ভগ্ন ইচ্ছেটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে, আমি জীবনটাই কাটিয়ে দিলাম। অথচ তোমাকে দেখো একেই বলে! ষাট বছর কাটিয়েই দিলাম, রইলো পরে আর দশ। হ্যাঁ গো, সত্তরেই মরব আমি একটুও মিথ্যে নয়। মনে আছে, তুমি কুণ্ঠি পড়ে হেসেছিলে, বলেছিলে, 'তুমি না বিজ্ঞান পড়, এসব কখনো হয় নাকি?' বিজ্ঞান পড়ে আমি উদারমনা হয়েছি, প্রশ্ন করতে শিখেছি। কিন্তু তোমাকে প্রশ্ন করতে পারিনি, আমার বিজ্ঞান পড়ার অবমাননা। বিশ্বাস তো আমি অনেক কিছুই করতাম বিহান। 'আমাকে ক্ষমা করো'—এই কথাটা তুমি আমাকে বলবে এটাই বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু তুমি জীবন থেকে মুক্তি নিলে। আমাকে ফেলে রেখে দিলে অন্ধকুপে। বিহান, জীবনদর্শন আমার সত্যি মজবুত। না গো, আমি ভালো আছি।

আর ঠিক কতটা অপেক্ষা করতে হবে? আর ঠিক কতটা অপেক্ষা সহ্য করলে পৌঁছতে পারব তোমার কাছে? কি লাভ তোমার এত দূরে থেকে? আর পারছিনা আমি। ঝলসে যাচ্ছে সকল আশা, বাঁধ ভাঙছে শরীরের। শেষ হচ্ছে সহ্য এবং ধৈর্য ক্ষমতা। তোমার অপেক্ষায় শুকিয়ে গেছে সকল নদী, সবুজ হারিয়েছে জীবন। পাখির দল শয়ে শয়ে পড়ে আছে মাটিতে, হাজারে হাজারে পাখি দিশাহীন উড়ে চলেছে। কেউ ধাক্কা খাচ্ছে ল্যাম্পপোস্টে, কেউ আছড়ে পড়ছে ছাদের কার্নিশে। মৃতের পদযাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছে তোমার মস্তিষ্ক। গোটা রাস্তা ছেয়ে আছে তোমার মাথার সিঁদুরে যাতে একটাও লাশের পায়ে গরম ছ্যাঁকা না লাগে। তোমার শাড়ির আঁচল ছায়া দিচ্ছে লাশের শোভাযাত্রাকে। তাদের তৃষ্ণা যত প্রবল হচ্ছে তত তীব্র হচ্ছে আমার যন্ত্রণা। ওরা অপেক্ষা করে আছে আমার রক্ত দিয়ে তৃষ্ণা মেটাবে বলে। তুমি তো পারো বলো তোমার রূপ দিয়ে ওদের মোহিত করে রাখতে। ওই দেখো আমার মৃত্যুকামনা চলছে সর্বত্র। কোনোদিন আমার মা আমার মৃত্যুর জন্য কথা বলেনি সেখানে তোমার জন্য সমস্ত জগৎ আমাকে নির্মমভাবে নিধন হতে দেখতে চায়। এই কি তবে সেই আত্ম উপলব্ধি কাল! এই তার মানে মৃত্যু পূর্বের সন্ধিক্ষণ যেখানে সমস্ত জীবন সিনেমার সাদা কালো পর্দার মতো এক নিমিষে দেখা যায়! এই মুহূর্তই তার মানে অনুশোচনা করার সঠিক এবং শেষ মুহূর্ত! এই আমার কর্মফলের পরিণতির আগাম দৃশ্য!

চল্লিশ বছর আগের ভুলের পর অনেক সময় লেগেছিল ভুল বুঝতে। যখন বুঝলাম তখন তুমি নেই। আধ্যাত্মিক

হয়ে গেছিলাম পুরোপুরি, বুঝতে পারতাম তুমি অপেক্ষা করে আছো প্রতিশোধ নেওয়ার। এতদিন কেন নাওনি সেটাই ভাবছিলাম। ভগবান এবং তোমার কাছে মনে মনে সহস্রবার ক্ষমা চেয়েছিলাম।

আজ তবে সেই দিন এল, কিন্তু তুমি কে তাহলে? আমি তো জানতাম মৃত্যুতে হয় যম নয়তো ভগবানের দেখা মেলে। তুমি তাহলে কে? সেই? যাকে আমি সেই রাতে ধর্ষণ করেছিলাম নাকি তুমিই যম তুমিই ভগবান এই রূপে? তুমি যেই হও, যাই হোক তোমার আসল রূপ; যদি এই আমার পরিণতি হয় তবে এভাবেই এই যন্ত্রণা পেতে পেতেই যেন মৃত্যুবরণ করি আমি। আমার পরিণতি আগাম দেখে যে অবস্থায় ছিলাম তার থেকেও বেশি যেন ভয় ঢুকে যায় প্রতিটা ধর্ষকের মনে। তারাও যেন দেখতে পায় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের আড়ালে লুকিয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে বাঁচা গেলেও জীবনের পরম মুহূর্তে সেই বীভৎসতার সম্মুখীন তাকে হতেই হবে, বরণ করতেই হবে সকল নির্মমতা ঠিক আমার মতো। যতই সে আগামী জীবনে আমার মতো সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হয়ে উঠুক, যতই জনকল্যাণে নিয়োজিত হোক; অতীতের অন্যায়ের সাজা সুদসমেত তাকে গ্রহণ করতেই হবে। কোনও ছাড় নেই। আরও যেন নির্মম হয় সেই বেদনা। সে যেন মৃত্যুশয্যায় দেখতে পায় তাঁর মা বাবাও তাঁর এই নির্মম মৃত্যুকামনার অধিকারী। আমার নির্মম মৃত্যু লিখে দিয়ে যাক ধর্ষকদের বিভীষিকাময় ভবিষ্যতের রূপরেখা। নারীশরীর আর মন ঠিক যতটা সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনে ঠিক ততটাই নির্মম এবং ভয়ানক। আমার নৃশংস মৃত্যুর মধ্যে এই জগৎ শিখে নিক নিজের সীমার গন্ডি, প্রতিহত হোক বর্তমান ধর্ষকেরা, অচিরেই বিনাশ ঘটুক ভবিষ্যতের 'ধর্ষক' মানসিকতার।

হাসতে মানা

চিরন্তন মুখোপাধ্যায়

****

রাস্তাঘাটে কোনো সুন্দরী মহিলা যদি আপনার দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে কথা না বলে চলে যায় তবে কেমন লাগবে আপনার?—

ঠিক এমনই একটা ঘটনা কয়েকমাস আগে আমার জীবনে ঘটে গেল।

রোববারের বিকেল। ছুটির আমেজ। এই একদিনই একটু দিবানিদ্রার সুযোগ পাই। ঘুম থেকে উঠে র চা দিয়ে গলা ভিজিয়ে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে বেরিয়েছি। গঙ্গার ওপারে এক বন্ধুর বাড়িতে বসবে সান্ধ্য-মজলিশ। খানিক তাস পেটানো আর কিছুটা রাজা-উজির মারা — এই নিয়েই আমাদের রবিবাসরীয় আড্ডা। মোড়ের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে মৌজ করে দুটো টান মেরে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি ঘাটের দিকে। টিকিট কেটে জেটিতে দাঁড়াতেই একটা লঞ্চ এল। দুই বিপরীতমুখী জনস্রোত যখন এগিয়ে চলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ ঘটনাটা ঘটে গেল।

কিন্তু কে এই মহিলা? কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আগে কখনো দেখেছি বলেও মনে আসছে না। একেবারেই অপরিচিত যদি হয় তাহলে হাসল কেন? আমার চেহারা বা পোশাকে কোনও বেখাপ্পা ঘটে গেছে নাকি? নানা চিন্তা মাথায় এসে হাজির হল।

দেখতে-শুনতে তো আমি মন্দ নই। মাথায় চুল আছে। টাক পড়েনি, তবে পড়ব-পড়ব করছে। "মেঘে ঢাকা তারা" না কি যেন বলে লোকে! চোখ, নাক, মুখ, কান সবই তো ঠিকঠাক। চশমা একটা আছে বটে! সেটা কি বেঁকে গেছে নাকি? আসলে সেদিন দেখি ছেলে আমার চশমার ডাঁটির মাথাটা দিয়ে ওর এক খেলনার স্ক্রু টাইট দিচ্ছিল। চশমাটা হাতে নিয়ে খানিক উল্টেপাল্টে দেখলাম। নাঃ, তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো। তাহলে জামায় কিছু গণ্ডগোল করে ফেলেছি নাকি? অনেক সময় তাড়াহুড়োয় বোতামগুলো এলোমেলো লাগিয়ে ফেলি বটে! কিন্তু... আজ তো সব ঠিকই আছে। তাহলে কি প্যান্ট? আশপাশটা একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে তারপর নিজের নিম্নাঙ্গের দিকে তাকালাম। কিন্তু না, এখানেও তো কোনও গোলমাল দেখছি না। এতটুকু অসভ্যতার চিহ্ন নেই। জুতো অবধি ঝকঝক করছে। খুব বড়ো একটা নিশ্বাস ছেড়ে লঞ্চের একটা সিটে বসলাম। কিন্তু হাসি রহস্যের কারণ মাথায় ঘুরপাক খেতেই লাগল।

আচ্ছা, মুখে কি কিছু লেগে আছে?— দুপুরে খাওয়া বাসি ডালের শুকনো দাগ বা দ্বি-প্রাহরিক দুষ্টুমির কোনও লাল ছাপ? ধেৎ—কী যে ভাবছি! নিজের অজান্তেই একটু হেসে ফেললাম। অন্তত দ্বিতীয়টি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ, ঐ সিঁদুর এখন বছরে একদিনই বাড়িতে ঢোকে— বিজয়া দশমীর দিন। সেদিন তিনি শুধু কপালে নন, মাথা, গাল, গলা বেয়ে একেবারে সর্বাঙ্গের ভূষণ হন। আর বাকি ৩৬৪ দিন নেল পালিশের আলতো ছোঁয়ায় একটা হসন্তের দাগ পড়ে সদ্য জাগ্রত টাকে। আদর করে যাকে আমি বলি "টাক পালিশ"।

তবু মুখটা একবার দেখতে পারলে ভালো হত। কিন্তু আয়না এখন কোথায় পাই? মহিলাদের ব্যাগে থাকতে পারে। চাইব কি? এইসব ভাবতে ভাবতে সহযাত্রীদের দিকে তাকালাম। ভারি অদ্ভুত ব্যাপার — সবাই দেখি আমাকেই দেখছে! একটু ভয় পেয়ে গেলাম। অস্বাভাবিক লাগছে নাকি আমাকে? ওঃ, এইসময় জলপথে না থেকে যদি স্থলপথে থাকতাম, একটা আয়নার বন্দোবস্ত হয়ে যেত। নিদেনপক্ষে একটা সেলুনে অন্তত ঢুকে যেতাম। কিন্তু এই মাঝগঙ্গায় কী যে করি! হঠাৎ-ই মনে পড়ে গেল গত পরশুর এক ঘটনার কথা —

অটোয় বসে আছি, পেছনের সিটের মাঝখানে। আমার একপাশের সিট খালি। হা-পিত্যেশ করে বসে

বসে তিনজন যাত্রী ঘামছি। আরেকজন এলে ড্রাইভারবাবু সদয় হবেন। ঠিক তখনি এক মহিলা হন্তদন্ত হয়ে উঠে এসে আমার পাশটিতে বসলেন। শুধু বসলেন নয়, একেবারে চেপটে দিলেন। কপট-রাগ প্রকাশ করলেও মনে মনে ভাবলাম, যাক বাবা গাড়িটাতো অন্তত ছাড়ল! 'দুপাশে দুই কলাগাছ, মধ্যিখানে মহারাজ'— ছোটোবেলায় খেলতাম — মনে পড়ে গেল। যাই হোক, সেই মহারাজের এখন খুব করুণ অবস্থা। যতটা সম্ভব নিজেকে সংকুচিত করে বসে আছি। এবারে আসি আসল কথায়— যিনি উঠে এলেন তিনি কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। ব্যাগ থেকে একের পর এক প্রসাধনী সামগ্রী বার করছেন আর বাড়িতে অসমাপ্ত মেক-আপ অটোয় বসে সেরে নিচ্ছেন। ফলস্বরূপ সেন্টের ভাগ যেমন পাচ্ছি, কনুইয়ের গুঁতোও তেমনি খাচ্ছি। অটোটা যখন আমার গন্তব্যের কাছাকাছি এসেছে, আমি কোনোরকমে ঠ্যাং বেঁকিয়ে খুচরোটা বার করতে যাব, দেখি উনি মোবাইলে খচ করে একটা সেলফি তুললেন। তারপর আদ্যোপ্রান্ত নিজেকে খুঁটিয়ে দেখে মুখ টিপে একটু হাসলেন। মনে হল সন্তুষ্ট। এবার বোধহয় সেই ছবি আন্তর্জাল ব্যবস্থায় ত্রিভুবনে ছড়িয়ে পড়বে।

লঞ্চে বসে পকেট থেকে স্মার্টফোনটা বার করে সেদিনের শিক্ষার প্রয়োগটা নিজের ক্ষেত্রে করে ফেললাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও নিজের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না।

কেমন যেন অসহ্য লাগল। যে উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম সে একেবারে মাঠে মারা যাওয়ার জোগাড়। আড্ডায় গিয়ে মন বসল না। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলাম। গিন্নি একেবারে অবাক। অসময়ে অতিথি এলে যেমন হয় আর কি! তবে সত্যিকথাটা বেমালুম চেপে গেলাম।

রাতে শুয়ে আছি, ঘুম আসছে না। এপাশ ওপাশ। বারান্দায় গিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। আদৌ কি হেসেছিল না আমার চোখের ভুল? দেখেছি তো ভারি কয়েক মুহূর্ত। হয়তো অন্য কাউকে দেখে...

মনকে অনেক বোঝালাম, কিন্তু লাভ হলনা। বরং তাড়িয়ে বেড়াল। কী রহস্য ঐ হাসিতে! ব্যোমকেশবাবু কিংবা ফেলু মিত্তিরকে এমন একখান কেস দিলে দেখতাম ওঁরা কী করেন!

অমন উশখুশুনি ভাব নিয়েই কেটে গেল কয়েকটা দিন। সেদিন অফিসে ফার্স্ট আওয়ারে একটা জরুরি মিটিং ছিল। আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়েছি। বাস স্ট্যান্ডে যেতেই আবিষ্কার করলাম সেই মহিলাকে। হ্যাঁ এই তো সেই। সুন্দরী, সুবেশা, স্মার্ট। পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা সুন্দরকে শরীরে বেঁধে রাখতে জানেন। ইনি সেই ক্যাটাগরিতে পড়েন। আজ অবশ্য চোখে সানগ্লাস। তাও ভালো করে চেনার চেষ্টা করলাম— কোনও পূর্ব পরিচয় আছে কি না— মুখের আদলটা যেন কোথাও দেখা— কিন্তু এর বেশি কিছু মনে করতে পারলাম না। তাহলে কী বলে আলাপ করব? সেদিন আমাকে দেখে হেসে চলে গেলেন কেন?—

যাঃ! এটা আবার বলা যায় নাকি? অতঃ কিম!— এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে একটা বাস হুড়মুড় করে এসে হাজির হল, আর উনি উঠে চলে গেলেন। আমি ভ্যাবলার মতো বাসের পেছনটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঝাঁটা, জুতো আরও কত কী সব সেখানে ঝোলানো আছে। তারাও বাসের তালে তালে দুলতে দুলতে চলে গেল আর যাওয়ার সময় দাঁত বার করে যেন বলে গেল — দেখলে হবে, খরচা আছে!

পরপর সাতদিন ইচ্ছে করে আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু লাভ হলনা। আক্ষেপটা রয়েই গেল। শেষ দিনটায় যখন হাল ছেড়ে নিজের গন্তব্যের বাসে উঠছি ঠিক তখন স্বর্গত বাবা-মা'র কথা মনে পড়ল। কি দূরদর্শী মানুষ ছিলেন তাঁরা! ভাগ্যিস কাজটা সেরে গিয়েছিলেন! নইলে সারাজীবন কুমার হয়েই থাকতে হত।

দেখতে দেখতে বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে। আমি ওসব ঘটনা একরকম প্রায় ভুলেই গেছি। একদিন বাজারের ভেতরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। একটু তাড়া ছিল বলে মাথা নীচু করে বেশ জোরেই হাঁটছিলাম। উল্টোদিক থেকে এক মহিলা আসছেন সেটা লক্ষ করেছি। তাকে কাটাতে যাব — বিপত্তি। আমি ডানদিকে গেলে উনি সরে যান নিজের বাঁদিকে। আবার আমি যেই উল্টোদিকে ফিরি

উনিও চলে আসেন সেদিকে। পরপর দুবার ঘটনাটা ক্রমান্বয়ে ঘটে যাওয়ার পর আমি মধ্যবিন্দুতে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে পড়লাম —উনি আগে বেরিয়ে যান, তারপর আমি যাব — পুরুষোচিত ভদ্রতা। দেখি মহিলাও দাঁড়িয়ে আছেন। নড়েন না। একি চড়-টড় মারবে নাকি? ভরা বাজারে শ্লীলতাহানি করে ফেললাম নাকি? দুরুদুরু বুকে গালটাকে শক্ত করে মাথাটা আস্তে আস্তে তুললাম। দেখি সেই মহিলা এবং আবার হাসি। মুখে ধাক্কা সামলানোর তৃপ্তি এনে এবার ভালো করে চেনার চেষ্টা করলাম। গজদাঁতটা নজরে আসতেই বুকের কাছটা ছ্যাঁত করে উঠল —

আমার তখন গ্র্যাজুয়েশনের ফাইনাল ইয়ার। মেয়েটি সে বছর কলেজে এল। একেবারে আমাদের ডিপার্টমেন্টে। খুব বেশিদিন একসাথে কলেজে সাক্ষাৎ ঘটেনি। কিন্তু তার মধ্যেই দেখেছি কত সাংঘাতিক সব কাণ্ড। কত ছেলে ওর জন্যে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। আমাদের সুদীপতো ওর পেছনে ঘুরোঘুরি করে ফার্স্ট ক্লাসটা ধরে রাখতে পারল না। কলেজের ভেতর ছিল এক মস্ত পুকুর। ও যদি ওর বন্ধুদের সাথে ওখানে বসত, উল্টোদিকে দেবদাসেরা বসে পড়ত ছিপ নিয়ে। আমিও যে দেখিনি তা বলব না। কিন্তু নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে এত সম্যক জ্ঞান আমার ছিল যে আর এগোনোর চেষ্টা করিনি। ঐ হাই-হ্যালোতেই বেঁধে ফেলেছিলাম মধ্যবিত্ত স্বপ্নগুলোকে।

'মিত্রা না'— অস্ফুটে বলে ফেললাম।

— যাক তাহলে চিনতে পেরেছো! তুমি কেমন আছো?

—ভালো। তোমার খবর — এদিকে কী ব্যাপার?

—আমি তো উদয়ন পল্লীতে একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি। মা-বাবা সবাই গত হয়েছেন। ভাইয়ের সঙ্গে বনল না। তাই একাই থাকি। চাকরি করি। ব্যস, স্বাধীনভাবে আছি।

— বিয়ে-থা?

—করেছিলাম, কিন্তু ঠিক স্যুট করলো না। এসো না একদিন, কাছেই তো থাকি। তখন জমিয়ে গল্প করা যাবে।

বাজারের মধ্যে আমি আর কথা এগোলাম না। কলেজবেলার নানা সুখস্মৃতি মনকে কেমন যেন অবশ করে দিল। মিত্রাকে বিদায় দিয়ে আপনমনে একটু হেসে নিলাম। তারপরেই খেয়াল হল। কেউ আবার দেখেনি তো!

আজ আবার একটা রবিবার। যাচ্ছি মিত্রার ফ্ল্যাটে। একা থাকে, ডিভোর্সি। একসময়ের ডাকসাইটে সুন্দরী। দিভাও বলা যেতে পারে। তখন ওর হৃদয়ের দরজায় কত পুরুষ কড়া নেড়ে নেড়ে ফিরে গেছে। আর আজ মিত্রার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি চলেছি ওর বাড়ি। পাঠক হয়তো ভাবছেন, হাসির রহস্য নয় ভেদ হল, আবার কোনও ত্রিকোণ রহস্য তৈরি হবে নাকি? কিন্তু না। সেদিন যে যে কারণে নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করেছিলাম, আজও তার ইতর বিশেষ ফারাক ঘটেনি। তবে কোনও রিস্ক নিলাম না। মিত্রার ফ্ল্যাটে যাচ্ছি — একেবারে সপরিবারে।

এক, দুই, তিন

উমা ভাদুড়ী

****

লেখার শুরুতেই বলে রাখি এ কিন্তু কোনো একটি বা একাধিক বইয়ের সমালোচনা নয়। এমন সাফাই দেওয়ার কারণ চটজলদি মনে হতে পারে বই নিয়ে গুরুগম্ভীর কোনো আলোচনা এ লেখার উদ্দেশ্য। আসলে তেমন কিছু নয়, এ আসলে খুব সম্প্রতি হাতে-আসা কয়েকটি বই নিয়ে নাড়াচাড়া।

দেশে-বিদেশে অনেককেই বলতে শুনি, আগে এবং এখনও, যে তাঁরা ফরমায়েশি লেখা লেখেন না। কিন্তু ভেবে দেখলে একেবারে ব্যক্তিগত তাগিদ, তা সে নিছক অনুভূতি চালিত লেখাই হোক বা অনুশীলনসাধ্য, সবই কি ফরমায়েশি নয়? তাগিদও তো একধরনের ফরমায়েশ, সেও তো নিজের কাছে নিজের ইচ্ছাপ্রকাশের জোরালো অভিব্যক্তি—তাকে অন্য কী নাম দেব? নিশ্চয় করে বলতে পারব না। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে লেখার চেহারা দেওয়া, সেই তাগিদ তৈরি করা বড্ডো শক্ত। যে কোনো ভাষার এমন লেখা আর তার চালচিত্র সে কথাই প্রমাণ করে।

গত শতকের একেবারে শেষের দিকে এমনই একটা বই পড়েছিলাম—অ্যানি এরনোর (অবশ্যই ইংরেজি অনুবাদে) The Man's Place। সত্যি কথা বলতে কী, এখনো আমার মনে আছে—কেমন একটা দমবন্ধ করা কষ্ট হয়েছিল। একটি মেয়ে তার বাবার জীবনের কথা, মৃত্যুর কথা বলেছে। সম্পর্কের খোলা ভেঙে ভেঙে দেখিয়েছে। একটানা বলে চলার ভঙ্গিতে এগিয়ে তাকে জুড়ে দিয়েছে সমাজের সঙ্গে, যে সমাজ দেশ থেকে দেশান্তরে একটা নির্দিষ্ট কাঠামোয় ধরা। মনে আছে পড়ে ফেলার ছন্দে পড়ে ফেলা—সে ভাবে উপন্যাসটি শেষ করতে পারিনি। মেনে নিতে পারিনি এমন কিছু প্রসঙ্গও ছিল। সাধারণভাবে মেয়েদের কাছে পুরুষের প্রথম সংজ্ঞা নিয়ে বাবা-ই তো আসেন। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই হতে পারে। কিন্তু কালি কাগজের রিপোর্টিং তবু মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু অন্য কিছু, যাকে সাহিত্য, বলছি সেখানে? নয়-ই বা কেন? অন্য সবকিছুকে বাদ দিলেও তো 'ইলেকট্রা' থেকেই যায়। কিন্তু সেই হাহাকার তো নেই এখানে। জানি না, হয়তো মান্ধাতা আমলের পাঠ-সংস্কার থেকে বেরোতে পারিনি বলেই...। যাই হোক, এই লেখিকা সম্পর্কে আর আগ্রহী হইনি। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে অ্যানি আমার চোখ টানলেন ২০২২ সালের শেষের দিকে। তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘটনায়। সবসময় সুখানুভূতির অভিজ্ঞতাই যে মনকে উদ্‌গ্রীব করে না তা আবারও দেখলাম। অ্যানিকে কিন্তু আমি ভুলি নি। তাঁর ভাবনার প্রায় কিছুতেই শরিক হতে পারিনি, তবু খোঁজ লাগালাম তাঁর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস Getting Lost-এর। ছিপছিপে মেদহীন এই বইটিও শেষ করতে সময় লাগল কিছুটা। এটিও অ্যানির অভিজ্ঞতার ফসল। ফ্রান্সে রাশিয়ান দূতাবাসের কোনো ব্যুরোক্র্যাটের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার কাহিনি। ডায়েরির আকারে লেখা। চমকে যাওয়ার মত টুকরো কথন—যেন হীরে মণিমুক্তো ছড়ানো। আধুনিক সভ্যতার সেই বহুমূল্য শিক্ষা—কোনো সম্পর্কই সম্পূর্ণ নয়, দীর্ঘমেয়াদীও নয়। শিক্ষা হল। কিন্তু কেন জানি মনে হল তারিফ আর তৃপ্তি দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

বহু আলোচনা অথচ নিজের অভিজ্ঞতাকে তার সঙ্গে মেলাতে না পারার দ্বিধা নিয়ে যখন রীতিমত বিব্রত তখন হাতে এল 'নানা রঙের নবনীতা'। একেবারে সাম্প্রতিককালের প্রকাশনা নয়। লেখকের মৃত্যুর কয়েকদিনের মধ্যেই প্রকাশিত (২০১৯ সালের শেষের দিকে)। পাঁচমিশেলি লেখা—উপন্যাস থেকে নাটক স্মৃতিকথা থেকে ভ্রমণকাহিনি। ঝরঝরে লেখা—যাকে বলছিলাম পড়ার ছন্দে পড়ে ফেলা। অ্যানি আর নবনীতা

সমসাময়িক, দুজনেই অধ্যাপক, কেউই স্বঘোষিত নারীবাদী নন। নবনীতা এই শহরের হলেও তাঁর আন্তর্জাতিকতা নিয়ে নিশ্চয়ই কেউ প্রশ্ন তুলবেন না। তবু সব প্রশ্নে তিনি এত পরিচিত ঠেকেন কেন? মাতৃভাষার এত মাহাত্ম্য? অথবা একই দেশজ সংস্কারের শরিক বলে? বাৎসল্য, শ্রদ্ধা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা—এইসব শব্দগুলো নিজেদের মতো করে বুনে নিয়েছি বলে? অমর্ত্যের (অবশ্যই অমর্ত্য সেন) সঙ্গে নিজের দূরত্ব, বিচ্ছেদকে নবনীতা যে মাত্রা দিয়েছেন তা কি একটু আলগোছ করে দেখানো? যথেষ্ট আটপৌরে নয়? তাই কি ঋতুপর্ণের (ঘোষ) নারীত্বের আকুলতাকে যুক্তিতর্কের দাঁড়িপাল্লায় না মেপে স্নেহ-প্রশ্রয় দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন? আশ্রয় দিয়েছেন?

নবনীতার বইতেই কল্যাণী দত্তের থোড়-বড়ি-খাড়ার কথা পেলাম। এর আগে কল্যাণীর খাড়া-থোড়-বড়ি পড়েছিলাম। খুব ভালো লেগেছিল। থোড়-বড়ি-খাড়া তার থেকেও বেশি ভালো লাগল। খুব সহজে গত শতকে এমন কী তার-ও আগের শতকে পৌঁছে গেলাম। পেলাম এমন কয়েকজনকে যাঁরা লেখক যে হননি সে নেহাত-ই পারিপার্শ্বিকতার ষড়যন্ত্রে। কল্যাণীর দুটো বই-ই—যাকে বলে চেটেপুটে পড়া, সেরকমভাবেই পড়ে ফেলা যায়। বাড়বাড়ির তক্তপোশ থেকে অন্দরমহলের খড়খড়ি—কল্যাণীর দৃষ্টি গেছে সর্বত্র আর এই দৃষ্টিতে মাখানো রয়েছে একরাশ মায়া। বস্তুতান্ত্রিক বর্ণনাও যে এত উপাদেয় হতে পারে কল্যাণী দত্তের লেখা না পড়লে বিশ্বাস হয় না।

এ লেখার প্রতিপাদ্য কিছু নেই। তিনজন লেখককে যে জড়ো করেছি তাঁরা যে সবাই মহিলা তা-ও নেহাতই ঘটনার সমাপতন।

চাউমিন

অন্বেষা চ্যাটার্জী

****

(মিমির মা)

মেয়ে : বাপি, ও বাপি কোথায় যাচ্ছ?

বাবা : এই যে, মুদিখানার বাজার করতে, তো তোর জন্য চাউমিন আনব, করে খাওয়াবি?

মেয়ে : আচ্ছা সবসময় আমায় কেন বলো, মা কে তো বলতে পারো।

বাবা : তোর মা তো সবই রান্না করে, তোর হাতে করা চাউমিন খুব-ই ভালো, আর তেলও কম হয়। যা আমার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো বয়স হচ্ছে তো।

মেয়ে : আচ্ছা! আচ্ছা! ঠিক আছে করে খাওয়াব এমন বলছ যেন করে খাওয়াই না!?

বাবা : আরে! আমিও তো এমনিই বললাম।

(দাদুন) শোন দেরি হয়ে যাচ্ছে দেরি হয়ে যাচ্ছে এখন না গেলে রাত হয়ে যাবে ফিরতে আর সন্ধ্যেবেলা জানিস তো ভিড় হয়।

মেয়ে : হ্যাঁ! কাছাকাছি তো একটাই বড়ো দোকান তাই হয়, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো একসাথে খেতে বসবো, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভালো লাগে না।

বাবা : আচ্ছা ভুলেই গেলাম, ব্যাগটা দে।

মেয়ে : এই নাও। মা... বাপি বেরোচ্ছে।

মা : ঠিক আছে তাড়াতাড়ি ফিরো।

(দিদুন) যা গেটের কাছে দাঁড়া, আমি রান্নাঘরে।

মেয়ে : যাচ্ছি! যাচ্ছি! জান তো আমি যাই, বলার কি আছে?

মিমি : মা! ওমা! দাও।

মা/মেয়ে : হ্যাঁ! কিছু বলছিস?

মিমি : হ্যাঁ দেবে তো চাউমিন টা।

মেয়ে/মা : ওঃ দিতেই ভুলে গেছি। এই নে।

মিমি : কি ভাবছিলে মা?

মেয়ে/মা : কিছু না।

মিমি : বলো না, আমি তো বড়ো হয়েছি, তুমি চাউমিন বানাতে গেলেই কেমন, কীসব ভাবতে থাকো।

মেয়ে/মা : তেমন কিছুই না (কান্নাস্বরে)

মিমির বাবা : মা কে জ্বালিও না।

মিমি : তুমি বলো না বাবা কী হয়েছে মা-এর?

মিমির বাবা : তোমার দাদুনও চাউমিন খেতে খুব ভালোবাসত কিন্তু একদিন এই চাউমিন আনতে গিয়ে রাস্তায় একসিডেন্ট হয়।

মিমি : ও সিট্! আমি মাকে জিজ্ঞেস না করলেই ভালো হত।

মিমি : এখন ২৫ বছরের আর রেস্টুরেন্টের মালিক। তার রেস্টুরেন্টের চাউমিন এখন famous. আর রেন্টুরেন্টের নাম দাদুনের নামে।

বর্তমানের আলোকে নজরুল : এক সাধারণ পাঠকের অনুভূতি

প্রবীর বাগচী

****

আজ এক অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা পথ চলছি - ব্যক্তিজীবনের তো বটেই, সামাজিক জীবনেও। অন্ধকার বলাটা যদি তর্কের খাতিরে অতিরঞ্জিত হয়ও, দুঃসময় বলাটা বোধকরি বিন্দুমাত্র অতিকথন হবেনা। তাই বারবার করেই আমাদের ফেলে আসা সমাজজীবনের অতিমানব চরিত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, অকাল নিদাঘে দগ্ধ হতে হতে ছায়া খুঁজতে হয় সেই জীবনের ব্যাপ্তির মাঝে। শিক্ষা নিতে হয়।

বিদ্বানেরা বলেন জগতে মানুষ একমাত্র হাতিয়ার উৎপাদনকারী জীব। এমন কথাও কেউ কেউ বলেন যে মানুষই কেবল মাত্র আত্মঘাতী হতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেছেন মানুষই একমাত্র জীব যে হাসতে পারে। সমাজতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ড, অস্তিত্ববাদী দার্শনিক লেখক আলব্যের কাম্যু, ঔপন্যাসিক লেখক আর্থার কোয়েসলার উল্লিখিত এমন সব মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে মানুষই শিল্পসৃষ্টি বা তার থেকে উদ্ভুত নান্দনিক সুখ অনুভব করতে সক্ষম। শব্দও তো একধরনের শিল্প। মানুষ যেমন রঙে, রেখায় আপন মাধুরী মিশিয়ে তৈরি করে ছবি, ছেনি হাতুড়ির ঘায়ে ভাস্কর্যের রূপ দেয়, তেমনই সমাজ জীবনের থেকে সৃষ্ট শব্দকে আত্মস্থ করে স্রষ্টা মানুষ সৃষ্টি করে বিভিন্ন রূপকল্পের, জন্ম দেয় সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের, বিবিধ ফর্মের ও সর্বোপরি চেতনার।

মরমিয়া কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন ' সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' তবে আধুনিক বিবর্তিত সাহিত্যবোধ বলছে কেউ কেউ কবি নয়, সকলেই কবি। বাস্তব এটাই যে পৃথিবীতে যেহেতু শব্দ শিল্পের মাধ্যমে মানুষের আবেগের নিঃসরণ ঘটে, প্রাত্যহিক দিনযাপনের মর্মবস্তু উন্মোচিত হয় তেমনই শব্দের মাধ্যমেই অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর প্রকাশ ঘটে চলে অবিরত। কিছু ব্যক্তি, সমাজ—জীবন বা ঘটে চলা ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে যাঁরা সক্রিয় মতামত দিয়ে থাকেন, তাদেরকে আমরা কেতাবি ভাষায় ইন্টেলেকচুয়াল বলি। ইতালির প্রখ্যাত কমিউনিস্ট ইন্টেলেকচুয়াল আন্তোনিও গ্রামসি কিন্তু বিশ্বাস করতেন সমস্ত মানুষই বুদ্ধিজীবী। মেধা বা বুদ্ধি ছাড়া কি কোনও মানুষ বাস্তবে হয় নাকি! তা সে যে শ্রেণিভুক্ত মানুষই হোক না কেন, সে তো মেধা দিয়েই জীবনচর্চায় নিজেকে যুক্ত করে। যদিও গ্রামসি বলতেন যে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা নিজের স্বার্থেই প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিভিত্তিক যাপন কুশলীদের সৃষ্টি করে। পাঠশালার গুরুমশাই, টোলের পণ্ডিত থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মায় লেখককুল পর্যন্ত প্রথাগত বুদ্ধিজীবী বা ট্র্যাডিশনাল ইন্টেলেকচুয়ালদের গড়ে তোলে। এরই পাশাপাশি বহতা নদীর মতো যুগে যুগে প্রগতিশীল মানুষেরা অন্ত্যজ শ্রেণির মুখপাত্র হয়ে উঠেছেন। সমস্ত প্রতিকূলতা, অত্যাচার সহ্য করেও জীবনযুদ্ধের লড়াইয়ের প্রকৃত সাথী হয়ে ওঠেন তাঁরা। সমাজজীবনের প্রতিটি কর্মকান্ডকে সততই প্রগতিশীল করে তোলার আন্দোলনের জৈব মনন রূপে তারা প্রতিভাত হন, সমস্ত কষ্টকে সহ্য করেই। আধুনিক সাহিত্য বিশ্লেষণের ভাষায় এঁরা অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। প্রত্যেক বুদ্ধিজীবী তার নিজের আহরিত শব্দের মধ্যে দিয়ে তার শিল্পকথনকে প্রকাশিত করেন, প্রত্যেকের নিজস্ব শৈলীতে। কিন্তু সকলেই প্রগতিশীল হয়ে ওঠেনা। প্রগতির দৃষ্টিভঙ্গির চর্চায় কর্মে ও কথায় সামাজিক সত্যের সঙ্গে অন্তহীন অন্তরঙ্গতায় যারা যাপনের মর্মবস্তুকে গ্রন্থিত করে পথ চলার বৃত্তান্ত রচনা করেন, তাঁরা যদি কবি হন—তাহলে তাঁরা অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল কবি। কাজী নজরুল ইসলাম তেমনই একজন কবি।

সাধারণত কবিরা কিছুকাল পর হারিয়ে যান, মহাকবিদের স্থান হয় পাঠ্যপুস্তকে, ছাপার অক্ষরে। পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমসংখ্যক শব্দশিল্পী আছেন যাঁদের লেখা একশো-দুশো বছর বাদেও মানুষ আগ্রহ নিয়ে পড়ে, অনুধাবনের চেষ্টা করে বা তার রসে সঞ্জীবিত হয়। বা তাঁদের সাদায়-কালোয় দিকনির্দেশের অভিমুখে সমাজজীবন আন্দোলিত হয়, জনগণমন উদ্বেলিত হয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে প্রথম স্থান বোধ করি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চির অধিকার স্বীকৃত। তার পরেই থাকবেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই দুই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করলাম তাঁদের সাহিত্যকর্মের নিরিখে। নয়তো বোধ করি ভারতীয় নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ মনীষা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর স্থান সর্বোচ্চ শিখরে, আজও অমলিন দীপ্তিতে ভাস্বর।

যাই হোক, যে কথার অবতারণা করার জন্য এতগুলো কথা বলা, তা হল শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও, বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও বা যারপরনাই লজ্জার হলেও একটা কথা কঠোর সত্য যে এ হেন নজরুল ইসলামের মতো স্বভাবকবির জীবন সম্পর্কে তথাকথিত শিক্ষিত স্বঘোষিত ইন্টেলেকচুয়াল, বর্তমান বাঙালি শুধুমাত্র অজ্ঞ নয় উদাসীনও। যে জীবনসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পলে পলে নিজের জীবনকে গড়ে তুলে এক অনন্য উচ্চতায় নিজেকে মেলে ধরেছিলেন, তার খবরও আমরা কজন রাখি! বাংলা ভাষার ভাষিক সত্তার যে প্রকাশ আমরা দেখেছি তার লেখার মধ্যে, তা নিছক কিছু আরবি বা ফারসি ভাষার সংযোজন নয়, এ বিশ্লেষণের খবরই বা আমরা কজন রাখি! এমনকি নজরুলের অসংখ্য হিন্দি বা উর্দু গানের যে সম্ভার, তার হদিশ কিন্তু সংস্কৃতির তথাকথিত রক্ষকরা মনে রাখেননি শুধু না বরং বলা ভালো বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। কাজী নজরুলের জীবনের সক্রিয় সময়টুকুর মধ্যে অসংখ্য ভাবের গান রচনা, গীত রচনা, মিশ্র রাগের সৃষ্টি ও ব্যবহার, বাংলা ভাষার মার্শাল সং বা রণ সঙ্গীত সহ সঙ্গীতের জগতে তার অনায়াস পদচারণা, অবিভক্ত বাংলার শুধু নয় ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলকে ঋদ্ধ করেছে।

আমরা যদি একটু পিছন ফিরে তাকাই তাহলে দেখব যে সেই সময়কালে বা পূর্ববর্তী সময় থেকেই বাংলার মুসলমান পরিবারে জন্ম নেওয়া কবি, বাউল বা সংস্কৃতির ভিন্ন আঙিনায় পদার্পণ করা অধিকাংশ জনই সুফি সম্প্রদায়ের। চিরকালই এঁরা সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ঈশ্বর বা খোদাকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন তাদের আপন সহজিয়া ভঙ্গিমায়। অষ্টাদশ শতকে এই সুফি কবিরাই রোমান্টিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। এবং এই আশ্রয় ব্যক্তি মানসের গণ্ডি ছাড়িয়ে সামাজিক জীবনচর্চায় আপন নিয়মে স্থান করে নিয়েছিল অনায়াসে। পূর্ববর্তী কবিদের সাহিত্য অনুবাদ বাংলা সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ বুনেছিল। এই প্রসঙ্গে লায়লা - মজনু, ইউসুফ - জুলেখা বা পদ্মাবতীর মতো হিন্দি সাহিত্যের উল্লেখ আমরা করতেই পারি। আলাওল বা সাগীর খানের মতো কবিদের পাশাপাশি বাংলার গ্রামে, শহরে সৃষ্টি হত অজস্র লোককাহিনী, কিসসা এমনকি বহু অচেনা সাধারণের মনের আখ্যানে ধারাকে পুষ্ট করেছে। এই কাহিনীগুলো মূলত ধর্মনিরপেক্ষ ও অ্যান্থ্রোপসেন্টিক মানবকাহিনী। এরই ধারাবাহিকতায় নজরুলের আবির্ভাব কিন্তু একটা ছেদ ঘটিয়ে, যুগোপযোগী করে। বাংলা সাহিত্যের গোটা আকাশ ছেয়ে-থাকা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি চিন্তার ভিত্তি যদি উপনিষদ ও পাশ্চাত্যের রোমান্টিকতা হয় তাহলে নজরুলকে আমরা খুঁজে পাব সুফি ধর্ম ও বাঙালির লোককাহিনীর মানবমুখিনতায়। বিশিষ্ট প্রাজ্ঞ - অধ্যাপক তরুণ সান্যাল সখেদে বলেছিলেন যে 'রবীন্দ্রনাথ যদি আসমানদারির প্রতীক হন বাংলা চিন্তা জগতের, তাহলে নিশ্চিত ভাবেই নজরুল জমিনদারির। অধিকাংশ ইন্টেলেকচুয়ালই যাঁরা নিছক জ্ঞানের আলোতে বিশ্বচরাচরকে দেখতে চান তাঁরা মাটি থেকে মাটির ভিন্ন বীজপত্রকে অনুধাবন করে উঠতে পারেন না। অথচ আকাশ ও মাটির এই অন্তরঙ্গতাই কিন্তু বাঙালির সহজ স্বাভাবিক মানবিক চেতনা।'

আসলে সমস্ত ভাষাই কিন্তু আদতে এক। প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য ও সামাজিক গঠনের বিন্যাস তাকে একে ওপরের থেকে আলাদা করে। কোনো মানুষের বেড়ে ওঠার স্থানের ওপর প্রকৃতির জলরাশি কখনও দরিয়া, কারোর

কাছে রিভার বা নদী হয়ে ওঠে। আসলে নোয়াম চমস্কি কবিতার ক্ষেত্রে বাল্যকালকে ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রতিটি শব্দের শিকড় থাকে, তার শাখাপ্রশাখা থাকে। শব্দ শেখার আগে বস্তুত কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা নিয়ে মানবশিশুর অবস্থান। সকালের আলোআঁধারিতে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙা, কুসুম রঙের লাল গোলকের রাঙানো অবস্থান থেকে শুরু করে নাগরিক জীবনের শব্দময় গতিকে অনুধাবন করতে করতেই দুপুরের আকাশে ওই গোলাকার বস্তু অগ্নিগোলকের চেহারা নিয়েছে। ব্যস্ত জীবনের অজস্র কাজের পথ বেয়ে পড়ন্ত বেলার সেই আগুনের গোলা ধীরে ধীরে নিভছে। সামাজিক অবস্থান তাকে শেখাল যে ওই অগ্নিগোলকের নাম সূর্য। সামাজিক সূর্যের সঙ্গে তোমার আগুনের গোলাকৃতি বস্তুটি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। ধীরে পরিচিত হতে থাকে বিভিন্ন শব্দের। এর মধ্যে ভাষার এক অদ্ভুত রুট ডেভলপমেন্ট হতে থাকে। সমাজ তোমাকে তখন তার ভাষাগত অবস্থানকে চিনাতে শুরু করে। কবিতার, গানের ভাষাও তো সামাজিক ভাষা। কবির কাছে যখন শব্দ আহরিত হতে থাকে মননে, অর্গানিক পোয়েট-এর উপলব্ধিতে, মনের মাধুরীতে তা সামাজিক বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়। যেমন করে শিশুকালের পাঠশালা থেকে লেটো গানের দলের সাহচর্য, রুটির দোকানের কারিগর জীবনের ঘর্মাক্ত শ্রমের পথ বেয়ে সমর দপ্তরে নাম লিখিয়ে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধের অকুতোভয় গোলন্দাজ, গান গাওয়া নজরুলের মননে ঘটেছিল। আসলে সামাজিক ভাষাকে আহরণ করে কবি আবার তাকে সমাজের সার্বজনীন করে ফিরিয়ে দেন। আর সমাজবদ্ধ জীবনের নানা এক্সপ্রেশন, প্রতীক বা উপমার মাধ্যমে চিত্রকল্প তৈরি করে কবি সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলেন। অজানা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেন মানুষের সামনে, অর্থাৎ যে সত্য পাঠক এতদিন জানতেন না তার অবসান ঘটল। এই নিগেশন অফ নিগেশন ঐ কবিতার অন্তর্গত সত্যের অনুভব। যে দেশ যত এগিয়েছে সে সব দেশে তারুণ্যকে স্পর্শ করেছে কবিতা শিল্প গান ভাস্কর্য চিত্রকলা। আসলে সমাজ নামের মাটির যাবতীয় পুষ্টির উপকরণ এই বোধের চর্চা। এই বোধ তোমাকে, তোমার সমাজকে জারিত করবে, চালিত করবে নতুন সত্যের পথে। কবিদের কাজ পাঠকদের উন্নীত করা নতুন বোধে আর এই নবজাগরণই সমাজকে নতুন রূপে বিকশিত করে। রবীন্দ্র নজরুল চর্চা যখন আমাদের দেশে স্বাভাবিক ছিল আমাদের যুবকযুবতীরা দেশ ও সমাজ বদলাবার জন্য অর্গানিক বুদ্ধিজীবী হচ্ছিল। তারপর ভারতীয় বুর্জোয়ারা যখন শুধুমাত্র উপাসনার গান ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথাটুকু দিয়ে মানুষের আকাশ মাটি ছোঁয়ার ইচ্ছে বন্ধ করে দিতে চাইল। ওই নিগেশান অফ নিগেশানে সমাজকে খুলে ধরতে দিল না। তাই আজ ভীষণভাবে প্রয়োজন নজরুল চর্চার।

আমরা আগেই বলেছি যে বাল্য-কৈশোর সময়ে পরিবেশ থেকে শব্দ গ্রহণ ও জীবনচারণার যে কোনো সফল কবির কাব্য জীবনের অভিমুখ হয়ে ওঠে। আসানসোল মহকুমার কয়লাখনি অঞ্চলে রুক্ষ চুরুলিয়ায় বাণিজ্য ও পণ্য পুঁজির আধিপত্য ছিল। সে অঞ্চলে শিশু শ্রমিকের কাজ সেখানে ছিল স্বাভাবিক। বাবা মারা যাওয়ার পর দুখু মিয়া মাত্র দশ বছর বয়সে মক্তবে আরবি ও বাংলা অক্ষর শিখিয়েছেন ছাত্রদের, মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের বিনিময়ে। এরই ফাঁকে পড়ছেন, পড়াশোনা করেছেন বিভিন্ন বিদ্যায়তনে। ওই অঞ্চলে ছিল বিশেষ ধরনের পুরুষ গীতিনাট্য লেটো গান—কিছুটা ঝুমুরের সুর, কিছুটা পুরুলিয়ার মুখোশ ছাড়া ছৌ আর কিছুটা ব্যঙ্গ ছিল এই ধরনের গানের বিষয়। লেটো গানের দলের প্রধান গোদা কবি নজরুলকে ডাকতেন 'ব্যাঙাচি' বলে। নজরুলের কাব্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তিনি বলতেন ব্যাঙাচি একদিন জাত সাপ হবে। সেই জাত সাপই পরবর্তীকালে 'বিষের বাঁশি' লিখেছিলেন। শোনা যায় নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা কোনো একটি আহত পাখিকে নিয়ে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক তরুণ সান্যাল বলছেন 'উদারপন্থী সুফী ঘরানায় হিন্দু-মুসলমান সাঁওতাল মদেশীয় প্রভৃতি বিষয় সমদর্শন, কয়লা কুঠির বিদেশি শাসকদের বিষয়ে মনোভঙ্গি, লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা, শ্রমভিত্তিক জীবিকা অর্জনে মজুর হবার দৃষ্টিভঙ্গি, বণিক পুজির ঠিকাদারদের আচরণ বিষয়ে ঘৃণা ইত্যাদি সবকিছুই আত্মস্থ হয়েছিল তাঁর।' আর ছিল

নবজাগরণের ধারাবাহিকতায় সংস্কৃতিবান, উদারমনা বাঙালি মননের বিপ্লববাদের আগুন। যা তীব্র করেছিল রাশিয়ার ঐতিহাসিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

সেনাবাহিনীর পরিযায়ী জীবনের অভিজ্ঞতা, সেখান থেকে আহরিত অসংখ্য স্মৃতি, রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসা সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিবরণ, মধ্যপ্রাচ্যে, আজারবাইজান, ইরানের উত্তর সীমান্তে রুশ বিপ্লবের প্রভাব—এ সব কিছুই রোমান্টিক নজরুলকে আন্দোলিত করেছিল। যার স্পর্শ আমরা পাই 'ব্যথার দান' কাহিনীতে। নজরুল তখন শুধু কবি নন, হয়েছেন কাহিনীকারও। এই কবি 'রোমান্টিক স্বপ্নময়, সমাজের বৈষম্য দূরীকরণে আগ্রহী, প্রেমিক এবং শব্দগ্রন্থনায় সরললোককবিত্বময়'—যে সংস্কৃতবহুল বাংলা ভাষার larger than life size চরিত্র মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের লেখনীর সামনে কথ্য প্রচলিত ভাষাকে বাঙালিকৃত আরবি, ফারসি, তুর্কি, উর্দু শব্দের সমাহারে স্থাপন করেছিলেন নতুন রূপে। সমাজবিজ্ঞানের আতস কাচের নিচে ফেললে যেমন সমাজজীবনের উচ্চ ও নিম্নবর্গের মধ্যে যে বিযুক্তি দেখা যায়, তাকে বিমুক্ত করার প্রচেষ্টা দেখা যায় বিভিন্ন রচনায়।

বোধ করি কেবলমাত্র নজরুলের পক্ষেই সম্ভব ছিল কালী কীর্তন রচনা, মোহাম্মদী গান বা ছেলের নাম কৃষ্ণ মোহাম্মদ রাখা। শ্রমজীবী জনগণের সাথী, নারী - পুরুষের ভেদাভেদ মুক্ত মনন আর প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক চেতনায় ঋদ্ধ বোধ থেকে সামাজিক ও সংস্কৃতির প্রতিটি প্রগতিশীল পদক্ষেপের সাথী হওয়াই চির বিদ্রোহী এই কবির জৈবিক ধর্ম। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপসহীন যোদ্ধা। সংগ্রামী মানুষের সাথী হয়ে 'communist International' এর প্রথম অনুবাদ এই মহামানবের আরেক গৌরবোজ্জ্বল সৃষ্টি।

বাঙালির সংস্কৃতি চর্চায় তার আবির্ভাব ধূমকেতুর মতোই। তথ্যের সংখ্যা না বাড়িয়ে একটা ঘটনার উল্লেখ করে শেষের দিকে যাওয়া যাক। ১৯২২ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বর 'ধূমকেতু'-র পূজাসংখ্যা 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটির জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে এক বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। দীর্ঘ অনশন করেছিলেন জেলখানায়। এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার সাথে নিজেকে বিলীন করেছিলেন। উদ্দাম ঝড়ের মতো নজরুলের কবিতা তখন তরুণ প্রাণে আলোড়ন জাগাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের হলেও একট সত্য আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে সঠিক পথ দেখানোর মানুষের অনুপস্থিতি নজরুলকে কিছুটা হলেও চালনা করল রেকর্ড কোম্পানির গীতিকার হওয়ার দিকে। সেখানেও তিনি চূড়ান্ত সফল। প্রায় একই সময় বাঙালির আধুনিক কবিতার সূত্রপাত। সমর সেন, বিষ্ণু দে প্রমুখ আধুনিক প্রগতিশীল সাহিত্যের মুখ হচ্ছেন পাশাপাশি অদ্ভুত ভাবে হারিয়ে যেতে লাগল কাদা মাটির গন্ধ মাখা নিম্নবর্গীয় মানুষদের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর। হারিয়ে যেতে লাগল বাঙালি সমাজের স্তরের মানুষের ভাষা, ছন্দের মেলবন্ধনে নজরুল সৃষ্ট লোকঘরানার। ক্ষয় হতে লাগল বাঙালি সিভিল সোসাইটির এক অনন্য প্রতিভার।

কাজী নজরুল ইসলাম এর নামটুকু উচ্চারণ করলে একটা বিশেষ যুগের কথা আমাদের স্মরণ করায়, যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণ - জুলুম - অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জারিত ছিল মনুষ্যত্বের ধর্মে। মানুষের পরিচয় চেনা যেত নামে - নয়, মানুষ নামের প্রকৃত পরিচয়ে। মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্যাদাবোধকে অন্যতর মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র - নজরুলের লেখনী। সে উত্তরাধিকার আমরা হারাতে বসেছি। আজকের দিনে নজরুল চর্চা তাই মানুষের মুখ দেখবার সাধনা ও অঙ্গীকার এর শপথ বাকিটুকু শুধু নির্বাক আর নিস্তব্ধতার ইতিহাস।

মাত্র তেইশ বছরের সৃষ্টি মুখরতায় অজস্র কবিতা, গান, গীত আর লেখার সম্ভার নিয়ে যে ধারা সৃষ্ট হয়েছিল তার পথ পরিক্রমায় অকাল মৃত্যু ঘটল। স্বতোৎসারিত সাহিত্য হয়ে পড়ল দল বা সংবাদপত্রের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত শব্দশিল্প।

Where the Dreams Cross: T.S. Eliot and French Poetry. Chinmoy Guha. Primus Books. Pp. 227. Reprint Edition 2020. ISBN: 978-81-947560-0-2. New Delhi.

Subhasis Chattopadhyay

****

Chinmoy Guha refers to Stephen Spender "when he [Spender] says unwittingly" of one of Eliot's poems, The Lovesong of J Alfred Prufrock, that Prufrock "suffers" (emphasis Spender's) and "is in a Baudelairian hell" (96). As unwittingly, that is, without intention, when Spender writes on Prufrock being in a Symbolist hell, Guha without intending to be, has become an Indian voice in systematic theology and many of his observations in this book under review demand Lenten readings. We knew about Baudelaire and his flamboyant short life. But how many of us know of Baudelaire's spirituality? Guha writes that Baudelaire had a profound understanding "of Original Sin" (92). It is another matter that, as Guha points out, Eliot too shared this Baudelairian sense of Original Sin (92). Before reading this book, the reviewer was aware of Eliot's self-confessed Christianity, but there exists no work where Baudelaire's views on spirituality have been connected to Eliot's poetry and criticism. Guha's genius unearths for us a new Baudelaire and a new Eliot. Who would have thought before Guha researched Eliot that Baudelaire took a dim view of Victor Hugo being opaque to spirituality? In fact, Guha's Baudelaire is not a picaresque avant garde, he is a young man searching for the numinous. "In a life of misery and wretchedness", Baudelaire was tortured by his "sense of Sin and Redemption" (92). Guha backs up his assertion by reading Baudelaire himself. Guha quotes Baudelaire:

...my whole heart, all my tenderness all my religion (travesty), all my hate. It is true that I shall write the opposite, that I shall swear by all my gods that this is a book of pure art, of antics, of jugglery...(Baudelaire quoted and translated by Guha, 85-86)

Yet Guha rightly notes that "with the possible exception of Dante" few poets "expressed the whole range of human emotions…in such a ruthlessly uncompromising manner" (86) effecting a redefinition of "the moral position of a poet in a world of suffering" (86). Guha, taking the cue from Rimbaud goes on to foreground the vatic or, prophetic role of Baudelaire. Had Guha written only this much about Baudelaire and Victor Hugo and Eliot, he would have accomplished something rich and strange, to quote Shakespeare. The leitmotifs of suffering and loneliness (acedia, mentioned by Guha while quoting Eliot in p. 89, italics' Eliot's) mark Guha's works and especially this book which is not a monograph but a theological contribution to India's rich legacy of Hindus engaging with Christianity. The length of the book is well beyond a standard monograph's. This needs being noted since it has been elsewhere erroneously termed a monograph. In Prabuddha Bharata, while reviewing Guha's

book on Tagore, this reviewer had pointed out how he is a theologian in the line of the late Catholic priest Raimundo Panikkar. As will be shown in a moment, Guha's book arrived just at the right time when Eliot scholarship is under existential threat from insufficient and desacralized exegesis in our country. Eliot is taught and studied through purely materialist hermeneutics and studied out of context in our classrooms. Let us now turn to Guha to examine how he interprets Eliot.

"... The Waste Land...asserts the necessity of Christianity" (89), earlier in the same page, Guha writes that Eliot was convinced that Baudelaire's "sense of Evil implies the sense of Good". Guha has even unearthed Eliot's conviction of Baudelaire's theological innocence (89). Classrooms globally miss this point about both Baudelaire and Eliot and harp on Baudelaire's Byronic exploits and Eliot's personal life without considering both their intellectual and spiritual foundations. Only Guha can write of their "aesthetics of suffering" (Guha quotes and translates Eliot, 89). This is a book about the Passion of the Christ mimetically represented in the works of the French Symbolists and T.S. Eliot. Once Julia Kristeva gave a Lenten talk to the College of Cardinals, though she is known for her insights into psychoanalysis and feminism. Guha deserves to be known as a theologian in his own right. Further textual references from his book will support this contention.

In Chapter 5, Claudel and Eliot: In Search of the Still Point, Guha quoting A.H.

A.H. Moody, points out that the Christian zeitgeist pervaded Claudel's poems and poetic dramas (168). This chapter is unique within Eliot studies. By Guha's own admission (169), Claudel was not connected with Eliot studies earlier, and it is to be added, that without Guha's cultural intervention we would have never known this. In a review limited in scope it is impossible to speak further on Claudel and Eliot here and their shared Christian consciousness. It suffices to just point out that Guha writes of "Claudel's light of Christianity" as leading Eliot to that peace which only the Risen Lord can give to us in this valley of tears (172). Then comes the real clincher. Guha negotiates the Catholic theologian, Jacques Maritain's influence on Eliot. It is from Maritain's insights that Eliot's writings became "also a diary of a soul" (173). Guha comments on the poem Ash-Wednesday and without perhaps realising it, on the real Ash-Wednesday, that Eliot celebrates, to quote Claudel," the immense Octave of ...creation" (173). Writing of Maritain's understanding of Roman Catholicism and his importance to Eliot, Guha meditates: Maritain comprehends the anguish of the time as true Catholicism (176). In this sense Maritain, and Eliot being an acolyte of Maritain become proto-liberation theologians since both heard the anguish of their times. They were Christians who would be aghast to be thought of as anything else. In his Introduction, Guha sets to define what is meant by tradition to Eliot. It is not merely a literary continuum which quickened Eliot, but a definite Catholic and Christian sensibility which took hold of Eliot and thus Guha writes in the beginning of the book that an "intensely Catholic" tradition deriving from the French Symbolists overwhelmed Eliot (19).

Fr. Clooney is a Jesuit who specialises in Hinduism. Chinmoy Guha is a polyglot Hindu who would himself probably reject the fact he is a theologian. This Sahitya Academy winner and litterateur is also an Indian Christian theologian who remains Hindu and in the best Catholic sense, has insights into the Roman Catholic Faith found in no other Eliot critic. It is high time we study Guha's works as treatises of what Hans Küng calls the kerygma of the Lord.

Spirituality: An Examination in the Light of Sri Aurobindo's Insights

Minakshi Pramanick

****

There are many myths about spiritual personalities and great yogis in India. One of them is that since whatever he or she does from a divine consciousness, it will be perfect, flawless, great, or a work of genius or world-class. The other myth is that he or she will be some kind of an omniscient demi-god who can know everything under the sun, solve all problems or answer all questions. These beliefs are not entirely myths. There may be a grain of truth in it but mixed with popular misconceptions. Let us briefly examine these truths and myths.

Spiritual consciousness or spiritual development need not necessarily lead to high creative quality in outer work or action because this outer quality depends also on the condition of the instruments or faculties of consciousness. A great yogi living in the highest spiritual consciousness may write poetry. But if his poetic or aesthetic qualities are underdeveloped, the outer aesthetic quality may not be great or even mediocre; it can never reach the level of great poets like Shelley or Shakespeare with a highly developed poetic faculties. It may have a subtle spiritual beauty or a great mantric power but the outer aesthetic quality may not reach the levels of Shakespeare.

Kalidas and Kabirdas are two interesting examples. Kalidas is a vital man without much of spiritual inspiration. But his literary creation rises to the highest levels of aesthetic and poetic beauty because he had a vital inspiration with very well-developed poetic and aesthetic faculties. On the other hand Kabirdas lived in the highest spiritual consciousness undreamed of by Kalidas. His dohas are made of simple and rustic verses which in terms of poetic beauty may not match the works of Kalidas. But some of Kabir's dohas, even in a translation, creates a tumult in the depth of your heart and a yearning for the Infinite, like for example this one: "When I walk, Infinite walks with me, within me, above me, around me and beside me, like my bodyguard."

Similarly a Yogi may have many higher faculties of knowledge which an ordinary man or non-yogi does not have. He may have the higher cognitive abilities to know the deeper truth of mind, life, matter, spirit through a direct insight, inner vision or an identity with the object of knowledge, which may include scientific truth. As the Mother of Sri Aurobindo Ashram explains:

"… the Yogi's knowledge is direct and immediate… he looks, has the vision of things and this seeing is his knowledge", or "He knows by his capacity for containing or dynamic identity with things persons or forces". But not everyone who calls himself or regarded as a "Yogi" possesses this knowledge. There are many types of yogis with various levels of inner realisation. In general, a Yogi who lives in the higher ranges of consciousness beyond the rational mind has potentially the capacity to know the deeper truth of things, if he wants to. But he may not

be interested in becoming an encyclopedia of knowledge. He may know or want to know only those things which are needed to execute his spiritual mission or comes to him spontaneously in the course of his spiritual journey or he may have the intuitive knowledge to answer the questions of spiritual seekers or to help them resolve their inner difficulties or guide them in their growth. A true yogi has no desire for mental knowledge. He doesn't have the acquisitive curiosity of the ordinary intellect seeking for a variety of information or knowledge. So as the Mother elaborates further on the knowledge of a Yogi.

Although it may be true in a general way and in a certain sense that a Yogi can know all things and can answer all questions from his own field of vision and consciousness, yet it does not follow that there are no questions whatever of any kind to which he would not or could not answer. A Yogi who has the direct knowledge, the knowledge of the true truth of things, would not care or perhaps would find it difficult to answer questions that belong entirely to the domain of human mental constructions. It may be, he could not or would not wish to solve problems and difficulties you might put to him which touch only the illusion of things and their appearances. The working of his knowledge is not in the mind. If you put him some silly mental query of that character, he probably would not answer. The very common conception that you can put any ignorant question to him as to some super-schoolmaster or demand from him any kind of information past, present or future and that he is bound to answer, is a foolish idea. It is as inept as the expectation from the spiritual man of feats and miracles that would satisfy the vulgar external mind and leave it gaping with wonder. (CWM, Vol.3, Pg. 92-93)

For example, a yogi may have a deep spiritual insight into the unified theory of matter so much sought after in modern physics. He can perhaps even see the truth of it with his inner vision, as concretely as we see the table in front of us with our physical eyes. But he may not be interested in this kind of knowledge and therefore may not talk or write about it. He may not have the scientific or mathematical equipment to express it in the right scientific language which will bring him the Nobel Prize.

If a scientist grappling with this problem asks the yogi to help him to resolve the problem he may throw some vague or luminous hints but may not entirely reveal the secret. He may think it was not his business, dharma, to do so because it interferes with the natural course of evolution or, dharma, of science or the scientist, which is to arrive at the solution through the process of rational and scientific enquiry.

Swami Ramalingam was a great Yogi who lived in a small village in an Indian state. He writes in one of his poetic works that he saw how atoms are formed in subtle space. A modern scientist may spend his whole life to discover it but for Ramalingam it may be something insignificant which deserves only a few minutes of passing inner glance. He moves on to greater things. He describes briefly the higher vital and mental world, many mansions of the spiritual worlds and as he reaches the summits of the creation he says that he saw how all the billions of universes and the many levels of creation are formed from a tiny particle of energy dropping from the legs of the Divine Dancer, Nataraja.

This is probably one of the reasons why in ancient India, physical sciences never advanced beyond a certain level. The best minds turned to Yoga and sought the Infinite where are all worlds appear like ephemeral bubbles in a little corner of its timeless vastness. For them spending one's whole life in trying to find out

what the atoms or molecules of matter are made up of, might have appeared as a trivial pursuit.

Mother said in one of the conversations, while talking about people possessed by dark forces - *"But note, this happens to ambitious people, above all to ambitious people who want to have power, want to dominate others, want to be great masters, great instructors, want to perform miracles, have extraordinary powers… it is to these that this happens most often… those who have a kind of ambition, here, turning in their mind. This is dangerous. It is so good to be simple, simply good-willed, to do the best one can, and in the best way possible; not to build anything very considerable but only to aspire for progress, for light, a peace full of goodwill, and let That which knows in the world decide for you what you will become, and what you will have to do. One no longer has any cares, and one is perfectly happy!"* (The Mother, CWM, Vol.6, Pg.248)

This brings us to an important factor of the spiritual quest. The aim of spiritual life is to realise our true self or Divinity within and creativity or greatness are not part of this spiritual aim but a secondary result. Spiritual development may lead to creativity or greatness when it expresses itself in the outer life. But to be creative or great is not the aim of spiritual life. In fact this desire for personal greatness is a vital ambition which is a great obstacle to spiritual growth and sometimes may lead the seeker astray into the hands of dark, asuric forces, which may make use of this ambition to drive and possess the seeker. On the other hand a simple, humble and sincere mind and heart, free from personal ambition is a great force for inner progress.

“Whispers of Santiniketan”

Sahan Das.

****

In the sonajhuri village of Santiniketan, nestled amidst the rolling hills of West Bengal, there lived a young man named Arjun. At twenty years old, Arjun was on the cusp of adulthood, yet his heart bore the weight of an unanswerable question that had haunted him since childhood: Who was he, truly, beneath the masks he wore for the world?

Santiniketan was a place where tradition and modernity intermingled, and Arjun’s family, like many others in the village, clung to the customs of their ancestors while embracing the opportunities of the changing world. His father, Ramesh, was a revered elder, known for his captivating storytelling skills, while his mother, Meera, was celebrated for her intricate embroidery work. But a yearning for something more profound than the daily grind gnawed at their souls.

One evening, as the crimson sun dipped below the horizon, casting an ethereal glow over Santiniketan, Arjun returned home from university to discover his parents engaged in an unusual and animated discussion. Such conversations were a rarity, as they usually reserved their dreams for their hearts.

“Arjun,” his father began, his voice filled with determination, “your mother and I have been contemplating our own unfulfilled dreams. Just as you pursue literature with fervor, I have a tale to tell, and your mother has a passion for fashion. We wish to follow our hearts.”

With a smile, Meera added, “Your father’s gift for storytelling and my love for textiles could breathe life into new dreams.”

With a shared conviction, Ramesh disclosed that he had secretly penned a novel for years, inspired by Santiniketan’s rich folklore. Meera had honed her fashion design skills in silence. They decided to close their pottery and embroidery businesses to embark on this new chapter of their lives.

Arjun was taken aback by his parents’ audacious resolve. Their pursuit of genuine passion resonated with his own quest for self-identity through literature. Their leap of faith broadened Arjun’s horizons, revealing boundless possibilities.

As Arjun continued his literature studies, his parents dived into their newfound vocations. Ramesh’s novel, which drew from Santiniketan’s tales and traditions, began to take shape. Meera, with her keen sense of style, opened a boutique showcasing her fusion of traditional Indian fabrics and modern aesthetics.

Arjun found himself drawn into his family’s creative journey, weaving elements of their experiences and newfound identities into his writing. His stories evolved into a vivid tapestry, interweaving the village’s customs, his family’s aspirations, and his quest for self-discovery.

Years passed, and Santiniketan bore witness to a profound metamorphosis. Ramesh’s novel became a bestseller,

capturing the essence of their culture and the universal theme of identity. Meera's boutique transformed into a hub for fashion enthusiasts, offering a unique blend of tradition and innovation.

Arjun's stories, enriched by his family's experiences and wisdom, gained international acclaim. His words resonated with readers from diverse backgrounds, reminding them of their shared human journey in search of identity.

But Santiniketan's transformation didn't stop there. As the village embraced its newfound fame, it attracted new characters into its fold. Among them was Professor Sanjay, an archaeologist drawn to Santiniketan by its rich history. He unearthed ancient artifacts that shed light on the village's past, captivating the world with tales of dynasties that once ruled these hills.

Then there was Maya, a talented musician who had traveled the world but found solace in the serene landscapes of Santiniketan. Her haunting melodies, inspired by the village's natural beauty, drew artists and dreamers from far and wide.

The most enigmatic newcomer was Vikram, a scientist who established a research center in Santiniketan to study the unique flora and fauna of the region. His work led to the discovery of a rare and mysterious flower known as the "Santiniketan Sapphire," said to bloom only once in a generation, with petals that held the secrets to unlocking the human mind's potential.

These characters, each with their own dreams and aspirations, became integral to Santiniketan's evolving narrative. Their interactions, relationships, and shared pursuit of excellence wove a tapestry of intrigue and wonder that captivated the world.

But amid this prosperity and transformation, a shadow loomed on the horizon. A series of mysterious events began to unfold in Santiniketan. Ancient relics vanished, Maya's haunting melodies took on an eerie quality, and the Santiniketan Sapphire was rumored to possess mystical powers.

Arjun, fueled by his insatiable curiosity and a desire to protect his village's heritage, found himself embroiled in a thrilling mystery that stretched back centuries. As he delved deeper into the enigma, he unearthed secrets buried beneath the layers of time, secrets that challenged everything he knew about Santiniketan and his own identity.

The tale of Santiniketan became a complex narrative of passion, mystery, and self-discovery, a testament to the enduring power of following one's true calling, the importance of supporting each other's dreams, and the profound connection between literature, art, and the human soul.

And as the world watched in rapt attention, Santiniketan transformed not only into a beacon of inspiration but also into a living testament to the indomitable spirit of its people, who dared to chase their dreams, no matter how elusive they may seem.

Amid the burgeoning excitement and intrigue, relationships flourished in the village. Arjun found a kindred spirit in Maya, the gifted musician, and their bond deepened as they collaborated on projects that merged literature and music. Meanwhile, Professor Sanjay's archaeological discoveries continued to unearth hidden facets of Santiniketan's history, shedding light on the enigmatic past of the region.

Vikram, the scientist, discovered that the Santiniketan Sapphire, with its mesmerizing

petals, had unique properties. It was believed to enhance cognitive abilities and unlock hidden potential within the human mind. This revelation sparked a fervor among scientists and researchers worldwide, leading to Santiniketan becoming a hub of intellectual discourse and innovation.

As Santiniketan's fame grew, the village's landscape transformed. Modern amenities and infrastructure emerged, juxtaposed with the timeless beauty of the hills. Tourism flourished, bringing visitors from across the globe, eager to experience the enchantment of Santiniketan and perhaps catch a glimpse of the elusive Santiniketan Sapphire in bloom.

Santiniketan's festivals and cultural events became renowned spectacles, drawing artists, performers, and scholars from far and wide. The village's annual storytelling festival, inspired by Ramesh's tales, attracted storytellers from every corner of India, celebrating the power of narratives to connect people.

The Santiniketan Symphony, a collaboration between Maya and a renowned composer, showcased the village's natural beauty and its resonance in the world of music. The captivating melodies echoed through the hills, leaving a lasting impression on all who heard them.

But amidst the grandeur and acclaim, a sense of foreboding lingered. The mysterious occurrences in Santiniketan continued, deepening the enigma. Ancient manuscripts containing cryptic symbols were discovered, hinting at

MAGIC AND RELIGION

[ANTHROPOLOGY OF RELIGION]

Soumi Mondal

****

Most cultures of the world have religious beliefs that Supernatural Powers can be compelled, or at least influenced, to act in certain ways for good or evail purpose by using ritual formulas. This formulas are in a sense, magic. By performing certain magical acts in a particular way, crops might be improved, game herds replenished illness cured or avoided, animals and peoples made fertile. This is very different from television and stage "magic" that depends on slight of hand tricks and castrired illusions rather than supernatural power.

For those who believes that magic is an effective method for causing supernatural actions, there are two major ways in which this commonly believed to occur sympathy and contagion. Sympathetic magic is based on a principle that "like produce like". For instance, whatever happens to an image of someone will also happen to them. This is the basis use of voodoodolls in the folk tradition of Haiti. If someone sticks a pin into the stomach of the doll, the person of whom it is a likeness will be expected to experience a simultaneous pain in his on her stomach. Sympathetic magic is also referred to as imitative magic. Contagious magic is based on the princple that thing or person once in contact an afterward influence each other. In other words, it is be believed that there is a permanent relationship between an individual any part of his or her body. As a consequence, believes most take special precautions with their hair, fingernails, teeeth, clothes and faces. If anyone obtained these objects, magic could be performed on them which would cause the person they came from to be affected.

In a belief system that uses magic as the most logic explanation for illness, accidents and other unexpected occurance, there is no rom for natural causes and chance. Witchcraft provides the explanation—it can be cause for most effects. since it can be practiced in secrect, the existance of witchcraft can not be easily refuted with arguments. Magic practiced in secrect by someone who wants to harm you is the answer. The only responsable questions are who performed the magic and why? The answer of these questions come through divination which is a magical procedure by which the cause of a particular event or the future is determined.

In societies in which magic and witchcraft are accepted as realities, mental illness is usually explained supernatural beings and force.

Animals In Mythology

Sayan Mukherjee

****

Animals are an important part of mythology. Since the beginning of human history, people have lived in close contact with animals usually as hunters and farmers and have developed myths and legends. All kinds of creatures from fierce to timid ones are an important part of mythology. Almost every mythology contain descriptions of animals who are either incarnations of the gods, a form that the gods took for some time or in possession of supreme divine powers. They are mostly legendary, mythological and supernatural creatures also called a fabulous creature or a fabulous beast. They are generally hybrid, sometimes part human whose existence has not or cannot be proved and that is described in folklore but also in historical accounts before history became a science. A myth can give special meaning or extraordinary qualities to common animals such as fish and bear. However other creatures found in myths such as many headed monsters, dragons and unicorns never existed in the real world. Animals are also sometimes portrayed as forms of the gods or representation of natural phenomenon. Sometimes their purpose is to protect the world and bring peace and prosperity and end disasters and sometimes their purpose is to bring absolute destruction to this beautiful world

The first and foremost animals we find in Indian mythology are the animal incarnations of Lord Vishnu. In his first incarnation, Vishnu takes the form of a fish to protect Vaivasvata Manu (the human) from a great flood and grant him knowledge to restart life on earth. It represent great rainfall and devastating floods were very common for young earth and land developed gradually after ocean and that earth's crust was uneven allowing land and ocean to coexist with a very unstable weather. His second avatar was the Kurma. During samudra manthan (ocean stirring) Lord Vishnu took the Kurma form and supported mount mandara on his shell so that the samudra manthan can proceed smoothly and uninterrupted. His third incarnation was the boar incarnation when an evil demon called Hiranyaksha gained near invincibility from the boon of Brahma and hid the earth beneath the cosmic oceans. All life on earth was about to be obliterated. At this point Lord Vishnu took the form of a boar and not only pulled the earth out of the ocean but also obliterated the evil demon Hiranyaksha. The fourth animal avatar of Lord Vishnu is lord Narsimha or man-lion. To slay the evil demon Hiranyakashypu (brother of Hiranyaksha) and protect his devotee Prahlad and the rest of the world Lord Vishnu took the Narsimha avatars. Since no man or beast or god or demon can kill him, the Lord took a form which was neither god, nor beast , man or demon. Here a grand depiction of vertebrate evolution from fish to mammal is demonstrated.

Shiva , the god of destruction has also been known to take animal forms. His most weird and mythical animal form is the form of

Sharabha- a part lion and part bird beast which is stronger than a lion or elephant in order to pacify the anger of lord Narsimha (Vishnu's incarnation) after killing HiranyaKashypu. Narsimha then transformed into a two headed bird called Gandaberunda or Berunda (also an avatar of Vishnu) with immense magical strength to fight back.

Shiva also took the form of a bull when trying to evade the Pandavas when they were seeking his grace to redeem themselves after kurukshetra war. The bull form of Shiva was found in Kedarnath in Himalayas where Bhima (the second pandav Brother) caught Shiva.

Other references of various animals can also be found in our Indian mythology, several animals are represented as vehicles of gods and goddesses who are also worshipped with them. The vehicle of lord Indra –the king of gods is the elephant Airavat. The vehicle of Shiva and Brahma are the ox and the goose respectively. The vehicles of goddess Lakshmi and Saraswati are owl and swan respectively. On the other hand Ganesh mounts on rat while Kartik mounts. Yama rides on buffalo. Devi Durga mounts on lion who also fights with her and helps her in killing the demon Mahishasura. Even there is no dearth of magical mysterious animals in Indian mythology. Lord Vishnu takes rest on snake-bed called Sheshanaga (a thousand hooded snake) and uses mythical Garuda bird as his vehicle who is also worshipped. Hanuman (the great ape god) is a great devotee of Ram (incarnation of lord Vishnu). The ape god is also known as Bajrangbali and worshipped as trouble solver. The Royal Bengal tiger is worshipped as Dakshin Ray by the local residence of Sundarban of West Bengal in India

Animals also feature prominently in Egyptian Mythology. The egyptian gods and goddesses often demonstrate some animalistic traits and animal like appearances. The principal god of this panthenon, the sun god Amun Ra and the king of gods Horus are often depicted with falcon-like features. The god Thoth has often been portrayed with the head of a ibis or baboon. The goddess Sekhmet on the other hand has the characteristics of both the lion and the cow. When earth became filled with sinners Ra sent down Sekhmet the lion goddess to punish the sinners. However she went out of control and indulged in a bloodbath. In order to stop her, Ra adviced humans to trick Sekhmet and made her drunk . When she fell asleep Ra transformed her into the cow goddess Hathor and recalled her to heaven. Anubis the god of mummification and the afterlife is typically portrayed as possesing the head of a Jackal. The goddess Bast or Bastet is also typically depicted as a woman with the head of a cat. In this context it can be well affirmed that egyptian mythologyis well connected with greek mythology; When the monster typhon of greek mythology invaded Mount Olympus – the abode of greek gods, they became afraid and fled to egypt and adapted various animal forms as disguise. Zeus took the form of a ram, Hera became a cow, Aphrodite appeared as a fish and Apollo metamorphed into crow.

Greek mythology also showcased numerous animals in them. Among them the most famous is Cerberous- the nine headed dog who guards the door of the underworld. Another famous animal is Ladon the thousand headed dragon which guards the tree of the golden apples. Also famous is the legendary snake Python. It followed Leto throughout earth on the order of Hera (Zeus's wife) to

devour Leto's children. At the end it was slain by Apollo- the god of sun who invented the pythian games to honour the serpent. This is simillar to Apophis the catastrophic snake in egyptian mythology who constantly try to devour Amun Ra (the sun god) during his journey. A notable animal in this case is the magical flying winged horse Pegasus which helped the demigod Bellaraphon to slay Chimera- a fierce creature with three heads- a lion head, agoat head and a dragon head. The front of the chimera's body was lion and form the middle part a goat with a snake head for a tail. The mythical creatures Cerynlian Hind (which despite being a hind had male like antlers of gold and hooves of bronze) and the erymanthian boar were the third and fourth labour of Heracles (the greek god).

Thus it shows that man from time immemorial was interested in hybridization. In his imagination he mixed up two animals of different species to evolve an entirely new animal with new features. This is reflected in today's science where he is actually able to hybridize two animals of different species and produce a Tigon- a hybrid of tiger and lion. We also get Pomato – a hybrid of potato and tomato in the plant case which lasts longer than real tomatoes. We also improved our food quality commercially by hybridizing different varieties of cow to yield more milk, different varieties of chicken- to get more eggs and meat, different varieties of Paddy- to get insect resistant more harvest, different varieties of fruits to get seedless, more tasty and high yielding fruits and so on.

The Child of Colour

Utsab Sinha

****

"Light is the shadow of God."

—Plato

It was an ordinary evening. I, a migratory bird, am living in this area for the last two years and a few months. Like the other usual evenings, I was going to buy some food along that road; that road where laid that left turn and then gradually came that mobile recharge centre, that grocery store and that medical store on my right hand; and then came another left turn.

I was busy pushing the pedals of my bicycle. I pushed one downward and the other came upward automatically and this was repeated in the other side as well, and I went on. I was moving forward, feeling life, as it were, for the present — but that present was merging into that endless past every moment; that past where there were only memories and inspirations. I heard the blow of a horn. I made room for the vehicle behind to take me over and move to the left. Then I heard the ringing sounds of the bells of a temple. The Lord was being worshipped, life was being worshipped, Mankind was being worshipped; maybe nothing was being worshipped.

The priest was making some gestures of *"Aarti"*. Some local women were sitting in front of the Deity. This particular temple marked the second left turn of my usual road. But, the ringing of those holy bells was not heard by my ears on a regular basis. I was late that evening. My ears were somehow happy to listen to that, and my visual organs were also probably happy to see that usually numb temple becoming alive that evening.

Then my eyes saw something, something that overcame those *"Dada, ponchas taka easy, Voda"*or the sights of dumb people gathering inside that medical store separated by a glass-door or the regular uncertain pedestrians. To me, that was a world — a separated world. But, here I saw an illuminating door — the sign of some kind of eternity that rejuvenated my eyes, my heart; I smiled.

There was a man standing by the side of my usual road. He was also somehow connected to that temple of God, maybe — I guess. He made a *"Pronam"* by using his hands, actually by one hand only; or rather it would be perfect to say, only the index finger which touched his forehead, and then chest, and this process was repeated twice again which was a very common act of those *"Dharmabhiru"* class of people who doesn't even spare one single occasion of facing a god — that maybe a broken calendar with His image hanging from a tree, or a vermillioned stone trying to lift its head up into this mortal world from the immortal earth, or just a tree with some red and yellow threads twisted around it, or hearing the sound of *"Dhong-Dhong Ghanti"* from an invisible temple and making a mechanical *"Bhaktibhore Pronam"* act as soon as possible.

But it was quite different there, just beside that particular man beside my usual path,

there was a child. He wore a half-shirt and a half-pant and slippers in his feet. He was a very real child, but, lights and shadows were playing on his face, a very natural smile with the eyes. Those eyes and those little fingers were so charming that it's too hard to explain the divineness of their grace when they became together along with his face; and those eyes blinked a little. Reality met divineness there. Probably he belongs to some other world, I suppose!

He was not a professional artist. He couldn't make that particular act of *"Pronam"* like his elder counterpart. Somehow he joined his two palms together and rubbed those soft palms against his face as if he was colouring himself on the holy occasion of *"Dolyatra"*. Maybe there was some *"Dolyatra"* being celebrated inside that was invisible to my bare eyes. What can I see either?

He was staining himself with the everlasting colours of the universe that never fade away. He was rejoicing — someone else was rejoicing; playing on this mortal earth. That child, I can't remember, whether that was really that child or not, or was someone else. He was not a saint for sure, but I may be wrong. That was probably the true definition of Beauty. Someone hurt me; someone hurt my soul, my inner cry.

There were celebrations, there were worships. I am a poor creature in this mortal land. What feelings do I have? I just have the feelings of past, present and future, a good job, a six-digit salary. I have the feelings of a piece of bread, to face future, to eye reality vis-a-vis. Maybe I am nothing other than those kinds of dumb people inside that separated world of the medical shop.

But, separation and unity lies together. That day I faced a conflict — a conflict between mortality and immortality, between separation and unity, between light and shadow. I had a unity with someone; with someone else, like that child of colour, I remember. I still consider myself not childish enough to understand that Beauty. Most probably, the child was someone like that child inside the garden of the selfish giant. My bare eyes were not enough to feel him. Actually, that time, no 'nothing' was there, 'everything' was being worshipped.

"THE MONTH"

****

There was a moment of chaos and confusion when a boy named Rahul, young, bit fair complexion with an average Indian height and bright eye filled with determination and aspiration , failed in his last attempt of NDA (National Defense Academy) SSB interview. He was constantly thinking of his future he was also enrolled in BSC Computer Science, but that was not his priority as he has always dreamt of going to NDA and he was also successful in clearing the first part of exam that is of written exam thrice but every time he failed in clearing the SSB interview which is followed by written exam. While he was figuring about his next expedition toward life, a moment happened in his college office, which he will be remembering and cherishing throughout his life. He met a girl named Sandhya, an average height girl with large and beautiful eye , and with her reddish-pink lips she was as per Barbie doll, who was in the same department and more fortunately in the same semester as Rahul, they were in 3rd semester . Also on that day, Rahul helped her in doing xerox of her required documents, so from that moment they started talking to each other, obviously on WhatsApp unlike through letter exchange which earlier used to be a mode of communication for many people.

As time passes, they proposed to each other on WhatsApp itself, though Rahul proposed first, but her acceptance make his life first and might be last proposal successful. There was a preparation going on for farewell and teacher day celebration at their department and Sandhya was one of the dance participants of that programme, on last day of her rehearsal which was on 4th sep 2022, Friday, they mutually decided to go for their first date and yes it was none other than Princep Ghat of Kolkata . Everything was going average and ok but while returning home, when Rahul tried to hold her hand in his while walking , the feeling of softness, tenderness and warmth of her hand, was like cherry on the cake for him. Later both of them enjoyed this short span of heavenly pleasure while holding each other hand, talking whatever coming to them ind and walking carelessly, unknown of coming circumstances and consequence in their life.

The major breakthrough in their relationship was the teacher day celebration of their department, where a climax was, when Rahul picked a chit which was a dare "To propose someone" and he called Sandhya, who was looking very beautiful in Blue saree, on the stage, this called has actually baffled everyone present in that function.He then proposed her and also dance with her as seniors has asked them to do but as expected Rahul was looking like joker while dancing with her she was a pro dancer.

Now at this moment Rahul was really enjoying his life as he used to chat with her at night, also when classes used to get over very early he and sandhya used to go out and enjoy the places like library, Indian coffee house and etc. Also at classroom everybody was giving him special attention but god knows for how long Rahul will really enjoy this so called special attention from other. As Rahul's mother comes to know of their relationship. With time Rahul have once tried to break-up but unable to as might his

emotion toward her was stronger. But when everyone from our semester decided to have Pandal Hopping on panchami of Durga Puja, he was unable to give his word about his presence as he might not be allowed to go and it happened exactly the same.

Rahul was knowing the address of Sandhya's home as she has once showed and introduced him with her parent, and asked him to visit next time also. But she was not aware that Rahul will be there on the night of Chathurthi to have a last heart to heart talk physically. Rahul like to write letters for her and he has written to her earlier also , but this letter was the last one to her from his side, as after this they might not talk to have a candid conversation .When Rahul reached at her place, she was having performance on "Rangabati" song .Rahul really liked a lot also thought how happy she was but what will happened if he would delivered his last letter for separation to her.It was very random but yes she has asked him "ki hoyeche bol ammake?", what happen to you tell me. Rahul was not able to make her understand what is the reason for this action of his to break-up this relationship, which have not yet celebrated its even one month anniversery.

Amidst the chaos and confusion, Rahul, a young and fair-complexioned boy with bright, determined eyes, faced disappointment in his last attempt at the NDA SSB interview. His dreams of joining the NDA seemed distant, although he was pursuing a BSC in Computer Science. But fate had a different plan for him. In his college office, Rahul's life took a romantic turn when he met Sandhya. She was an average-height girl with mesmerizing eyes and lips like a Barbie doll. They were both in the same department and semester, the 3rd semester to be exact. Their interaction began when Rahul helped her with photocopying documents, and from that moment, their conversations blossomed on WhatsApp, a modern twist to classic communication. Time passed, and through WhatsApp, they exchanged proposals, with Rahul's proposal marking a significant milestone in his life. Their first date at Princep Ghat in Kolkata was a memorable experience, but it was the simple act of holding Sandhya's hand that brought warmth to Rahul's heart. Their relationship thrived, especially during the teacher's day celebration, where Rahul proposed to Sandhya in front of everyone. They danced together, despite Rahul's lack of dancing skills, and it was a moment of pure joy. Life was a blissful journey for Rahul as he spent time with Sandhya, chatting at night, exploring places like the library and Indian coffee house, and reveling in the special attention he received from classmates. However, when his mother discovered their relationship, challenges arose. Though Rahul once contemplated a breakup, his emotions for Sandhya remained strong. Their love faced a test when Rahul couldn't join his classmates for Pandal Hopping during Durga Puja. But he knew Sandhya's address and decided to have a heart-to-heart talk on Chathurthi night. Rahul, who loved writing letters, penned his final one, signifying the impending separation. As he watched Sandhya perform to the song "Rangabati" at her home, he struggled to convey his reasons for the breakup, even though their relationship hadn't reached its one-month anniversary. Their love story, filled with twists and turns, was a testament to the power of unexpected connections and the depth of emotions shared between two people

ধনী হওয়ার সহজ উপায়

সুখেন্দু কাঁড়ার

****

সকলেরই ইচ্ছা থাকে ধনী বা বড়োলোক হওয়ার। কিন্তু ঠিক কীভাবে বড়োলোক হওয়া যায়, তার সঠিক ধারণা আমাদের অনেকের থাকে না। সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে আমাদের ধনী হওয়ার স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। আর্থিক কারণে সৃষ্ট সমস্ত দুঃখকষ্ট কাটাতে সবাই চায় তার অ্যাকাউন্টে কোটি টাকা থাকুক। বর্তমান সময়ে, সুশৃঙ্খলভাবে বাজেট প্রণয়ন করে, আপনি প্রতি মাসে আপনি প্রতি মাসে সামান্য সঞ্চয় এবং বিজ্ঞতার সঙ্গে বিনিয়োগ করে এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন।

ধনী হওয়ার জন্য বেশ কিছু কথা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। সেই সঙ্গে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম অত্যন্ত জরুরি। আপনি অবশ্যই দেখে থাকবেন যে, কিছু লোক লটারি কেটে হঠাৎ কোটিপতি হয়ে যায় কিন্তু তারপর কিছু সময়ের পরে তারা আবার সেই আগের গরিব অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু কেন? কেননা তারা তাদের হঠাৎ পাওয়া অনেক টাকাকে ম্যানেজ করতে পারে না। আমাদের বেশ কিছু কথা মাথায় রেখে কঠোর পরিশ্রম করে ধনী হতে হবে এবং তা যেন দীর্ঘস্থায়ী হয় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। তাই এমন কিছু কথা আজকে জানাতে চলেছি যেগুলি ফলো করলে আপনিও তাড়াতাড়ি ধনী হতে পারবেন।

বর্তমান সময়ে বড়লোক হওয়া এমন কোনো কঠিন কাজ না। কথাটা অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু এটাই সত্যি। এখন টাকা ইনকাম করার অনেক রাস্তা আমাদের সামনে খোলা রয়েছে। বিগত কয়েক বছরে ভারতে কোটিপতি লোকের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গরিব থেকে বড়লোক হওয়ার জন্য একটি সঠিক লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমাকে বড়োলোক হতেই হবে। এ কথাটা মাথায় রাখলে আপনি আপনার অবচেতন মনের সাহায্যেই বড়োলোক হওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করবেন।

১. নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন

যেকোনো ব্যক্তিকে বড়লোক বা ধনী হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা জরুরি। লক্ষ্য নির্ধারণ না করলে কোনোভাবেই বড়লোক হওয়া সম্ভব না। তাই যেকোনো কাজের মতো বড়লোক হওয়ার জন্য আপনাকে নির্দিষ্ট সময়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। যেমন ধরুন আপনি লক্ষ্য নির্ধারণ করলেন যে, ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যেই আপনি বড়লোক হবেন এবং সেই অনুযায়ী আপনি পদক্ষেপ নিতে শুরু করবেন। এই কথাটা একটি কাগজে লিখে রাখলে লক্ষ্য অধিক কার্যকরী হয়।

২. একটাই লক্ষ্য রাখুন

অনেকেই একটা কমন ভুল করে থাকে, যেটি হচ্ছে একাধিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা। আপনি যদি একের বেশি লক্ষ্য নির্ধারণ করেন তাহলে আপনি একাধিক লক্ষ্যের প্রতি ফেঁসে যাবেন। তাই লক্ষ্য একটাই রাখতে হবে এবং সেটার প্রতি ফোকাস রেখে কাজ করতে হবে।

একের বেশি লক্ষ্য থাকলে আপনার টাকা এবং সময় দুই নষ্ট হবে এবং কোন লক্ষ্যপূরণই সম্ভব হবে না। তাই আপনার লক্ষ্য যতদিন পূরণ না হচ্ছে লক্ষ্যের প্রতি অনড় থাকুক, পরিশ্রম করুন এবং দেখবেন আপনি কম সময়ের মধ্যেই ধনী হয়ে গেছেন।

৩. সময়ের গুরুত্বকে বুঝুন

একজন সফল ব্যক্তি কখনোই তার সময়কে নষ্ট করে না। জীবনে সফল বা ধনী হতে গেলে সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতেই হবে। যদি আপনিও জীবনের সফল হতে চান তাহলে আপনাকে সময়ের গুরুত্ব বুঝতে হবে। প্রত্যেকটা সেকেন্ড আপনাকে ধনী বানানোর জন্য খুবই জরুরি। তাই সময়কে কখনোই

ফালতু নষ্ট করা ঠিক না। কথায় আছে Time in Money। কথাটা মাথায় রাখতে হবে।

৪. কঠোর পরিশ্রম করতে হবে

পরিশ্রমই হল কম সময়ের মধ্যে ধনী হওয়ার চাবিকাঠি। গরিব থেকে ধনী হওয়ার জন্য আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। প্রয়োজনে দিনরাত এক করে কাজ করতে হবে। তবেই আপনি ধনী হতে পারবেন। আপনি যদি মনে করেন পরিশ্রম না করে বড়োলোক হব তাহলে আপনি সেটা স্বপ্নে ছাড়া সম্ভব না। তবে অসৎ উপায়ে বড়লোক হতে পারবেন কিন্তু এটা করলে আপনার সঠিক সম্মান থাকবে না।

৫. সব সময় নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করুন

একজন সফল বা ধনী ব্যক্তি সবসময় নতুন কোনো কিছু শেখার চেষ্টায় থাকে। যদি কম সময়ের মধ্যে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হতে চান তাহলে সবসময় আপনাকে নতুন নতুন বিষয় শিখতে হবে। আপনাকে প্রতিদিন নতুন নতুন লোকেদের সাথে মিশতে হবে কথা বলতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে নতুন কিছু শিখে নিজের কাজে তা প্রয়োগ করতে হবে।

৬. ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে

কম সময়ের মধ্যে ধনী হওয়ার জন্য টাকাকে সঠিক জায়গায় ইনভেস্ট করা খুবই জরুরি। আপনার কাছে বর্তমানে যে টাকা আছে সেটি যদি বাড়িতে ফেলে রাখেন তাহলে তা থেকে টাকা কখনই বাড়বে না। এর জন্য টাকাকে সঠিক জায়গায় ইনভেস্ট করতে হয়। সঠিক জায়গায় টাকা ইনভেস্ট করলে আপনি সেই টাকা থেকে কম সময়ের মধ্যে ভালো রিটার্ন পেতে পারেন।

এর জন্য Real State, Stocks, Mutual Fund ইত্যাদির মতো ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানে আপনি আপনার টাকা ইনভেস্ট করতে পারেন।

৭. নিজের ব্যবসা শুরু করুন

পৃথিবীর যত ধনী ব্যক্তি রয়েছে তারা সকলেই নিজের ব্যবসা করে। আপনিও যদি কম সময়ের মধ্যে বড়লোক বা ধনী হতে চান তাহলে আপনাকে নিজের ব্যবসা শুরু করতে হবে। আপনার কাছে যত টাকা আছে সেটা কম আর বেশি হোক সেটা দিয়েই আপনি যে কোনো একটি ব্যাবসা শুরু করতে পারেন।

ব্যাবসা শুরুর আগে অবশ্যই একটি ব্যবসায়িক প্ল্যান বানাতে হবে। সেই অনুযায়ী আপনি দিনরাত পরিশ্রম করে একবার যদি ব্যবসা দাঁড় করাতে পারেন এবং তার জনপ্রিয়তা বাড়ে তাহলে আপনার ব্যবসায়িক সেল বাড়বে এবং সে ভিত্তিতে আপনার বড়োলোক হওয়ার স্বপ্ন খুব তাড়াতাড়ি পূরণ হবে।

৮. সেলস সম্পর্কে সঠিক ধারণা

সেলসের কথা শুনেই আমরা অট্টহাসি হাসি। আমরা বলি এ আবার কী কাজ। কিন্তু একটি কথা মনে রাখবেন পৃথিবীর এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে সেলস বা বিক্রি করে না। একজন চাকরিজীবী, একজন ব্যবসায়ী, একজন দিনমজুর সকলেই কিছু না কিছু সেলস বা বিক্রি করে।

একজন দিনমজুর সে তার শ্রম বিক্রি করে। এইভাবে আমরা যদি লক্ষ করি তাহলে দেখব, সকলেই টাকা ইনকাম করার জন্য কিছু না কিছু সেল করেই।

আমরা নিজের ব্যাবসা করি বা চাকরি করি যাই করি না কেন সেলসের কনসেপ্টটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। সেলস এর বিষয়টা ভালো করে বুঝতে পারলেই আমরা কম সময়ের মধ্যে ধনী হতে পারব।

৯. নেগেটিভ লোকেদের থেকে দূরে থাকুন

আমাদের আশেপাশে নেগেটিভ এবং পজিটিভ দুই ধরনেরই লোক থাকে। পজিটিভ চিন্তাভাবনার লোকেরা আপনার কাজকে উৎসাহিত করবে এবং আপনাকে মোটিভেট করবে। অন্যদিকে নেগেটিভ লোকেরা আপনার কাজের সমালোচনা করবে, আপনাকে ডিমোটিভেট করবে।

তাই আপনাকে সবসময় পজিটিভ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে এবং যতটা সম্ভব নেগেটিভ লোকেদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

১০. সফল লোকেদের অনুপ্রেরণা নিন

এমন অনেক লোক রয়েছে যারা তাদের জীবনে সফল

হয়েছেন এবং খুব কম সময়ের মধ্যে ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় নিজেদের নাম লিখিয়েছেন। আপনাকে ঐ সমস্ত লোকেদের কাছ থেকে প্রেরণা নিতে হবে। এর জন্য তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন।

অনেক সময় আমাদের প্রিয় ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে আমরা সরাসরি কথা বলতে পারি না। সেক্ষেত্রে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জীবনী পড়তে হবে। ইউটিউবে বিভিন্ন ধনী লোকেদের বায়োগ্রাফি ভিডিও থাকে সেগুলি দেখতে হবে।

১১. কাজের সঠিক পরিকল্পনা করুন

যেকোনো কাজ শুরু করার আগে আমাদের তার প্রপার পরিকল্পনা বা Planning করা অত্যন্ত জরুরি। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ না করলে সেই কাজে সফল হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই আপনি যদি কোনো নতুন ব্যাবসা শুরু করেন তাহলে আগে তার প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা করতে হবে। আপনি কত সময়ের মধ্যে আপনার ব্যাবসাকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান, কীভাবে কাজ পরিচালনা করবেন ইত্যাদির আগাম পরিকল্পনা করে রাখতে হবে।

১২. ছোটো থেকে শুরু করুন

আপনাকে যে বড়ো আকারের ব্যবসা শুরু করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কম টাকা দিয়েও আপনি আপনার পছন্দের কোনো ব্যাবসা শুরু করতে পারেন। কাজ শুরু হওয়ার পর আপনি আপনার পরিশ্রম দিয়ে ব্যাবসাকে বড়ো করতে পারবেন।

আর কম টাকায় কোনো ব্যাবসা শুরু করার আরেকটি লাভ হচ্ছে, আপনার ব্যাবসা যদি না চলে তাহলে আপনার লোকসানের পরিমাণও কম থাকবে। যদিও আপনি সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে কোনো কাজ শুরু করেন তাহলে তাতে লোকসানের সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়।

সবশেষে

মাত্র কুড়ি টাকা বিনিয়োগ করে কোটিপতি হতে পারেন,মুদ্রাস্ফীতির এই যুগে বড়ো সঞ্চয় করা একটু কঠিন হতে পারে। কিন্তু প্রতিদিন কুড়ি টাকা সঞ্চয় করা খুব একটা কঠিন কাজ নয় এবং সুশৃঙ্খলভাবে সঞ্চয় এবং প্রতিদিন কুড়ি টাকা বিনিয়োগ করে আপনি কোটিপতি হতে পারেন।

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করে লক্ষ্য অর্জন করা যায়:

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করে আপনি কোটিপতি হওয়ার লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন। এর কারণ হল মিউচুয়াল ফান্ডগুলি গত পঁচিশ বছরে খুব ভালো রিটার্ন দিয়েছে। এমনকি কিছু ফান্ড দীর্ঘ মেয়াদে কুড়ি শতাংশ পর্যন্ত রিটার্ন দিয়েছে। সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (SIP) হল মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার সবচেয়ে ভালো উপায়। প্রতি মাসে এতে বিনিয়োগ করতে পারেন। প্রতি মাসে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে খুব বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় না। মাত্র পাঁচশো টাকা দিয়ে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ শুরু করতে পারেন।

কোটিপতি হওয়ার সূত্র :

ধরুন একজন ব্যক্তি কুড়ি বছর বয়স থেকে প্রতিদিন কুড়ি টাকা সঞ্চয় করা শুরু করেন, তাহলে তিনি মাসে ছ'শো টাকা সঞ্চয় করবেন। তিনি যদি প্রতি মাসে মিউচুয়াল ফান্ডে ছ'শো টাকা বিনিয়োগ করেন, তাহলে সেই ব্যক্তি কোটিপতি হতে পারেন। এর জন্য, ব্যক্তিকে চল্লিশ বছর অর্থাৎ চারশো আশি মাস-এর জন্য তাকে ছ'শো টাকা করে প্রতি মাসে বিনিয়োগ করতে করতে হবে। এইভাবে, তাকে মাত্র ২.৮৮ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। যদি তিনি এই বিনিয়োগের উপর বার্ষিক গড় ১৫ শতাংশ সুদ পান, তাহলে তিনি মাত্র ২.৮৮ লক্ষ টাকার বিনিয়োগে ৪০ বছরে ১.৮৬ কোটি টাকা তুলতে পারবেন।

দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে বেশি সুবিধা

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগে ভালো আয় পেতে হলে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ খুবই ফলদায়ক। এর কারণ এই সময়ে চক্রবৃদ্ধির সুবিধা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কুড়ি বছরের জন্য প্রতি মাসে ছ'শো টাকা বিনিয়োগ করেন এবং বার্ষিক গড় রিটার্নের হার ১৫ শতাংশে একই থাকে, আপনি ২০ বছর মাত্র ১৮.৬৬ লক্ষ টাকা পাবেন। এই সময়ে আপনার মোট বিনিয়োগ হবে ১.৪৪ লক্ষ টাকা।

Scheme Name	Catagory	Inception date	Returns since inception
Aditya Birla Sun Life Equity	Large & Mid Cap Fund	Feb 24, 1995	16.56%
Advantage Fund Franklin India	Large Cap Fund	Dec 1, 1993	18.96%
Bluechip Fund Franklin India Flexi Cup Fund	Flexi Cup Fund	Sept 29, 1994	17.43%
Franklin India Prima Fund	Mid Cap Fund	Dec 1, 1993	18.75%
HDFC Flexi Cap Fund	Flexi Cup Fund	January 1, 1995	18.22%
HDEF Tax Sever Fund	ELSS Fund	Mar 31, 1996	22.91%
HEFC Top 100 Fund	Large Cap Fund	September 3, 1996	18.53%
JM Value Fund	Falue Fund	June 2, 1997	15.78%
Nippon India Growth Fund	Mid Cap Fund	Oct 8, 1995	21.48%
Nippon India Vision	Large & Mid Cap Fund	Oct 8, 1995	17.42%

Reference:
1. *www.banglarojgar.com*
2. *The Economic Times*

আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব

অনুরাগ পাল

****

'মা' শব্দটি শুনলেই সবার মন ভরে যায়। পৃথিবীতে সবার কাছে তার মা অমূল্য সম্পদ। যার মা নেই সে বোঝে, 'মা' না থাকার কষ্ট। পৃথিবীতে সবার কাছে তার মা একজন আদর্শ ব্যক্তিস্বরূপ। আমার মা আমাকে খুব ভালোবাসেন। শুধু আমাকে কেন ? পৃথিবীতে সকল মা-ই তার সন্তানদের যথার্থ ভাবে ভালোবাসেন। আমার মা আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ। কী করলে আমার ভালো হবে, কী করলে আমার মন্দ হবে তা সবই আমার মা আমাকে বুঝিয়ে দেন। আমার মা আমাকে সব সময় একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেন সৎপথে চলার জন্য। আর তা হল 'Honesty is the best policy' অর্থাৎ সততাই উত্তম পন্থা। আমি চাই আমার মায়ের এই কথাটি কাজে লাগিয়ে জীবনের সব সময় সৎপথে এগিয়ে চলতে। আমি চাই, আমার মা দীর্ঘ আয়ু লাভ করুন। ভগবানের কাছে আমি সর্বদাই প্রার্থনা করি আমার মা যেন সবসময় সুস্থ থাকেন,আর মাকে যেন সবসময় আমি খুশি রাখতে পারি। যে কথাটি এখনো আমি আমার মাকে বলতে পারিনি তা আজ বলে লেখা শেষ করব—

আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি 'মা' আর এটা বলতেও দ্বিধাবোধ করছি না যে —

'আমি তেমনিই মানুষ যেমন আমাকে আমার মা তৈরি করেছেন, আর যে ঘরে মা আছে সেই ঘরে শৃঙ্খলা আছে'।

ভারতের কিছু স্বল্পখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিকথা

সঙ্গম গায়েন

****

দিনটা ছিল ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন। এই দিনেই তৎকালীন সুবে বাংলার নদীয়ার পলাশী নামক স্থানে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা -র নেতৃত্বাধীন নবাবী সেনা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিক তথা ইংরেজ সর্বাধিনায়ক রবার্ট ক্লাইভের হাতে পরাজিত হয় এবং এর মধ্যে দিয়েই বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। এরপর প্রায় ১৯০ বছর ধরে অগণিত দেশপ্রেমিক মানুষদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়, ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে কখনও সহিংস ও কখনও অহিংস আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পুনরায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা ফিরে আসে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যাঁদের নাম উঠে আসে তাঁরা হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। যদি অলিগলি খোঁজা হয় তবে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বদেরও স্মরণে আনা হয়, যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সিধু ও কানু, বিরসা মুণ্ডা, হাফেজ নিসার আলি ওরফে তিতুমীর প্রমুখ। বহু ঐতিহাসিকদের মতে, সিপাহি বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। মানুষের মনে স্বাধীনতা নামক চেতনা উন্মেষে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, চারণকবি মুকুন্দদাস প্রমুখ। তথাপি প্রতি আন্দোলনেই পিছনের সারির মানুষদের কথা ইতিহাসে স্থান পায়নি। একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে, জোটবদ্ধ আন্দোলন না হলে ব্রিটিশ শক্তি কখনোই উৎখাত হত না। আজ এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে ৭৭ তম স্বাধীনতা বর্ষ উপলক্ষ্যে তেমনই কিছু নাম না জানা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরব :

১) ময়নাকুমারী :

ময়নাকুমারী ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নাম না জানা একজন বীর কন্যা। ইনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতৃত্ব নানা সাহেবের দত্তক কন্যা ছিলেন। বিদ্রোহের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। তিনি অস্ত্রচালনাও শিখেছিলেন। ব্রিটিশ সেনার প্রাসাদ আক্রমণের সময় তিনি প্রাসাদের গোপন রাস্তা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু সেনাপতির কু-চক্রান্তে তিনি ব্রিটিশ সৈনিকের হাতে ধরা পড়েন। অবশেষে কর্নেল আউট্রামের নির্দেশে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর রাতে তাঁকে গাছের সঙ্গে বেঁধে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবেই তিনি দেশের জন্য আত্মত্যাগকারী শিশুদের তালিকায় তাঁর নাম লেখেন।

২) অরুণা আসফ আলী :

অরুণা আসফ আলী ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম পুরোধা নেত্রী। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করলে তিনি দেশবাসীকে এই শেষ সংগ্রামটিতে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ দেশনেতাদের গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গে অরুণা আসফ আলী এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বে ক্ষিপ্ত জনতা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ শুরু করে। তিনি ৯ই আগস্ট, ১৯৪২-এ বোম্বাই গোয়ালিয়া ট্যাংক ময়দানে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে এনে তার জায়গায় ত্রিরঙা পতাকা উড়িয়ে সংগ্রামী সকলের মনে উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলেন।

৩) রামপ্রসাদ বিসমিল :

রামপ্রসাদ বিসমিল ছিলেন বিপ্লবী সংগঠন হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তাঁর বিখ্যাত রণহুংকার "সারফারোসি কি তামান্না আব হামারে দিল মে হে দেখ না হে জোর কিতনা বাজো হে কাতিল মে হে"—এই গান গেয়ে কত বিপ্লবী যে ফাঁসির মঞ্চে শহিদ হলেন তা জানা নেই। উনি 'মেনপুর কাণ্ড' এবং 'কাকুরী কাণ্ড'-এ নেতৃত্ব দিয়ে ব্রিটিশ শাসকের বুকে প্রচণ্ড আঘাত করেন। এগারো বছরের বিপ্লবী জীবনে বিসমিল অনেক বই লিখেছিলেন, কিন্তু ইংরেজ সরকার তাঁর সমস্ত বই নিষিদ্ধ করে দেয়। ১৯২৬ সালে কাকুরী বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং এটির বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার মামলা শুরু করে। এই মামলার বিচারে পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, ঠাকুর রৌশন সিং, আসফাকউল্লা খানের ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর গোরখপুর জেলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

৪) মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী :

মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের একজন ইসলামি পণ্ডিত, দার্শনিক, বিতার্কিক, সৈনিক ও লেখক। তিনি বর্তমান ভারতের উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের নিকট নানুতা নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬০ সালে তিনি হজ্জ করেন। ফেরার পর মেরুটের মাতবাহে মুজতবাদে বই বিন্যাসের দায়িত্ব পান। তিনি মাত্র এক রমজানে পবিত্র কোরান মুখস্থ করেন। তাঁর হাতেই দেওবন্দ আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

৫) হরেকৃষ্ণ কোঙার :

হরেকৃষ্ণ কোঙার ছিলেন একজন ভারতীয় কমিউনিস্ট রাজনীতিবিদ এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-এর ভাবাদর্শে বিশ্বাসী একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি ভারতীয় আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেন এবং ১৯৩০ সালে ৬ মাসের জন্য গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যয়নকালে চরমপন্থী আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য ১৮ বছর বয়সে ৬ বছরের জন্য আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সেলুলার জেলে দণ্ডিত হন। ১৯৪৩-৪৪ সালের অজয় নদী বাঁধ আন্দোলন এবং ১৯৪৬-১৯৪৭ সালের খাল কর প্রতিবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

৬) মাহমুদ হাসান দেওবন্দি :

মাহমুদ হাসান দেওবন্দি ছিলেন একজন ভারতীয় ইসলামি পণ্ডিত এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। তিনি ব্রিটিশ শাসনের কট্টর বিরোধী ছিলেন। ভারতে তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করেন কিন্তু ১৯১৬ সালে গ্রেপ্তার হয়ে মাল্টায় কারাবন্দি হন। তিনি ১৯২০ সালে মুক্তিলাভ করেন এবং খিলাফত কমিটি তাঁকে 'শায়খুল হিন্দ" উপাধি প্রদান করে। তিনি ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে ফতোয়া প্রদান করেছিলেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্তির জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। ২০১৩ সালে ভারত সরকার তাঁর রেশমি রুমাল আন্দোলন নিয়ে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

৭) হুসাইন আহমেদ মাদানি :

হুসাইন আহমেদ মাদানি ছিলেন উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ভারতের অন্যতম জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, সুফি, লেখক ও ইসলামি পণ্ডিত। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, খিলাফত আন্দোলন এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। ১৯২০ সালে কংগ্রেস-খিলাফত জোট তৈরিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি ১৯২০-১৯৩০ সাল জুড়ে তাঁর বক্তৃতা ও পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে ভারতীয় উলামা ও কংগ্রেসের যৌথ আন্দোলনের পথটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। ২০১২ সালের ২৯শে আগস্ট ভারতীয় ডাক বিভাগ তাঁর সম্মানে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে।

৮) উবায়দুল্লাহ সিন্ধি :

উবায়দুল্লাহ সিন্ধি ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী নেতা ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মী। ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে কাবুলে গঠিত ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেন এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তানে অবস্থান করেন এবং রাশিয়া চলে যান। দেওবন্দি উলামাদের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

৯) তিলকা মাঝি বা তিলকা মুর্মু :

তিলকা মাঝি বা তিলকা মুর্মু ছিলেন আদিবাসী বিদ্রোহের প্রথম যুগের নেতা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদ। তাঁর বাবা চুনু মুর্মু ছিলেন গ্রামপ্রধান। তিনি ছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রথম শহিদ। ১৭৮১ ৮৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জমি লুঠ ও বলপূর্বক খাজনা আদায়ের যে নির্মম পন্থা অবলম্বন করে, তার বিরুদ্ধে গরীব সাঁওতালদের মধ্যে যে ক্ষোভের সূচনা হয় তাকে গণ বিদ্রোহের আকার দেন তিলকা। তিনি সকলের কাছে 'বাবা তিলকা মাঝি" নামে পরিচিত ছিলেন। এই সংগ্রামে তিনি আহত অবস্থায় ধরা পড়েন।

১০) নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা :

মিরজা মহম্মদ সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন। যদ্যপি ঐতিহাসিকের মধ্যে ওঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বলা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে, তথাপি ওঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা থেকে একথা নিবন্ধকারকে বলতেই হয়, উনি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা নামক মনোভাবের অধিকারী। ওঁর চিন্তাভাবনা থেকে একথা কিছুটা হলেও বলা যায়, উনি যুগের থেকে এগিয়ে ছিলেন। উনি মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের কবলে না পড়লে আজ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অন্যরকম হত।

শিক্ষা : ব্যবসার পণ্য নয়, প্রান্তিকের ন্যায্য অধিকার

অহিন্দ্রী ব্যানার্জী

****

আমরা শিক্ষা, বা আরও নির্দিষ্ট করে শিশু-শিক্ষা নিয়ে কতটা চিন্তিত বা ওয়াকিবহাল? বা আমাদের সাধারণ অভিমতটা কি?

আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের, এই ধরুন ৭-৮ বছর বয়স কিংবা ১৩-১৪ বছর বয়স কিংবা আর একটু বেশি হয়ে ১৬-১৭-ও হতে পারে, পড়াশোনার জগতে থাকা উচিৎ কিনা, আপনারা কিন্তু সকলেই সমস্বরে বলবেন হ্যাঁ উচিত! সুতরাং সকলেই ইতিবাচক অভিমত পোষণ করেন।

কিন্তু আপনার আমার চাওয়াটা বাস্তবায়িত হতে গেলে যে পরিমাণ কাঠখড় পোড়াতে হয় সেটা পোড়ানোর দায় কার? কার দায়িত্ব এই দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব? ব্যাস! এখানেই সকল ইতিবাচক অভিমত পোষণকারীদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। তবে এরূপ দ্বন্দ্বে যাতে আমাদের না পড়তে হয় সেজন্য সংবিধান আগে থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রেখেছে। আমাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রতি ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের অধিকার রয়েছে এবং সেই শিক্ষার প্রতি অধিকার রক্ষা করা দেশের ও রাজ্যের সরকারের কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অধিকার রক্ষার্থে কতর্ব্যরতদের ভূমিকা ঠিক কী হওয়া উচিত ছিল এবং বর্তমানে তাদের ভূমিকা কী?

নতুন স্কুল তৈরি করা, প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষানুবর্তী করে তোলার স্বার্থে নানান সহকারী প্রকল্প আনার পরিবর্তে ৮০০০টির বেশি স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার মুখে রাজ্য।

এই স্কুলগুলির মধ্যে ৬৭১০ হচ্ছে প্রাথমিক স্কুল, ১৪৯৬ জুনিয়র হাইস্কুল ও একটি হাইস্কুল। কারণ হিসাবে সরকার দেখাচ্ছে ছাত্রছাত্রীর অভাব। বাস্তবের দিকে যদি তাকানো যায়, ক্রমবর্ধমান জংনসখ্যার দেশে হঠাৎ কী এমন ঘটল যাতে স্কুলগুলো ছাত্রের অভাবে ধুঁকছে? নাকি আমাদের স্কুলের প্রয়োজন নেই?

সব থেকে সহজ সমীকরণ দাঁড়ায় স্কুলগুলির ভগ্নপ্রায় পরিকাঠামো এবং শিক্ষকের অভাবে একাংশ ভরসা রাখতে পারছে না সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায়। তবে আমার থেকেও ঢের ভালো সরকার জানবে ঠিক কোন কারণে স্কুলগুলিতে ছাত্রের অভাব দেখা যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে সেই সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজতেও কি তারা সচেষ্ট? ফলের তাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তারা বেসরকারি স্কুলে বিভিন্ন দামের প্যাকেজে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাচ্ছেন। আর যাদের সামর্থ্য নেই বা যারা এখনও ভরসা রাখেন মাতৃভাষায় পড়াশোনার প্রতি তাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু এখনও সরকারি স্কুলগুলোর ভরসাতেই আছে। এই ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কি সরকারের কোনো দায়বদ্ধতা নেই?

তবে দায়বদ্ধতার কথা যদি বলতেই হয়, সেক্ষেত্রে সরকারি স্কুলগুলোর পরিকাঠামোগত অবনমন ঠেকাতে সরকার সংবিধানের কাছে, আইনের কাছে দায়বদ্ধ।

সেই দায়বদ্ধতা পালনে সরকার কী ভূমিকা নিয়েছে? সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষাব্যবস্থাকে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেওয়ার। অর্থাৎ শিক্ষার বিপণন। আর পাঁচটা সামগ্রীর মত এখন লেখাপড়া বিক্রি হচ্ছে মুনাফার বদলে। শহরে তো বটেই, শহরতলী গুলোতেও মোড়ে মোড়ে গজিয়ে উঠছে এই ওয়ার্ল্ড সেই ওয়ার্ল্ড, এই গার্ডেন ওই হেভেন ইত্যাদি ইত্যাদি নামের কত স্কুল। গ্রামের পথেও এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এই নাম না জানা স্কুলগুলোর চাকচিক্য রয়েছে, কিন্তু পড়াশোনার মান কি সবক্ষেত্রে খুব উন্নত? না আসলে তা নয়। কিন্তু বেসরকারি হলে পরিষেবা ভালো হবে, ইংরাজি ভাষায় পড়লে বাচ্চা অনেকটা বেশি সুশিক্ষা পাবে এই দুইয়ের এক অদ্ভুত অ্যামালগামেশন-র মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষার বেচার কারখানা, যেখানে হয় তুমি মুনাফা দাও নাহলে শিক্ষালাভের দাবি করো না! এদিকে শিক্ষা যে প্রত্যেক ভারতীয়ের সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার সে বিষয়ে সরকারি তরফে সতর্ক করার প্রচেষ্টার লেশমাত্র নেই।

থাকবেই কা কী করে? শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিলেই তো হবে না, তাদের ব্যবসা করার খদ্দের এনে দিতে হবে তো! সেটা সম্ভব যদি সরকারি স্কুলগুলোকে বন্ধ করা যায়। হুট করে বন্ধ করবে কীভাবে? দীর্ঘদিন ধরে তাই চলে আসছে একটা প্রক্রিয়া।

বাজেট বেরোলে দেখা যায় শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বছর বছর কমে। মিড ডে মিলের জন্য বরাদ্দ কমিয়ে মাথা পিছু প্রতিদিন করা হয়েছে ৩ টাকা ৩৩ পয়সা। এই বিভাগগুলো কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকার মিলে চালায়। তাই এখানে কারুর নেতিবাচক অংশীদারিত্বকেই ছোটো করে দেখা যায় না।

মিড ডে মিল প্রকল্পটির দ্বিমুখী উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা; দ্বিতীয়ত প্রান্তিক শিশুদের স্কুলমুখী করে তোলা। বরাদ্দ করা মূল্যে একটা ডিমও কেনা সম্ভব নয়, একটা ডিমের দামই ৫ টাকা। সুতরাং মিড ডে মিল প্রকল্পকে কার্যত অচল করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক নিয়োগ হয় না। যে বিপুল পরিমাণ শূন্যপদ সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব নিঃসন্দেহে পড়ছে স্কুলগুলোর ওপর। খবরে নজর রাখলেই জানা যায় এমন বেশ কিছু স্কুল রয়েছে যেখানে ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক নেই, এমনও কিছু স্কুল রয়েছে যেখানে একটিও শিক্ষক নেই মাসের পর মাস তবু সেদিকে কারোর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, সেখানে পরীক্ষাও হয় না। হয়তো সেই স্কুলগুলির বুকেও সকলের অলক্ষে একদিন তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

এদিকে এত কথা পড়ে মনে হতে পারে আমি সব মনগড়া গল্প লিখেছি। আসলে না, সরকারের পক্ষ থেকেই সেই সন্দেহ নিরসনের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে পিপিপি মডেলের কথা শুনেছেন কি? এই অ্যাক্রোনিমের পুরো মানেটা হল পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেল। যার গোদা ভাষায় মানে দাঁড়ায় বেসরকারি বিলগ্নীকরণ। কী হবে এই লগ্নীর মাধ্যমে? বিশেষজ্ঞদের মত এই লগ্নীর ফলে স্কুলে পড়ার সামান্য যে বেতন রয়েছে তা বিপুল হারে বৃদ্ধি পাবে বেসরকারি মালিকদের লগ্নীর টাকা মুনাফা সমেত তুলে দিতে।

সুতরাং ঘুরে ফিরে সেই জায়গাতেই এসে পড়লাম। শিক্ষা আর অধিকার না থেকে, হয়ে যাবে প্রিভিলেজ। যার কাছে অর্থ আছে সে দামি দামি প্যাকেজ কিনে স্কুলে যেতে পারবে। উচ্চমনের শিক্ষা পেতে হলে রিক্সাচালককে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিতে হবে। লোন দেওয়ার ব্যাপারে আবার ব্যাঙ্কের আলাদা ফিরিস্তি আছে, তা নিয়ে আরও বিস্তর আলোচনা করা যায় তাতে আর যাব না। আর তাতেও না হলে স্কুল ছেড়ে চায়ের দোকানে আপনার আমার খাওয়া কাপ মাজতে হবে সেই শিশুদের। সাইকেলের দোকানে তেলকালিতেই শেষ হয়ে যাবে শৈশব থেকে যৌবন।

তবে সরকার চাইলেই এমন অরাজকতা সৃষ্টি হওয়ার থেকে আটকাতে পারে। শিক্ষাখাতে বাজেট বৃদ্ধির মাধ্যমে, নামমাত্র না দেশ গঠনের কান্ডারিদের যে পরিমাণ যত্ন প্রয়োজন সেই পরিমাণ। যে সকল গ্রামে গঞ্জে ছেলেমেয়েদের জীবন জীবিকা অর্জনের জন্য বাবা মায়ের কাঁধে কাঁধ রেখে কাজ করতে হয় তাদের ঘরের কাছে স্কুল নির্মাণের মাধ্যমে, এবং শুধুমাত্র স্কুল নির্মাণই নয় সেখানে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগও অনিবার্য। শিশুশ্রমিক দেখলে শুধু মালিককে শাস্তি না দিয়ে ওই শ্রম দিতে বাধ্য হওয়া বাচ্চাটির পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে একাগ্র উদ্যোগ নিতে হবে সরকারের পক্ষে। শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের বিশ্বাসযোগ্যতার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে, নাহলে এমন চিন্তা মাথায় আসা অস্বাভাবিক নয় যে পড়াশোনা করেও যদি চায়ের কাপ প্লেট মাজতে হয় তাহলে পড়াশোনা করে অর্জনটা কী? এই উদ্দেশে

সরকারের প্রয়োজন কর্মসংস্থানমুখী বাজেট নির্মাণ। আমরা দেশের সর্বাধিক জনসংখ্যার দেশ, আমরা প্রত্যেকে ডিরেক্ট অথবা ইনডিরেক্ট ট্যাক্স দিয়ে থাকি, তাই সরকারের আয়ের উৎস কিন্তু সামান্য নয়। তাই ওপরে যা যা বললাম এগুলোর কোনোটই সরকার চাইলে বাস্তবায়িত করা অসম্ভব কিছু না।

ইতিমধ্যে করোনা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্তর থেকে স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়েছে, তার ওপর মুনাফাভিত্তিক বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থার নিশ্বাস যেভাবে ঘাড়ে উষ্মা বৃদ্ধি করছে তাতে আরও কী কী ফলশ্রুতি দেখতে হয় তা সময়ের অপেক্ষা। যেভাবে কৃষক ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করে সেরকম ঘটনা এক্ষেত্রেও দেখতে হতে পারে প্রস্তুত হোন। সমাজবিরোধী দুর্নীতিগ্রস্ত, দরিদ্র মানুষে ভর্তি কঙ্কালসার সমাজ তৈরি হবে যদি শিক্ষা সার্বিক না হয়, যদি শিক্ষা কুক্ষিগত হয়ে থেকে যায়। প্রস্তুত হোন এমন সমাজ তৈরির কারিগরের তকমা নিতে।

আর যদি প্রস্তুত না হতে চান, তাহলে রুখে দাঁড়ান শিক্ষার প্রতি অধিকার রক্ষা করতে। যারা মুনাফাসর্বস্ব পৃথিবী গড়তে চায় তাদের বুঝিয়ে দিন পৃথিবীতে সব কিছু সামগ্রীর মত বিক্রি হলেও শিক্ষা কোনো পণ্য হতে পারে না। প্রতিষ্ঠান তৈরির বহু আগে থেকে মানুষ সভ্যতার পথচলায় শিক্ষাকে তার হাতিয়ার করেছে। কখনও আগুন জ্বালার শিক্ষা, কখনও চাকা নির্মাণের শিক্ষা, কখনও বা পশু শিকার করে বা ফল সংগ্রহ করে খিদে মেটানোর শিক্ষা।

আপনার ইতিবাচকতাকে সম্পূর্ণ রূপ দিন ওয়াকিবহাল হয়ে। এই দেশের স্বার্থে, আপনার স্বার্থে, সকলের স্বার্থে।

ক্যুইজ

সহেলী মান্না

****

১. ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর একটি ছদ্মনাম ছিল, বল তো কী?
২. ফেলুদা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন কী করতে লখনউ গিয়েছিলেন?
৩. ফুটবল বিশ্বে 'পিকলস' নামে একটি কুকুর খুব বিখ্যাত, কী কারণে?
৪. চিনের কোন পর্বতমালাকে 'ইয়েলো মাউন্টেন' নামেও ডাকা হয়?
৫. নাইজেরিয়ার আর গুঙ্গু উৎসবে মানুষকে মাছ ধরতে দেওয়া হয়। কিন্তু বিশেষ একটি পদ্ধতিতে, কী সেই পদ্ধতি?
৬. গ্রাফোলজি নিয়ে যারা লেখাপড়া করেন, তারা মূলত কোন জিনিষটির বিশ্লেষণ করেন?
৭. যদি ভারতীয় ক্রিকেটের দাদা সৌরভ গাঙ্গুলি হন, তাহলে 'চিকু' কে?
৮. ভারতের কোন রাজ্যে গেলে 'রং ঘর' নামের স্থাপত্যটি দেখতে পাওয়া যায়?
৯. বজ্রবিদ্যুৎকে যারা ভয় পান, তারা কোন ফোবিয়ার শিকার?
১০. জনপ্রিয় এই স্প্যানিশ ফুটবলারের অপর নাম 'এল নিনো'! বলতে পার ইনি কে?

উত্তর। ১. চাণক্য। ২. ক্রিকেট খেলতে। ৩. ১৯৬৬ সালে হারিয়ে যাওয়া 'জুলে রিমে' কাপটি খুঁজে বের করেছিল। ৪. মাউন্ট হুয়াংসান। ৫. সবচেয়ে বড়ো মাছটি ধরতে হবে অথচ ছিপ বা জাল কিছুই ব্যবহার করা যাবে না। ৬. হাতের লেখা। ৭. বিরাট কোহলি। ৮. অসম। ৯. অ্যাস্ট্রাফোবিয়া। ১০. ফার্লান্দো তোরেস।

Source : Latest Quiz Book, Anondomela

Deeya
10/22

With Best Compliments from :

LIVE YOUR
DREAMS WITH

A R ENTERPRISE

AR
ENTERPRISE

স্বপ্ন আপনার
পূরণ করব আমরা